সত্যজিৎ রায়

পাহাড়ে ফেলুদা

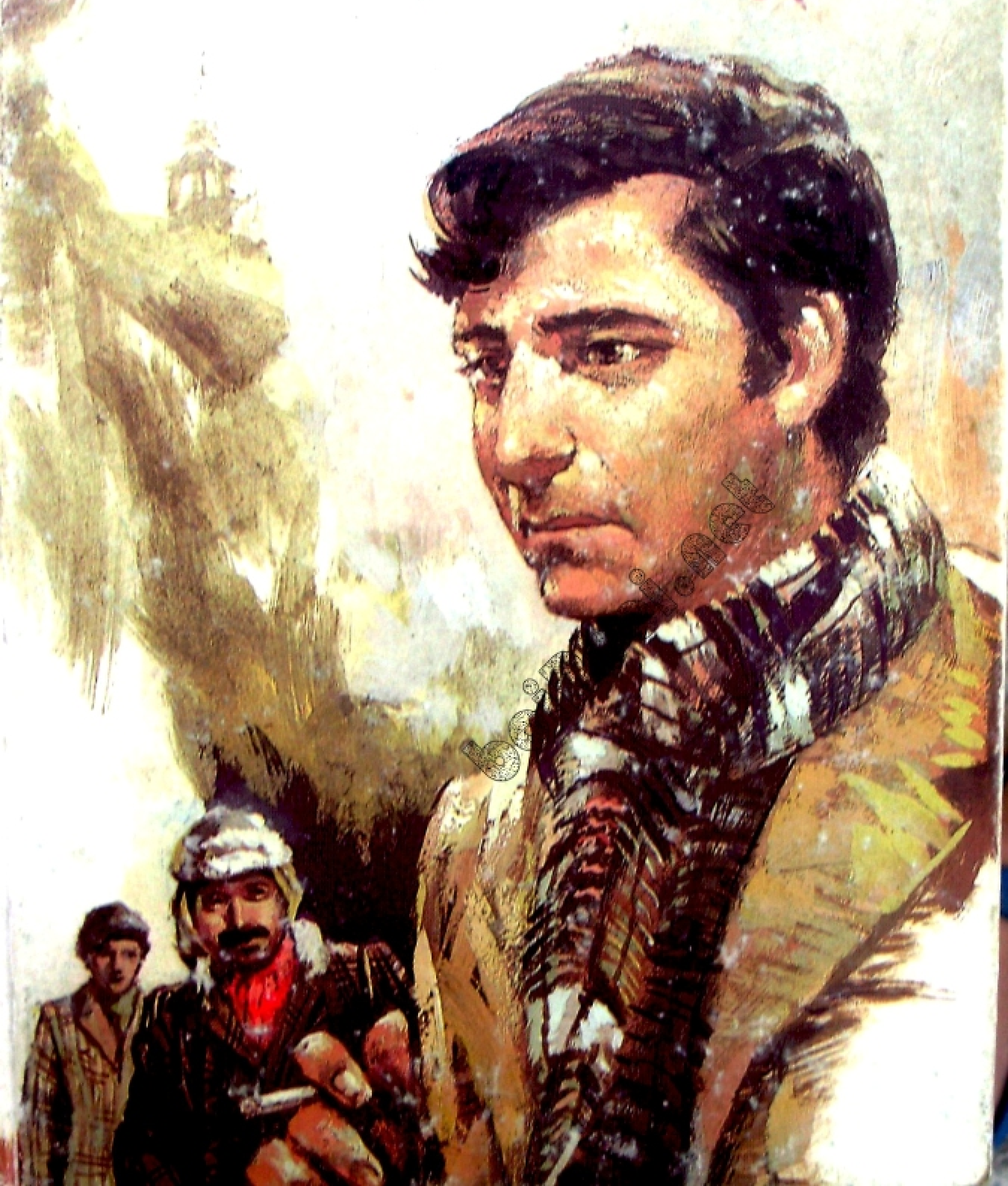

SCANNED BY

Atanu

PREPARED BY

SUDIP

চায়ের সাথে টায়ের বদলে

boiRboi.net

boirboi.net

বই আর বই

বইটি পরে যদি ভালো লাগে তাহলে **boirboi.net** এর chat box য়ে এসে

ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

boiRboi.net

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

boiRboi.net

১

কিছুক্ষণ আগে অবধি জানালা দিয়ে বাইরে নীচের দিকে তাকালেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিল্কের সুতোর মতো এঁকে-বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাঝে খুদে-খুদে গ্রামের খুদে-খুদে ঘর-বাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে যেন মেঘ এসে পড়াতে সে-সব আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনের যাত্রীদের দিকে দেখছি।

আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা, তার হাতে একটা মহাকাশ-ভ্রমণ সম্বন্ধে বই। ফেলুদা অনেক বই পড়ে, তবে আজ পর্যন্ত কখনও ওকে একই বিষয় নিয়ে পর পর দুটো বই পড়তে দেখিনি। কালই রাত্রে কলকাতায় দেখেছি, ও তাকলামাকান মরুভূমির উপর একটা বই পড়ছে। তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল—সকালে একটা, রাত্রে একটা। একটা গল্পের বই, অন্যটা পৃথিবীর নানান দেশের রান্না সম্পর্কে। ও বলে, একজন গোয়েন্দার পক্ষে জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি ; কখন যে কোন্ জ্ঞানটা কাজে লেগে যায়, তা বলা যায় না।

আমাদের লাইনে প্যাসেজের উল্টো দিকে পাশাপাশি দুটো সিটে দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি দূরে বসে, তাঁর শুধু ডান হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। হাতের আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর উপর তাল ঠুকছেন। বোধ হয় আপন মনে গান গাইছেন। যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি বেশ আঁটোসাঁটো চক্‌চকে ভদ্রলোক। হাতের কবজিটা দেখে বেশ জোয়ান মনে হলেও, জুলপির কাছে পাকা চুল থাকাতে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। একটা স্টেটস্‌ম্যান

খুলে ভারি মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন তিনি। ফেলুদা হলে শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারত। আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না।

'ও রকম হাঁ করে কী দেখছিস?'

চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ-প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল। কথাটা বলে ও একবার আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও।'

এটা বলতে মনে পড়ল, সত্যিই ভদ্রলোক এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'বার চেয়ে চা খেয়েছেন, আর তার সঙ্গে গোটা তিনেক করে বিস্কুটও। বললাম, 'আর কী বুঝলে?'

'ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে।'

'কী করে জানলে?'

'একটু আগেই প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধড়াস্ করে বাম্প করেছিল—মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরে বাবা—আমার তো পেটের ভিতরটা কি রকম করে উঠেছিল।'

'শুধু তুই কেন, আশেপাশের সকলেই নড়ে চড়ে উঠেছিল, একমাত্র উনিই দেখলাম কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।'

'আর কী বুঝলে?'

'লোকটার মাথার সামনের দিকে চুল বেশ পরিপাটি রয়েছে, কিন্তু পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগের ঝুঁটি হয়ে গেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'অথচ প্লেনে লোকটা সিটে মাথা ঠেকিয়ে শোয়নি একবারও, একটানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে, আর না হয় চা-বিস্কুট খেয়েছে। তার মানে দমদমে ওয়েটিং রুমে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি—তার মানে ও প্লেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই দমদম পৌঁছেছিল, আর তাই—'

'ভেরি গুড। হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে

boiRboi.net

মাথা চিতিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে। তাই পিছনের চুলের ওই দশা।'

ফেলুদার এই ক্ষমতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। আরও আশ্চর্য এই যে, এগুলো বুঝে ফেলার জন্য ওকে আমার মতো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের দিকে। দু'-এক বার আড়চোখে দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়।

'লোকটা কোন দেশি বল তো।' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এটার জবাব দেওয়া ভারি কঠিন। বললাম, 'লোকটা পরে আছে সুট, হাতে আবার ইংরেজি কাগজ—কী করে বুঝব? বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, পঞ্জাবি—এনিথিং হতে পারে।'

ফেলুদা ছিক্ করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, 'কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না। লোকটার ডান হাতে কী রয়েছে?'

'খবরের—না না, একটা আংটি!'

'আংটিতে কী আছে?'

চোখ কুঁচকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম সোনার আংটির মাঝখানে লেখা রয়েছে 'মা'।

অন্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লাউডস্পিকারে বলে উঠল বাগডোগরা পৌঁছাতে আর বেশি সময় নেই—'প্লিজ ফাস্‌ন ইয়োর সিট বেল্টস অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য নো-স্মোকিং সাইন।'

বাগডোগরা বলতে অনেকেই মনে করবে, আমরা হয়তো দার্জিলিং কিম্বা কালিম্পং যাচ্ছি। আসলে তা নয়। আমরা যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'বার দার্জিলিং গেছি; এবারও প্রথমে দার্জিলিং-এর কথাই হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল। বাবার হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না। বললেন, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস, ফেলুরও ছুটি পাওনা হয়েছে—দিন পনেরোর জন্য ঘুরে আয়। কলকাতায় বসে ভ্যাপসা গরমে পচার কোনও মানে হয় না।'

ফেলুদা গ্যাংটক বলল—তার কারণ বোধ হয় এই যে, ইদানীং ও তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করেছে। (সেই ফাঁকে আমিও একটা স্বেন হেদিনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি)। সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে। সিকিমের রাজা তিব্বতি, সিকিমের গুম্‌ফাগুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায়, সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রেফিউজিরা এসে রয়েছে। তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ-পরা নাচ—এ সবই নাকি সিকিমে রয়েছে। আমিও তাই আর গ্যাংটক নিয়ে আপত্তি করিনি। সত্যি বলতে কি, আমার এই খুড়তুতো দাদাটির সঙ্গে যদি উলুবেড়েতেও ছুটি কাটাতে হয়, তাতেও আমি রাজি। অবিশ্যি তার সঙ্গে যদি সে-জায়গায় কোনও রহস্যের সন্ধান মেলে, তা হলে তো পোয়াবারো। গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদার জুড়ি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামল ঠিক সাড়ে সাতটায়। কলকাতা থেকেই বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে আমাদের জন্য এখানে একটা জিপ মজুত থাকে। আমরা সটান জিপে না উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টোরান্টে গিয়ে বেশ ভাল করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম ; কারণ এখান থেকে গ্যাংটক যেতে লাগবে প্রায় ছ'-সাত ঘণ্টা। রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে ভরসা এই যে আজ সবে চোদ্দই এপ্রিল ; মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।

অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা ধরেছি, এমন সময় দেখি প্লেনের সেই ভদ্রলোকটি একটা কোনার টেবিল থেকে উঠে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আমাদেরই দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

'আপনারা কি ড্যাং, না ক্যাং, না গ্যাং ?'

আমি তো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই গেলাম। এ আবার কী হেঁয়ালিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক ? কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে উত্তর দিল 'গ্যাং।'

গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'জিপের ব্যবস্থা আছে ? মানে, সোজা কথা—আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি ?'

ফেলুদা বলল, 'স্বচ্ছন্দে', আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং হচ্ছে দার্জিলিং, ক্যাং কালিম্পং আর গ্যাং গ্যাংটক।

ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস'।

'কী ব্যাপার?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। 'হলিডে?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও?'

'আজ্ঞে না।'

'কোথায় উঠছেন?'

ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে ভদ্রলোককে একটি চারমিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে বলল, 'একটা হোটেলে ঘর বুক কথা আছে। নাম বোধ হয় স্নো-ভিউ।'

শশধরবাবু বললেন, 'গ্যাংটকের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন—সারা সিকিম চষে বেড়িয়েছি। লাচেন, লাচুং, নামচে, নাথুলা—কিছুই বাদ নেই। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য, তেমনই শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়, অর্কিড চান অর্কিড—রোদ চান, মেঘ চান, বৃষ্টি চান, মিস্ট চান—সব পাবেন। তিস্তা, রঙ্গিত—নদীগুলোর কোনও তুলনা নেই। তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে—রোড্‌স্—বুঝেছেন। আসলে এ দিকের পাহাড়গুলো, যাকে বলে গ্রোইং মাউনটেনস। এখনও বাড়ছে। তাই একটু অস্থির, বুঝেছেন—আর কাঁচা। ইয়াং বয়সে যা হয় আর কি—হে হে!'

'তার ফলেই বুঝি ল্যান্ডস্লাইড হয়?'

'ইয়েস, আর সে বড় বেয়াড়া ব্যাপার। যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনে রাস্তা বন্ধ—ধ্বস গেছে। তার মানে ব্লাস্টিং, পাথর ভাঙো, দেয়াল তোলো, মাটি ফেলো—সে অনেক ঝক্কি। তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে, চটপট সরিয়ে নেয়। তবে এখনও বৃষ্টিটা তেমন নামেনি, তাই খুব একটা গোলমাল হবে বলে মনে হয় না। যাক্—আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল। একা একা এতখানি পথ যেতে হবে ভাবতে বিশ্রী লাগছিল। কোম্পানি পেলে গপ্পোটপ্পো করে সময়টা কেটে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন ?'

'আরে না মশাই !' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আমি যাচ্ছি কাজে। তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ। অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস জানেন ?'

'আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা ?'

'ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্ম। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা। সিকিমে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় গাছ আছে সেটা জানি। সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া। আমার পার্টনার আগেই গেছে—দিন সাতেক হল। গাছপালা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান—বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমারও ওর সঙ্গে যাবার কথা ছিল—শেষটায় এক ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।'

বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মালপত্র তুলে নিয়ে জিপের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের কোম্পানিটা কোথায় ?'

শশধরবাবু বললেন, 'বম্বে। কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে চলল। আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এস্. এস্. কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার—ওর নামেই নাম।'

boiRboi.net

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড। সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে রাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ করে। তার পর মাঝে মাঝে নীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মতো সামনে চড়াই ওঠে না। রঙপো-তে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু।

তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয়। তিস্তা বাজারে আমাদের জিপ থামানো হল। রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল, তাই শশধরবাবু বললেন, 'কোকা-কোলা খাবেন ?' এ জায়গাটা নাকি দু' বছর আগে তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল। দোকানপাট ঘরবাড়ি যা

দেখছি, সবই নাকি নতুন তৈরি হয়েছে। দেখেও তাই মনে হয়। ব্রিজটাও নতুন ; আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শশধরবাবু দেখলাম পর পর দু' বোতল কোকা-কোলা সাবাড় করে দিলেন। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমাদেরও খাওয়ালেন। মনে মনে ভাবলাম—গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না। পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন, নিশ্চয়ই এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে।

'কোক' খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি, তখন লক্ষ করলাম কিছু দূরেই একটা জিপের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক (তার মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে) হাত-টাত নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে। জিপটা উল্টো দিক থেকে এসেছে—বোধ হয় শিলিগুড়িই যাবে। 'অ্যাক্সিডেন্ট' কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমরা তিনজনেই জিপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে যা শুনলাম, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ও দিকে বৃষ্টি না হলেও, গ্যাংটকে নাকি দিন-সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে একটা জিপের উপর পড়ে একজন লোক নাকি মারা গেছে। জিপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে মরেছে, তার নাম-ধাম এরা কেউ বলতে পারল না, কারণ এরা কেউ গ্যাংটক থেকে আসছে না।

ফেলুদা খবরটা শুনে বলল, 'একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাৎই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাত্র খসা পাথর এসে পড়া—এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।'

শশধরবাবু বললেন, 'ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।' তার পর জিপে উঠতে উঠতে বললেন, 'যাবার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন, আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।'

তিস্তা ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকের দৃশ্য এমন অদ্ভুত

boiRboi.net

সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল যে, অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা মন থেকে মুছে গেল। রংপো পেরিয়ে কিছু দূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল, তার উপরে তিন হাজার ফুট হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরম্ভ হল, তখন রীতিমতো ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি, তখন এক জায়গায় জিপ থামিয়ে স্যুটকেস খুলে কোট আর মাফলারটা বার করে পরে নিলাম। শশধরবাবুও দেখলাম এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা তাঁর ঠাণ্ডা কোটের তলায় চাপিয়ে নিলেন।

ক্রমে কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা আবছা চোখে পড়ল, পাহাড়ের গায়ে নীল রঙের চিনা প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘরবাড়ি। শশধরবাবু বললেন, 'পাঁচ ঘণ্টাও লাগল না। উই আর ভেরি লাকি।'

ক্রমে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, ফুলের টব সাজানো কাঠের বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকান-বাড়ির সারি পেরিয়ে, লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা-নেওয়া মেয়ে, আর বাহারের টুপি আর রঙবেরঙের জামা পরা সিকিমি নেপালি ভুটিয়া তিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জিপ গিয়ে পৌঁছাল স্নো-ভিউ হোটেলের সামনে। শশধরবাবু ডাকবাংলোয় যাবেন বলে আমাদের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলেন। যাবার সময় বললেন, 'এ সব জায়গায়, জানেন তো, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।'

ফেলুদা বলল, 'আপাতত আপনি ছাড়া আর কাউকেই চিনি না এখানে। বিকেলে একবার ডাকবাংলোর দিকটায় ঢুঁ মেরে আসব।'

'বহুৎ আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে জিপের সঙ্গে ভদ্রলোকও কুয়াশায় মিলিয়ে গেলেন।

২

আমাদের হোটেলের নাম যদিও স্নো-ভিউ, আর যদিও সত্যি করেই নাকি পিছনের ঘরগুলোর জানালা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, এসে অবধি এখনও পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বলে আমাদের স্নো-ভিউ করা হয়নি। হোটেলের মালিক একজন পঞ্জাবি ভদ্রলোক—নাম মিস্টার বিব্‌রা। আর যে-সব লোক হোটেলে রয়েছে, তার মধ্যে মনে হল মাত্র এক জনই বাঙালি। এখনও আলাপ হয়নি। বাঙালি বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিট্‌কে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট শুনলামই তিনি বলে উঠলেন, 'ধুত্তেরি।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু' মিনিটের মধ্যে ফেলুদা একটা পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে মিঠে পান কিনল। বলল, 'এ জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি।' ও দুপুরে আর রাত্রে রোজ খাবার পরে একটা করে মিঠে পান খায়—তবে খয়ের ছাড়া, কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটা ও একেবারেই পছন্দ করে না।

গ্যাংটকের এ রাস্তাটা দেখলাম রীতিমতো চওড়া। রাস্তার মাঝখানে জিপ লরি স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি নানা রকম গাড়ি লাইন বেঁধে পার্ক করা রয়েছে, আর রাস্তার দু' দিকেই দোকান। দোকানের নাম দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে। পঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, গুজরাটি, সিন্ধি—সব রকম লোক সিকিমে এসে দোকান করেছে। বাঙালি প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে। কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অবধি দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, দার্জিলিং-এর সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাৎ রয়েছে। সবচেয়ে বড় তফাৎ এই যে, এখানে লোকজনের ভিড়টা কম, তাই গোলমালটা কম, আর তাই নোংরাটাও কম।

খাওয়া-দাওয়া হল, মিঠে পানও হল, সবে ভাবছি এবার জায়গাটা

একটু ঘুরে দেখলে হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখি, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শশধরবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন ব্যস্তভাবে এই হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক আরও জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী ব্যাপার?'

'সকালে তিস্তায় যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনলেন, সেটা কার জানেন?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল, ভদ্রলোকের কথায় সেটা সত্যি হয়ে গেল।

'এস্ এস্। আমার পার্টনার।'

'বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?'

'মা গঙ্গাই জানেন। টেরিবল্ ব্যাপার!'

'তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন?'

'ঘণ্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল। মারা যাবার আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল। আমার নাম করে। 'বোস' 'বোস' করে দু-এক বার বলে। তার পরই শেষ।'

'খবরটা পাওয়া যায় কী করে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

আমারা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। একতলার ডাইনিং রুম এখন খালি। তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম। শশধরবাবু একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক-পকেট থেকে বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'সেও এক ব্যাপার। ড্রাইভারটা মরেনি। পাথরটা গাড়িটায় এসে লেগেছে, আর ড্রাইভারও স্টিয়ারিং-এর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে। এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় ছিল না, কিন্তু স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কাত হয়ে খাদে পড়েছে। ড্রাইভার ছিল খাদের উল্টো দিকে—যেই না গাড়ি কাত হয়েছে, ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায়। মাইনর ইন্‌জুরি—বাঁ চোখের পাশটায় সামান্য একটু ছড়েছে—দ্যাট্‌স

boiRboi.net

অল। জিপ এদিকে শেলভাঙ্কার সমেত একেবারে পাঁচশো ফুট নীচে। নর্থ সিকিম হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট। ড্রাইভারটা সেখান থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে খবরটা দেবে বলে। পথে কিছু নেপালী মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এস্ এস্-এর বডি উদ্ধার করে। তারাই বয়ে আনছিল, এমন সময় একটা আর্মি জিপ এসে পড়ে। তার পর হাসপাতাল। তার পর...ওয়েল...'

যে লোকটাকে দু' ঘণ্টা আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল, তাকে এ রকম ভেঙে পড়তে দেখে অদ্ভুত লাগছিল।

'ডেডবডি কী হল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বম্বেতে ওর ভাইকে কনট্যাক্ট করেছিল—ব্যারিস্টার ভাই। এস্ এস-এর স্ত্রী নেই। দু'বার বিয়ে করেছিল, দুই স্ত্রী মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল—সে বছর-চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে অনেক ব্যাপার। এস্ এস্ ছেলেকে ভীষণ ভালবাসত, তার অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তার আর কোনও পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তাই ভাইকেই ইনফর্ম করেছিল। ভাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি, তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এখানে বলে রাখি—পোস্টমর্টেম কথাটার মানে আমি ফেলুদার কাছেই জেনেছিলাম। কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে মারা যায়, তাহলে পুলিশের তদন্ত হয়, আর তখন পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়—কখন মরেছে, কোথায় চোট পেয়ে মরেছে, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা—এই সব আর কি। একেই বলে পোস্টমর্টেম।

ফেলুদা বলল, 'কবে ঘটেছে ব্যাপারটা ?'

শশধরবাবু বললেন, 'ইলেভন্থ সকালে। সাত তারিখে এখানে এসে পৌঁছেছিল।' তার পর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি তো এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না!...কার কপালে যে কখন কী ঘটে! তবে আমি থাকলে বোধ হয় এ দুর্ঘটনা

ঘটত না।'

'আপনার প্ল্যান কী?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কী আবার? আর তো এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি এখন যাচ্ছি—কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে। চেনাশোনা আছে, হয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

শশধরবাবু উঠে পড়লেন।

'চলি। যাবার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। আপনারা আর এ নিয়ে ভাববেন না। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ করে ভুরু কুঁচকিয়ে বসে থেকে সকালে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে শশধরবাবু যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই ফিস্ ফিস্ করে দু'বার বলল—'ওয়ান চান্স ইন মিলিয়ন।' তার পর বলল, 'অবিশ্যি মাথায় বাজ পড়েও তো লোক মরে। সেটাও কম আশ্চর্য নয়।'

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, আমাদের কাছেই আর একটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালি ভদ্রলোকটি হাতে 'আনন্দবাজার' খুলে বসে আছেন। শশধরবাবু চলে যেতেই তিনি কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফেলুদাকে নমস্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'সিকিমের রাস্তাঘাটে কখন যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে পাথর পড়ে মানুষ মরাটা কিছুই আশ্চর্য না। আপনারা তো আজই এলেন?'

ফেলুদা একটা গম্ভীর হুঁ-এর মতো শব্দ করল। ভদ্রলোক একটা স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাচওয়ালা চশমা পেরেছিলেন। বয়স বোধ হয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোনা গোঁফ আছে, যেটাকে বোধ হয় 'বাটারফ্লাই' বলা হয়। আজকাল এ রকম গোঁফ খুব বেশি দেখা যায় না।

'বেশ অমায়িক লোক ছিলেন মিস্টার শেলভাঙ্কার।'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'যেটুকু হয়েছিল, তাতেই বুঝেছি। সমঝদার লোক—যাকে বলে রসিক আর কি। আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। আমার কাছে একটা

তিব্বতি মূর্তি ছিল, সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দু' দিন আগে।'

'উনি ও সব জিনিস কালেক্ট করতেন?'

'কালেক্ট-ফালেক্ট জানি না—আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে আলাপ, দেখি এটা-সেটা ঘেঁটেঘুঁটে দেখছেন। বললুম, আমার কাছে একটা পুরনো তিব্বতি মূর্তি আছে, তুমি দেখবে? তা বললে, ডাকবাংলোয় নিয়ে এসো। গেলুম নিয়ে, দেখালুম। ভদ্রলোক অন দ্য স্পট কিনে নিলেন। অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন। ন'টা মাথা, চৌত্রিশটা হাত।'

'আই সি।'

ফেলুদা গম্ভীর ভাব দেখালেও, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল, বিশেষ করে ওর হাসিটা, যেটা ওর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুটাও যেন ওর কাছে একটা হাসির ব্যাপার।

'আমার নাম নিশিকান্ত সরকার।'

ফেলুদা নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্ট নমস্কার করল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি থাকি দার্জিলিঙে। তিন পুরুষ ধরে আছি আমরা। তবে গায়ের রঙটা দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল, তাই না?'

ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রতা অ্যাভয়েড করল।

'ও দিকটা, আর কালিম্পংটা হয়োলি ঘুরে দেখা আছে। সিকিমটা আসা হয়নি। অবিশ্যি সেটা আমার নেগ্—মানে নেগ্লিজেন্স। এসে বুঝছি কী মিস করছিলুম। কাছে-পিঠে সব অদ্ভুত জায়গা আছে, জানেন তো? নাকি আপনার সব দেখা?

ফেলুদা বলল যে সেও নতুন, আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে পদার্পণ।

'বাঃ!' ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল। 'ক' দিন আছেন তো? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে।'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'পেমিয়াংচিটা শুনিচি দারুণ জায়গা।'

'যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে ?'

'শুধু রাজধানী কেন ? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্‌ফা আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে—আর কত চাই ?'

'সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাব।' বলে ফেলুদা উঠে পড়ল।

'উঠছেন ?'

ফেলুদা বলল, 'যাই, একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানে কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করে যেতে হয় নাকি ?

'তা, হোটেলের ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ভাল। তবে চুরি-চামারি এখানে নেই বললেই চলে। সারা সিকিমে মাত্র একটি জেলখানা, আর সেটা গ্যাংটকেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন—চারটির বেশি কয়েদি নেই সেখানে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা কাটেনি। ফেলদুা ওদিক-ওদিক দেখে বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেল—দু' জনের জন্যই এক জোড়া করে হান্টিং বুট কিনে আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি, এখানে বাদলা হবে। তার মানেই রাস্তাঘাট পেছল। আর জুতোয় গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'এখানে পাওয়া যাবে না ?'

'তা যেতে পারে। বাটার দোকান তো সর্বত্রই আছে। সন্ধে নাগাত ফিরে এসে কিনে নেব। আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক।'

বাজার থেকে শহরের দিকে যেতে হলে চড়াই উঠতে হয়। কিছু দূর গিয়েই বুঝলাম, এ দিকটায় লোকের ভিড় আর বাড়ির ভিড় আরও অনেকটা কম। অল্প যে সব লোক চলাচল করছে, তার মধ্যে কিছু স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ছেলে-মেয়েও দেখলাম। দার্জিলিং-এর মতো ঘোড়া দেখালাম না এখানে, তবে জিপ চলে ওখানের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা বোধ হয় মিলিটারিরা থাকার

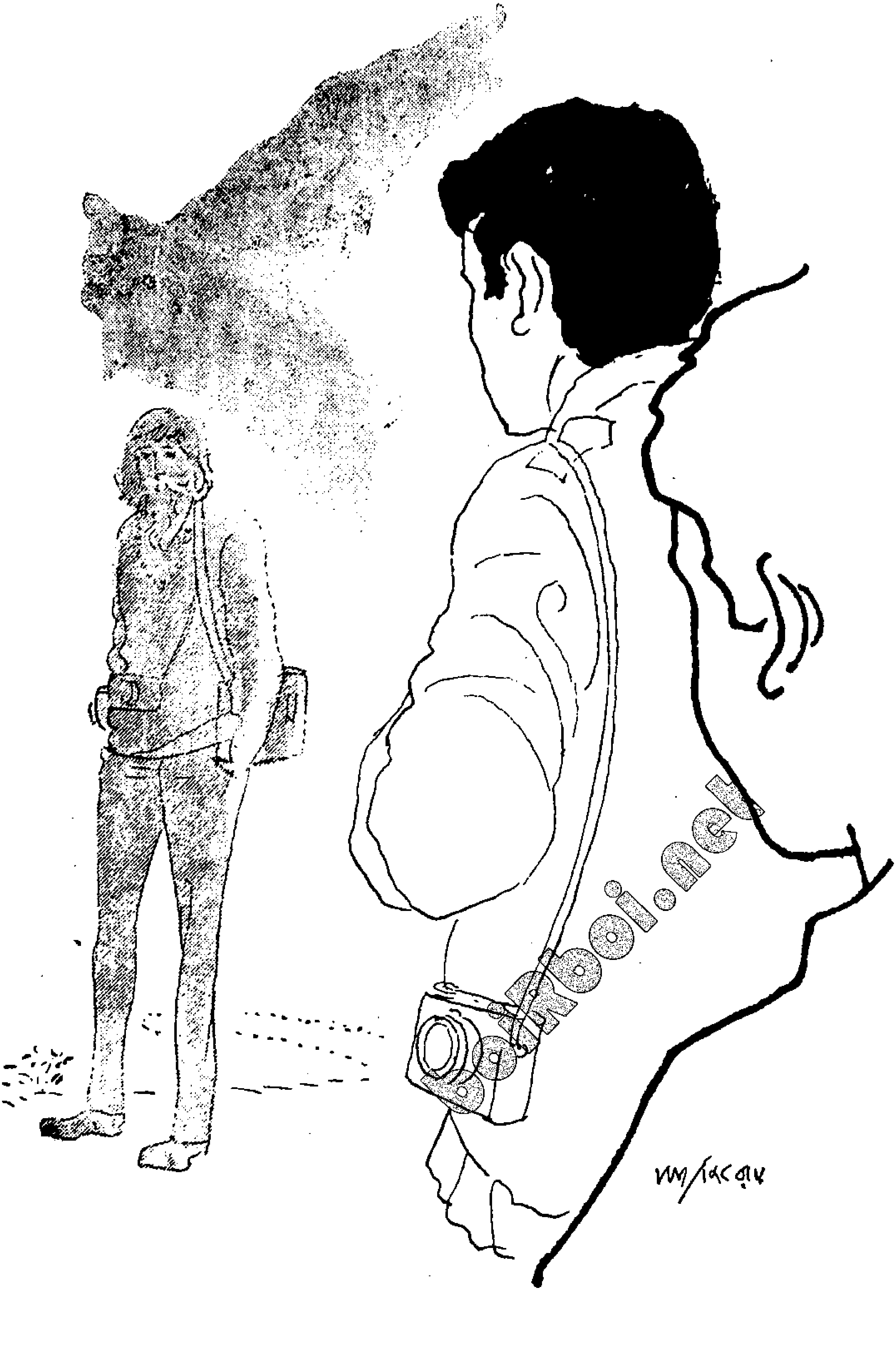

দরুন। গ্যাংটক থেকে ষোল মাইল দূরে ১৪,০০০ ফুট হাইটে নাথুলা। নাথুলাতে চিন আর ভারতের মধ্যের সীমারেখা। এ দিকে ভারতীয় সৈন্য, আর ও দিকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চিন সৈন্য।

আরও কিছু দূর হেঁটে যাবার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে কুয়াশার মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল। একটু এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই না—একটা লোক, ভারি বাহারের পোশাক পরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা থেকে মাথা অবধি রঙের বাহার। পায়ে হল্‌দে জুতো, প্যান্টটা হল নীল রঙের জিন্‌স, সোয়েটারটা টক্‌টকে লাল, আর তার গলার ফাঁক দিয়ে ভিতরে সবুজ শার্টের কলার দুটো বেরিয়ে আছে। শার্টের ঠিক উপরেই, থুতনির নীচে, একটা সাদার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ। লোকটার মুখের রং হাল্‌কা হল্‌দে আর ফ্যাকাশে গোলাপি মেশানো, আর চুল—শুধু চুল নয়, গোঁফদাড়িও—বাদামি রঙের। দেখেই বোঝা যায়, ইনি একজন বিদেশি হিপি। দাড়ি থাকার ফলে বয়স বোঝা মুশকিল, তবে মুখের চামড়া একটুও কুঁচকোয়নি। মনে হয় ফেলুদারই বয়সী—মানে ত্রিশের একটু নীচেই।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরে বললেন, 'হ্যালো।'

ফেলুদাও উত্তরে 'হ্যালো' বলল। এবার লক্ষ করলাম, হিপির কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে, আর তার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ। তাতেও হয়তো ক্যামেরারই জিনিসপত্র রয়েছে। একটা ক্যামেরার নাম 'ক্যানন', দেখে বুঝলাম সেটা জাপানি। ফেলুদার সঙ্গেও তার জাপানি ক্যামেরাটা ছিল, আর সেটা দেখেই বোধ হয় হিপি বললেন, 'নাইস ডে ফর কালার।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'তোমাকে কিছু দূর থেকে কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে পড়ছিল, তবে দুঃখের বিষয় ভাল কালার ফিল্‌ম এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য।'

হিপি বলল, 'সেটা জানি। আমার কাছে কালারের স্টক আছে,

প্রয়োজন হলে আমাকে ব'লো।'

হিপি যদিও ইংরেজিতে কথা বলছিল, উচ্চারণ শুনে তার জাতটা বুঝতে পারলাম না। ফরাসি অথবা আমেরিকান হলে চন্দ্রবিন্দুটা একটু বেশি ব্যবহার করত, আর ইংরেজ হলে তো বোঝাই যেত। ইনি কিন্তু ওই তিনটি জাতের একটিও নন।

ফেলুদা বলল, 'তুমি কি বেড়াতে এসেছ ?'

হিপি বলল, 'আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে। আমি একজন প্রোফেসন্যাল ফটোগ্রাফার।

'কত দিন আছ এখানে ?'

'এসেছি নাইন্‌থ। পাঁচ দিন হল। তিন দিনের ভিসা ছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরও দিন-সাতেক থাকার ইচ্ছে।'

'কোথায় উঠেছ ?'

'ডাকবাংলো। এই যে রাস্তাটা ডান দিকে উঠে গেছে—এইটে দিয়ে একটু উঠে গিয়েই ডাকবাংলো।'

ডাকবাংলো শুনেই আমার কানটা খাড়া হয়ে উঠল। শেলভাঙ্কারও তো বোধ হয় ডাকবাংলোতেই ছিলেন।

'তা হলে যে-ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

হিপি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি স্যাড। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যান্ড—'

এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল। দেখে মনে হল, সে হঠাৎ কেন যেন চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রায় আপন মনেই বলল, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

'কী ব্যাপার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। হি পেড ওয়ান থাউজ্যান্ড রুপিজ ফর ইট।'

'এক হাজার !' ফেলুদা অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটান ইনস্টিটিউটে

সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচু দরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু—' ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, 'আমার খট্‌কা লাগছে এই ভেবে যে, মূর্তিটা গেল কোথায় ?'

'তার মানে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'তার ডেড বডি তো শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার জিনিসপত্র নিশ্চয়ই সেই সঙ্গেই গেছে—তাই নয় কি ?'

হিপি মাথা নাড়ল। 'অন্য সব জিনিস ফেরত গেছে সেটা ঠিকই, কিন্তু মিস্টার শেলভাঙ্কার মূর্তিটা সব সময়ে তাঁর কোটের বুক-পকেটে রাখতেন। বলতেন, এটা আমার ম্যাসকট—আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সে দিন যখন বেরোন, তখনও সেটা ওঁর পকেটেই ছিল। এটা আমি জানি। অ্যাক্সিডেন্টের পর ওঁকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন আমি সেখানে ছিলাম। ওঁর জামাকাপড় খুলে ওঁর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা হয়। একটা নোটবুক বেরোয়, মানিব্যাগ বেরোয়, খাপের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় ওঁর চশমাটা বেরোয়, কিন্তু মূর্তি বেরোয়নি। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ; হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর নাহয় যারা তাকে তুলে আনে, তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।'

'কিন্তু এখানের লোকেরা তো শুনেছি খুব অনেস্ট।'

'সেইজন্যেই তো গোলমাল লাগছে।' হিপি থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল। ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার সে দিন কোথায় যাচ্ছিলেন, সেটা জানেন ?'

'সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্‌ফা আছে, সেখানে আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে দিন সকালে উঠে দিনটা ভাল দেখে আমি ওঁর অনেক আগেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি। উনি বলেছিলেন—পথে যদি তোমাকে দেখি, তা হলে তুলে নেব।'

'হঠাৎ গুম্‌ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন ?'

'সেটা ঠিক জানি না। বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী।'

'ডক্টর বৈদ্য ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। নামটা এই প্রথম শুনছি।

হিপি হেসে বলল, 'এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় কি ? চলো, ডাকবাংলোয় চলো—কফি খাবে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। বুঝলাম ও শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সব জেনে নিতে চাইছে।

ডান দিকের চড়াই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে হিপি বলল, 'তা ছাড়া আমার পা-টাকেও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। সে দিন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে স্লিপ করে একটু মচকেছে। বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।'

কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। চার দিকে যে এত গাছপালা ছিল, তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। হালকা হয়ে আসা কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এখন পাইন গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

খানিক দূর হেঁটেই আমরা ডাংকবাংলো পৌঁছে গেলাম। বেশ সুন্দর একতলা বাড়ি ; বেশি দিনের পুরনো বলেও মনে হল না।

হিপি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারের উপর থেকে কাগজপত্র সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আমার পরিচয়টাই এখনও দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেলমুট উঙ্গার।'

'জার্মান নাম কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ঠিকই ধরেছ।' হেলমুট তার খাটেই বসল। ঘরের চারি দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, আলনায় আরও রঙচঙে পোশাক, বাক্সগুলো আধখোলা, তার মধ্যে কাপড়ের চেয়ে কাগজপত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদিই বেশি। কিছু ফোটো রাখা রয়েছে টেবিলের উপর, দেয়ালের গায়ে ঠেস দাঁড় করানো অবস্থায়। বেশির ভাগই বিদেশের ছবি, কিছু এ দেশে তোলা। আমি খুব বেশি বুঝি না, তবে দেখে মনে হল ছবিগুলো বেশ ভাল।

ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল, যদিও সে যে শখের ডিটেকটিভ, সে কথা বলল না। তার পর হেলমুট 'এক্সকিউজ মি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে আবার

খাটে বসে বলল, 'ডক্টর বৈদ্য ভারি ইন্টারেস্টিং লোক, তবে কথাটা একটু বেশি বলেন। ডাকবাংলোতেই এসেছিলেন কয়েক দিন। ভাগ্য গণনা জানেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, যে লোক মরে গেছে, তার আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারেন।'

'প্ল্যানচেট জাতীয় ব্যাপার ?'

'কতকটা তাই। মিস্টার শেলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারি আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হল অনেক পড়াশুনা আছে।'

'তিনি এখন কোথায় ?'

'কালিম্পং যাবার কথা ছিল। সেখানে নাকি কোনও এক তিব্বতি সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বলেছেন তো আবার আসবেন।'

'মিস্টার শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিলেন তিনি ? আপনি শুনেছেন সে সব কথা ?'

'আমার সামনেই কথাবার্তা হয়। তার ব্যবসার কথা বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বললেন, ছেলের কথা বললেন। এমন কি, তিনি যে কিছুদিন থেকে মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন, সে কথাও বললেন।'

'সেটা কী কারণে ?'

'তা জানি না।'

'আপনাকে কিছু বলেননি ?'

'না। তবে বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ওঁর একটা টেলিগ্রাম আসে। উনি সেটা পড়ে রীতিমতো আপসেট হয়ে পড়েন।'

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার যে আকস্মিকভাবে মারা যাবেন, এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্য কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ?'

'ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী না করলেও, একটা সপ্তাহ একটু সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। বলেছিলেন তার সময় ভাল যাচ্ছে না।'

কফি এল। আমরা তিনজনেই চুপচাপ বসে খেলাম। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কিনা জানা না

গেলেও, আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। আমার বিশ্বাস, ফেলুদারও আমার মতোই মনের অবস্থা। কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে যখন একটা সন্দেহ জাগে, তখন ও চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল মটকায়। এখনও সে আঙুল মটকাচ্ছে।

কফি শেষ করে ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি যখন আরও দিন-সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ডক্টর বৈদ্য যদি আসেন, তা হলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে আছি।'

হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এল। গুডবাই করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল : 'মূর্তিটা কোথায় গেল সেটা জানতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগত।'

৩

কুয়াশা কাটলে কী হবে, আকাশে মেঘ এখনও কাটেনি। অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছিল, তবে এ রকম বৃষ্টি ভালই লাগে। ছাতার দরকার হয় না, গা ভিজল কি না ভিজল বোঝাই যায় না, অথচ শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বাটার দোকানটা দেখলাম আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দু'জনের জন্য হান্টিং বুট কেনা হলে পর ফেলুদা বলল, 'রাস্তাঘাট যখন জানা নেই, তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট। দুর্দান্ত সব থাঙ্কা, পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।'

'তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে?' উত্তর পাব কি না জানি না, তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'কিসের সন্দেহ?'

'...যে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিক মরেননি।'

'এখনও সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি।'

'তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে কী হল ? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে, পকেট থেকে মূর্তি গড়িয়ে পড়েছে, যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে পেয়ে ট্যাঁকস্থ করেছে—ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। খুন করা এমনিতেই সহজ না, তার উপর মাত্র এক হাজার টাকার একটা মূর্তির জন্যে খুন—এ তো ভাবাই যায় না।'

আমি আর কিছু বললাম না। খালি মনে মনে বললাম—একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল।

সারি সারি দাঁড়ানো জিপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নেপালি ড্রাইভারকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া যায়গা ?'

লোকটা বলল, 'কাঁহা যায়গা ?'

'টিবেটান ইন্‌স্টিটিউট মালুম হ্যায় ?'

'হ্যায়। বৈঠ যাইয়ে।'

'আমরা দু'জনেই সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম। ড্রাইভারটা গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ চাপিয়ে জিপটা ঘুরিয়ে যে-পথে আমরা শহরে এসে ঢুকেছিলাম, সেই পথে উল্টোমুখে চলতে লাগল।

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাতচিৎ আরম্ভ করে দিল। কথা অবিশ্যি হিন্দিতেই হল ; আমি সেটা বাংলায় লিখছি।

'এখানে সে দিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সেটার কথা তুমি জানো ?'

'সবাই জানে।'

'সে ড্রাইভার তো বেঁচে আছে, তাই না ?'

'ওঃ—ওর খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেও পাথর পড়ে—তাতে ড্রাইভারটা মরেছিল, আর যাত্রী বেঁচে গিয়েছিল।'

'তুমি এ ড্রাইভারকে চেনো ?'

'চিনব না ? এখানে সবাই সবাইকে চেনে।'

'সে কী করছে এখন ?'

'আবার অন্য একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে—SKM 463। নতুন

boiRboi.net

ট্যাক্সি।'

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, ও তো নর্থ সিকিম হাইওয়েতে। এখান থেকে দশ কিলোমিটার।'

কাল একবার নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন পারব না?'

'তা হলে এক কাজ করো। আটটা নাগাত বেরোব—সকালে। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে থাকি—তুমি চলে এসো।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খাড়াই পথ ধরে উঠে গিয়ে টিবেটান ইনস্টিটিউট। ড্রাইভার বলল, জঙ্গলে নাকি খুব ভাল অর্কিড আছে—কিন্তু সে সব দেখবার সময় এখন নয়। গাড়ি একেবারে সোজা ইন্‌স্টিটিউটের দরজার সামনে গিয়ে থামল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, তার গায়ে বোধ হয় তিব্বতি ধাঁচেরই সব নকশা করা। চারদিক এত নির্জন আর নিস্তব্ধ যে, একবার মনে হল ইনস্টিটিউট হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, দরজা খোলা।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হলঘরে এসে পড়েছি, তার দেওয়ালে লম্বা লম্বা ছবি ঝুলছে (এগুলোকেই বলে থাঙ্কা,) আর মেঝেতে রয়েছে নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিসপত্রে বোঝাই সারি সারি কাঁচের আলমারি আর শো-কেস।

কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না, এমন সময় একজন ঢোলা সিকিমি পোশাক আর চশমা-পরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা তাকে ভীষণ ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর গুপ্ত আছেন কি?'

ভদ্রলোক ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'দুঃখের বিষয় কিউরেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

ফেলুদা বলল, 'না, মানে, একটা বিশেষ ধরনের তিব্বতি মূর্তি

সম্বন্ধে আমি একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম। নামটা জানি না, তবে কোনও এক দেবতার মূর্তি। তার ন'টা মাথা আর চৌত্রিশটা হাত।'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে বলেন, 'ইয়েস ইয়েস—যমন্তক, যমন্তক। টিবেট ইজ ফুল অফ স্ট্রেঞ্জ গডস। আমাদের কাছে একটা যমন্তকের মূর্তি আছে, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু ওর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছু দিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন। আনফরচুনেটলি হি ইজ ডেড নাউ।'

'আই সি !' প্রয়োজনে ফেলুদার অ্যাকটিং দেখবার মতো।

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলাম। যে মূর্তিটা ভদ্রলোক বার করে আমাদের সামনে ধরলেন, সেটার চেহারা ভয়ঙ্কর। ন'টা মুখের প্রত্যেকটাতেই একটা হিংস্র ভাব—প্রায় রাক্ষসের মতো।

এবার ভদ্রলোক মূর্তিটাকে চিত করে দেখালেন তার তলায় একটা ফুটো। এই ফুটোর ভিতরে নাকি মন্ত্র লেখা কাগজ পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হয়, আর তাকে বলে নাকি 'সেক্রেড ইনটেস্টাইন।'

'মূর্তিটাকে আলমারিতে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য ! সোনার মূর্তি, আর তাতে নানা রকম পাথর বসানো। চোখ দুটো ছিল রুবি পাথরের। আমরা এত সুন্দর মূর্তি আগে কখনও দেখিনি।'

ফেলুদা বলল, 'কি রকম দাম হতে পারে সে মূর্তির ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হি পেড এ থাউজ্যান্ড রুপিজ। আমার মতে জলের দরে পেয়েছিলেন। ওর দাম দশ হাজার টাকা হলেও বেশি হত না। আমাদের কিউরেটার নিজে তিব্বত গেছেন, দালাইলামার সঙ্গে বসে মড়ার মাথার খুলিতে চা খেয়েছেন, কিন্তু তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি।'

ভদ্রলোক এর পরে আমাদের আরও অনেক জিনিস দেখিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন। ফেলুদা সে সব মন দিয়ে শুনলেও, আমার কোনও কথাই কানে ঢুকল না। আমি শুধু

ভাবছি—শেলভাঙ্কারের মূর্তির দাম ছিল দশ হাজার টাকা। এক হাজার নয়, দশ হাজার! দশ হাজার টাকার মূর্তির লোভে কি একজন আর একজনকে খুন করতে পারে না? অবিশ্যি তার পরেই আবার মনে পড়ল যে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে তার জিপে প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলেই শেলভাঙ্কার মারা গিয়েছিল। তাই যদি হয়, তা হলে তো খুনের কথাটা আসেই না।

টিবেটান ইনস্টিটিউট থেকে বেরোবার সময় আমাদের গাইড ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'যমন্তক সম্বন্ধে হঠাৎ লোকের এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না। এর মধ্যেই তোমরা ছাড়া আর একজন জিগ্যেস করে গেছে।'

'যিনি মারা গেছেন, তিনি কি?'

না না। তাঁর কথা বলছি না। আর একজন।'

'কে, মনে পড়ছে না?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ—শুধু প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না। আসলে সে দিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিলেন, আমাদের চোগিয়ালের অতিথি—তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম...'

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যখন জিপে উঠছি, তখন দেখি চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট। দিনের আলো এত শিগগিরই যাবার কথা নয়। জঙ্গল থেকে জিপ খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র বুঝতে পারলাম, পশ্চিমে ঘন কালো মেঘই এই অন্ধকারের কারণ। ড্রাইভার বলল, 'দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়ই ভাল যায়, যত দুর্যোগ রাত্তিরে।' আজ আর ঘোরাঘুরির কোনও মানে হয় না, তাই আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

গাড়িতে ফেলুদা কোনও কথা বলল না। ও যে কী ভাবছে তা বোঝার উপায় নেই, তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চলন্ত গাড়ির জানালার বাইরের সব কিছুর দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি। কোনও নতুন জায়গায় এলেই, আগেও দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়। আর

এক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর পর সব দোকানের নামই মুখস্থ হয়ে যাবে। আমি যে কবে ফেলুদার চোখ আর মেমরি পাব, তা জানি না! অবিশ্যি আমার বয়স এখন মাত্র পনের, আর ওর আঠাশ।

হোটেলে পৌঁছে যখন জিপের ভাড়া দিচ্ছি, তখন আবার শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা। এখনও সেই ব্যস্ত অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিক থেকে ফিরছেন। প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি, তার পর ফেলুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপারে একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতি মূর্তি কিনেছিলেন। একটা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন। সেই মূর্তিটা তাঁর জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেরত গেছে কিনা।'

শশধরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু আপনি ব্যাপারটা জানলেন কী করে?'

ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকান্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে, সেটা বলল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু বললেন, 'বুক পকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। হি হ্যাড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস।'

তার পর হঠাৎ মুখের ভাব একদম বদলে ফেলুদার দিকে চেয়ে একটা অবাক হাসি হেসে বললেন, 'ভাল কথা—আপনি যে ডিটেকটিভ, সেটা তো আমাকে বলেননি!'

'আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। ফেলুদারও দেখি মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কী করে জানলেন?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমি জানি, সেটা ফেলুদারই কার্ড; তাতে লেখা আছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator.

'আপনি যখন জিপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন, তখনই বোধ হয়

আপনার কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের সিটে পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। বাংলোয় যখন নামছি, তখন ড্রাইভারটা আমায় কার্ডটা দেয়। ভাল করে পড়ে দেখিনি, কারণ চশমাটা ছিল না হাতের কাছে। তার পর থেকে যা গণ্ডগোল—এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি—আর এই নিন আমার কার্ড। যদি কোনও গোলমাল দেখেন, আর মনে করেন আমার আসা দরকার—একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন—আর্লিয়েস্ট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে চলে আসব।'

'কখন যাচ্ছেন আপনি ?'

'কাল ভোরে। হয়তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আসি। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক হাত তুলে 'গুড বাই' করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

ঘরে এসে ফেলুদা বুট-মোজা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে খাটের উপর হয়ে পড়ে বলল—উফ্‌ফ্‌ !

সত্যিই, আজ এই প্রথম দিনে এত রকম ঘটনা ঘটল যে, উফ্‌ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

'ভেবে দ্যাখ', ফেলুদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ক্রিমিন্যালের যদি ন'টা মাথা হত তা হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে খপ করে ধরার আর কোনও উপায় থাকত না।'

'আর চৌত্রিশটা হাত ?'

'সেও সাংঘাতিক। চৌত্রিশ জোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না।'

বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম।

ফেলুদা তার হাতবাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল খাতাটা বের করল। তার পর শোওয়া অবস্থাতেই খাতাটা খুলে বুকের উপর রেখে পকেট থেকে কলমটা বার করে লেখার জন্য

boiRboi.net

তৈরি হল। শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন, ফেলুদা যে অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

'বল তো, এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ হল ?'

প্রশ্নটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না, তাই প্রথমটা কি রকম হকচকিয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'একেবারে বাগডোগরা থেকে শুরু করতে হবে নাকি ?'

'দূর গর্দভ। এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে, তার মধ্যে বল।'

'এক—শশধরবাবু।'

'পদবি ?'

'দত্ত।'

'তোর মুণ্ডু।'

'সরি—বোস'।

'কেন এসেছেন এখানে ?'

'ওই যে বললেন কী সুগন্ধি গাছের ব্যাপার।'

'অত দায়সারাভাবে বললে চলবে না।'

'দাঁড়াও...ভদ্রলোকের পার্টনার মিস্টার শেলভাঙ্কারকে মিট করতে! ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে, যার অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল—'

'ও. কে.—ও. কে.! নেক্সট ?'

'হিপি।'

'নাম ?'

'হেলমেট—'

'মুট। মেট নয়। হেলমুট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'পদবি ?'

'উঙ্গার।'

'আসার উদ্দেশ্য ?'

'প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই

boiRboi.net

করতে চায়। তিন দিনের ভিসা পেয়েছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে।

'নেক্সট ?'

'নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিং-এ থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা তিব্বতী মূর্তি ছিল, শেলভাঙ্কারকে—'

দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন !' ফেলুদা ভীষণ সাহেবি কায়দায় বলে উঠল।

'ডিসটার্ব করছি না তো ?' নিশিকান্ত সরকারের প্রবেশ। 'একটা খবর দিতে এলুম।'

ফেলুদা সোজা হয়ে বসে ভদ্রলোককে খাটের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। নিশিকান্তবাবু তার সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'কাল লামা ডান্স হচ্ছে।'

'কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'রুমটেক। এখান থেকে মাত্র দশ মাইল। দারুণ ব্যাপার। ভুটান কালিমপং থেকে সব লোক আসছে। রুমটেকের যিনি লামা—তাঁর পোজিশন খুব হাই, জানেন দালাই, পাঞ্চেন, তার পরেই ইনি। ইনি তিব্বতেই থাকতেন। ইদানীং এসেছেন। মঠটাও নতুন। একবার দেখে আসবেন নাকি ?'

'সকালে হবে না।' ফেলুদা ভদ্রলোককে একটা চারমিনার অফার করল। 'দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়া যেতে পারে।'

'আর পরশু যদি যান, তা হলে হিজ হোলিনেস-এর দর্শনও পেতে পারেন। বলেন তো গুটি চারেক সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি।'

আমি বললাম, 'স্কার্ফ কেন ?'

নিশিকান্ত হেসে বললেন, 'ওইটেই এখানকার রীতি। হাই ক্লাস কোন তিব্বতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্কার্ফ নিয়ে যেতে হয়। তুমি গিয়ে তাঁকে স্কার্ফটা দিলে, তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন—ব্যস, ফরম্যালিটি কমপ্লিট।'

ফেলুদা বলল, 'লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই

দেখা যাবে।'

'আমারও তাই মত। আর গেলে কালই যাওয়া ভাল। যা দিন পড়েছে, এর পরে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে বলা যায় না।'

'ভালো কথা—আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলভাঙ্কার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন ?'

নিশিকান্তবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না। 'ঘুণাক্ষরেও না। নট এ সোল। কেন বলুন তো ?'

'না—এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম, তবে তারও প্রয়োজন হয়নি। দোকানেই শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়, তার পর সোজা ডাকবাংলোয় গিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি। অবিশ্যি উনি এক দিন রেখে তার পর দামটা দিয়েছিলেন।'

'নগদ টাকা ?'

'না না। সেটা হলে আমার সুবিধেই হত, কিন্তু ক্যাশ ছিল না ওঁর কাছে। চেক দিয়েছিলেন। দাঁড়ান—'

নিশিকান্তবাবু তাঁর ওয়ালেট থেকে একটা ভাঁজ করা চেক বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমিও ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলাম। ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চেক—তলায় দারুণ পাকা সই—এস. শেলভাঙ্কার।

ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিল।

'কোথাও কোন সাস—মানে, সাসপিশাস কিছু দেখলেন নাকি ?' মুখে সেই হাসি নিয়ে নিশিকান্তবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নাঃ।' ফেলুদা হাই তুলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বাইরে একটা চোখ-ঝলসানো নীল বিদ্যুতের পর একটা প্রচণ্ড বাজের শব্দে ঘরের কাঁচের জানালা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। নিশিকান্তবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

'বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না, হেঁ হেঁ। আসি...'

যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি, যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি,

যখন ঘুমোচ্ছি তখনও এক-এক বার বাজের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে—আর বৃষ্টির শব্দ পেয়েছি। একবার ঘুম ভেঙে জানালার দিকে চোখ পড়াতে মনে হল, কে যেন জানালার বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কে আর বাইরে বেরোবে? নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল। কিংবা হয়তো ঘুমই ভাঙেনি। পাহাড়ের দিকের জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখা লাল পোশাক পরা লোকটা হয়তো আসলে আমার স্বপ্নে দেখা।

৪

কোন্ ভোরে বৃষ্টি থেমেছে জানি না। সাড়ে ছ'টায় উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, চারিদিক রোদ-ঝলমল, আর আমার ঠিক সামনের পাহাড়ের সারির পিছন দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং-এর চেয়ে অন্য রকম দেখতে, হয়তো অত সুন্দরও না, কিন্তু তা হলেও চেনা যায়, তা হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ফেলুদা আমার আগেই উঠে যোগব্যায়াম সেরে স্নানে ঢুকেছিল, এই মাত্র বেরিয়ে এসে বলল, 'চটপট সেরে নে—অনেক কাজ।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট খেতে যখন নীচে নেমেছি, সবে সাতটা বেজেছে। একটু অবাক লাগল দেখে যে, নিশিকান্তবাবু আমাদের আগেই ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি তো খুব আর্লি রাইজার মশাই?'

কাছে গিয়ে বুঝলাম, মুখে সেই হাসিটা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে কেমন যেন একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাদের, ইয়ে, মানে ভাল ঘুমটুম হয়েছিল?'

বুঝলাম আসলে ওর অন্য কিছু বলার দরকার, আগে একটু পাঁয়তাড়া কষছেন। ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শোনাল।

'মন্দ কী?' ফেলুদা বলল। 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে নিয়ে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা হলদেটে কাগজ বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'এটা কী ব্যাপার বলুন তো ?'

দেখি, কাগজটার উপর কালো কালি দিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে।

ফেলুদা বলল, 'এ তো তিব্বতি লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন ?'

'কাল রাত্রে—মানে মাঝরাত্রে—অ্যাট, মানে অ্যাট ডেড অফ নাইট—কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।'

'বলেন কী !'

আমার কিন্তু কথাটা শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। নিশিকান্তবাবুর ঘর হল আমাদের পাশের ঘর। ওটাও হোটেলের পিছন দিকে। আমাদের আর ওর ঘরের জানালার বাইরে দিয়ে একই বারান্দা গেছে, আর সেই বারান্দায় ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে হোটেলের পিছন দিকে।

'এটা রাখতে পারি ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'স্বচ্ছ্—মানে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কী লিখেছে, সেটার একটা ইয়ে না করা অবধি...'

'সেটা আর এমন কী কঠিন। তিব্বতি ভাষা-জানা লোকের তো অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক—টিবেটান ইনস্টিটিউট তো আছে।'

'হ্যাঁ। সেই আর কি।'

'তবে আর কি। আপনি চিন্তা করছেন কেন ? এটা হুমকি বা শাসানি গোছের একটা কিছু, সেটা ভাবার তো কোনও কারণ নেই। নাকি আছে ?'

নিশিকান্তবাবু চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, 'সার্টেনলি নট !'

'এমনও তো হতে পারে যে, এটায় বলা হয়েছে—তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

boiRboi.net

'তা তো বটেই। অবিশ্যি...মানে হঠাৎ...কথা নেই বার্তা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন—হেঁ হেঁ।'

'হুমকিরও কোনও কারণ নেই বলছেন ?'

'না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট ইন ফাইভ।'

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আর ডিম-রুটি অর্ডার দিয়ে বলল, 'যাক গে—এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা তো পাশের ঘরেই রয়েছি। আপনার কোনও চিন্তা নেই।'

'বলছেন ?' আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো দাঁত এক সঙ্গে দেখা গেল।

'আলবাৎ। চা খেয়েছেন ?'

'এবার খাব আর কি।'

'পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে লামা-নাচ দেখার প্রোগ্রাম আছে। কুছ পরোয়া নেহি।'

'আপনাকে যে কী বলে থ্যা—'

'থ্যাঙ্ক্‌স দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন খোয়া না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখবেন।'

জিপ ঠিক সময়ই হাজির হল। আমরা উঠতে যাব, এমন সময় দেখি আর একটা জিপ বাংলোর দিক থেকে আসছে। নম্বরটা দেখে কেমন যেন চেনা মনে হল। SKM 463—ওহো, এই নম্বরের গাড়িই তো সেই নেপালি ড্রাইভার চালাচ্ছে, যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে পার পেয়েছিল। এবার নীল কোট পরা ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম, আর তার পাশেই বসে—ও মা, এ যে শশধরবাবু !

ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল। বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হয়নি বুঝি ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'নাঃ। অবিশ্যি নেহাৎ বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম ভায়া কালিম্পং চলে যাব।'

'ওই ড্রাইভারটি তো শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল—তাই না ?'

শশধরবাবু হেসে উঠলেন। 'আপনি তো তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি। ইয়েস—ইউ আর রাইট। আমি ওকে ডেলিবারেটলি বেছে নিয়েছি। প্রথমত, গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত—বাজ কখনও একই জায়গায় দু' বার পড়ে না, জানেন তো?'

শশধরবাবু দ্বিতীয়বার গুডবাই করে বাজারের রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে চলে গেলেন। আমরা আমাদের জিপেই উঠলাম। ড্রাইভারকে বলাই ছিল কোথায় যাব, তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে রওনা দিয়ে দিলাম।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কিনা। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কাল কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না, আর আজ আকাশে এক টুকরো মেঘও নেই। বাঁ দিকে শহর অনেক দূর পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। একটা বাড়ি দেখে ইস্কুল বলে মনে হল, কারণ তার সামনেই একটা চারকোনা খোলা জায়গা, আর তার দু' দিকে দুটো খুদে খুদে সাদা গোলপোস্ট। এখনও ইস্কুলের সময় হয়নি, না হলে ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলেদেরও দেখা যেত।

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা চৌমাথা পড়ল। ডান দিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান, মাঝখানে পুলিশ, বাঁ দিকে একটা রাস্তা পিছনে নীচের দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তাটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। একটার মুখে একটা গেট—তাতে লেখা ইন্ডিয়া হাউস—সেটা পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমরা নিলাম অন্য রাস্তাটা, যেটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

মিনিট খানেক চলার পরেই রাস্তার ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম—নর্থ সিকিম হাইওয়ে।

ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল, সেটা থামিয়ে ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল, 'ইয়ে রাস্তা কিতনা দূর তক গিয়া?'

ড্রাইভার বলল, রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে, যার একটা গেছে লাচেন, আর একটা লাচুং।

দুটোরই নাম শুনেছি, দুটোরই হাইট ন' হাজার ফুটের কাছাকাছি, আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

'রাস্তা ভাল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তা ভাল, তবে 'পানি হোনেসে কভি কভি বিগড় যাতা।'

'ল্যান্ডস্লাইড হয় ?'

'হাঁ বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা বিগড় যাতা।'

শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা আর্মি ক্যাম্প পেরোতেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম। এখন নিচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের খেত দেখা যাচ্ছে। এখন ভুট্টা হয়েছে, ধানের সময় ধান হয়। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে করা খেত—ভারি সুন্দর দেখতে।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট পড়ছে, তবে তাতে সব কিলোমিটারে লেখা। প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল, তার পর মনে মনে হিসেব (৫ মাইল = ৮ কিলোমিটার) করে নেওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।

দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে, জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি, সেটা এবার বুঝতে পারলাম।

জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম নির্জন নিস্তব্ধ।

রাস্তা থেকে অনেকখানি নীচে খাদের মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, তার একটা সর সর শব্দ আছে, আর আছে মাঝে মাঝে—কে জানে কদ্দূর থেকে ভেসে আসা নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখির শিস। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আমরা যে দিকে যাচ্ছিলাম, সে দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিক দিয়ে নেমেছে ঢাল, আর ডান দিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই উপরে উঠে গেছে। এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এখন রাস্তার ধারে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোকে দেখে আর অ্যাক্সিডেন্টের

boiboi.net

কথাটা ভেবে পেটের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল।

ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল, তার পর রাস্তার বাঁ পাশটায় গিয়ে নীচের দিকে দেখে কয়েকবার খালি হুঁ হুঁ বলল। তার পর ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই ঢাল দিয়ে হ্যাঁচোড় বা প্যাঁচোড় করে কিছু দূর নেমে যাওয়া বোধ হয় খুব কঠিন হবে না। তুই এখানেই থাক। আমার মিনিট পনেরোর মামলা।'

আমি যে উত্তরে কিছু বলব, ওকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করব, তার আর সুযোগই হল না। ও চোখের নিমেষে এবড়ো-খেবড়ো পাথর আর গাছগাছড়া লতাপাতা খামচাতে খামচাতে তরতরিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। আমার কাছে কাজটা বেশ দুঃসাহসিক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ফেলুদা দেখি তারই মধ্যে শিস দিয়ে নেমে চলেছে।

ক্রমে ফেলুদার শিস মিলিয়ে গেল। আমি ভরসা করে নীচের দিকে চাইতে পারছিলাম না, কিন্তু এবার একবার না দেখলেই নয় মনে করে রাস্তার কিনারে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। যা দেখলাম, তাতে বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদা পুতুল হয়ে গেছে; না জানলে তাকে দেখে চিনতেই পারতাম না।

ড্রাইভার বলল, 'বাবু ঠিক জায়গাতেই পোঁছেছেন। ওইখানেই গিয়ে পড়েছিল জিপটা।'

ফেলুদার আন্দাজ অব্যর্থ। ঠিক পনেরো মিনিট পরে খচমচ খড়মড় শব্দ শুনে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখি, ফেলুদা যেভাবে নেমেছিল সেইভাবেই আবার এটা-ওটা খামচে ধরে উঠে আসছে। হাতটা বাড়িয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে রাস্তায় তুলেই জিজ্ঞেস করলাম—'কী পেলে?'

'গাড়ির কিছু ভাঙা পার্টস, নাট-বোল্ট, কিছু ভাঙা কাঁচ, একটা তেলচিটে ন্যাকড়া। নো যমন্তক।'

মূর্তিটা যে পাবে না সেটা আমারও মনে হয়েছিল।

'আর কিচ্ছু না?'

ফেলুদা তার প্যান্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে

একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখাল। সেটা আর কিছুই না—একটা ঝিনুকের কিংবা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতাম—মনে হয় শার্টের। আমাকে দেখিয়েই বোতামটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা উল্টোদিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। 'পাথর...পাথর...পাথর' আপন মনে বিড়বিড় করে চলেছে সে। তার পর গলা চড়িয়ে বলল, 'আর একটু তেনজিঙ্গি না করলে চলছে না।'

এবারে আর ফেলুদাকে একা ছাড়লাম না, কারণ খাড়াই খুব বেশি না, আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা জায়গা আছে, যেখানে ইচ্ছে করলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফেলুদা আগেই বলে নিয়েছিল—তুই আগে ওঠ, তোর পিছনে আমি। তার মানে হচ্ছে, আমি যদি পা হড়কে পড়ি, তা হলে ও আমাকে ধরবে।

খানিক দূরে ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন থেকে বলল—'থাম।'

একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে চারদিকটা একবার দেখলাম। ফেলুদা আবার গুনগুন করে গান ধরেছে, আর দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে পায়চারি করছে।

'হুঁ!'

শব্দটা এল প্রায় মিনিট খানেক পায়চারির পর। ফ্ল্যাট জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে, তারই একটা অংশের দিকে ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আশেপাশে ঘাস থাকলেও এই বিশেষ অংশটা ন্যাড়া। মাটি আর দু একটা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

'এখান থেকেই পাথর বাবাজী গড়িয়েছেন। লক্ষ করে দ্যাখ এইখান থেকে শুরু করে ঢাল বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নীচ অবধি। ও ঝোপড়াটা দ্যাখ—ওই ফার্নের গোছাটা দ্যাখ—কীভাবে থেঁতলেছে। এগুলো সব পরিষ্কার ইনডিকেশন।'

আমি বললাম, 'কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে?'

ফেলুদা বলল, 'নীচে তো টুকরোগুলো দেখলি। কত বড় আর

boiRboi.net

হবে ? আর এ হাইট থেকে গড়িয়ে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য একটা ছোটখাটো ধোপার পুঁটলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট ।'

'তাই বুঝি ?'

'তা ছাড়া আর কী ? এ হল মোমেন্টামের ব্যাপার । ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি । ধর, তুই যদি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আর মনুমেন্টের উপর থেকে কেউ যদি একটা পায়রার ডিমের সাইজের নুড়িপাথরও তোর মাথায় তাগ করে ফেলে, তা হলে তার চোটেই তোর মাথা ফুটি-ফাটা হয়ে যাবে । একটা ক্রিকেট বল যত বেশি হাইটে ছোঁড়া যায়, সেটাকে লুফতে তত বেশি চোট লাগে হাতে । লোফার সময় কায়দা করে হাতে টেনে নিতে না পারলে অনেক সময় তেলো ফেটে যায় । অথচ বল তো সেই একই থাকছে, বদলাচ্ছে কেবল হাইট, আর তার ফলে মোমেন্টাম ।'

ফেলুদা এবার ন্যাড়া জায়গাটার পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল, 'পাথরটা কীভাবে পড়েছিল জানিস ?'

'কীভাবে ?' আমি ফেলুদার দিয়ে এগিয়ে গেলাম ।'

'এই দ্যাখ ।'

ফেলুদা ন্যাড়া অংশটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল । আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট্ট গর্ত রয়েছে । সাপের গর্ত নাকি ?'

'যদ্দূর মনে হয়', ফেলুদা বলে চলল, 'প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিওর হয়ে বলা চলে যে একটা লম্বা লোহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল । তা না হলে এখানে এ রকম একটা গর্ত থাকার কোনও মানে হয় না । অর্থাৎ—'

অর্থাৎ যে 'কী' আমিও বুঝে নিয়েছিলাম । তবুও মুখে কিছু না বলে আমি ফেলুদাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম ।

'অর্থাৎ মিস্টার শিবকুমার শেলভাঙ্কারের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি । অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর ও নৃশংস পদ্ধতিতে কে বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল । অর্থাৎ—এক কথায়—গন্ডগোল, বিস্তর গণ্ডগোল...'

খুনের জায়গা থেকে (এখন থেকে আর অ্যাক্সিডেন্ট বলব না) হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ আছে, একটু পরে ফিরবে। আমি জানি যে, যদি জিজ্ঞেস করি কী কাজ—তা হলে উত্তর পাব না।

আমরা ফেরার পথে চৌমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; তাকে রুমটেকের নাচের কথা বলতে সেও যেতে চাইল। আর যাবেন নিশিকান্তবাবু। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? আর তার সেই হিজিবিজি তিব্বতি লেখার মানে করারই বা কী হল ?

একবার মনে হল ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় পায়চারি করে কাটিয়ে দিই। তার পর মনে হল—নাঃ, হোটেলেই যাই। সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি, ঘরে বসে সেটা পড়তে পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে।

হোটেলে ঢুকতেই দেখলাম, নিশিকান্তবাবু গোমড়া মুখ করে ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অবিশ্যি আমাকে দেখেই তাঁর সে পুরনো হাসি ফিরে এলো। বললেন, 'দাদা কই ?' বললাম, 'একটু কাজে বেরিয়েছেন ; আসবেন এক্ষুনি।'

'তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না ?'

এ আবার কি রকম প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক ? আমি কিছু বলার আগেই আবার বললেন, 'উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম ; তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং পালাতুম।'

'কেন ?' ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন। বুঝলাম, তাঁর নার্ভাসনেসটা আবার ফিরে এসেছে।

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করলেন।

'জানো ভাই—সাত জন্মে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি, অথচ এ রকম শাসানি শেষটায় আমাকে দিলে !'

'ওটার মানে বের করেছেন নাকি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'একটা অ্যাং—মানে অ্যাংজাইটি ছিল, তাই

সোজা চলে গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউটে। কাগজটা দেখালুম। কী বললে জানো? বললে, এ লেখাটার মানে হচ্ছে 'মৃত্যু'। গিয়াংফুং—না ওই জাতীয় একটা কী তিব্বতি কথা। মানে হচ্ছে ডেথ। থার্টি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে, তাও জানি।'

আমার একটু বিরক্ত লাগল। বললাম, 'শুধু তো বলেছে মৃত্যু। এমন তো বলেনি যে আপনাকেই মরতে হবে।'

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন।

'তাও বটে। মৃত্যু মানে তো এনিবডিজ ডেথ হতে পারে—তাই না?'

'কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে, তারই বা কী মানে আছে?'

কিন্তু তাও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না। আবার তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। তার পর ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল...ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল...তার মানে হাওয়া ছিল...বাইরের জিনিস হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে পড়তে পারে। এটা যদি এমনি উট্‌কো কাগজের টুকরো হয়...হয়তো ছেঁড়া পুঁথিটুথির পাতা—কাছাকাছি তো ছোটখাটো গুম্‌ফাও রয়েছে...একটা তো শহরে ঢোকার মুখটাতেই...হুঁ...হুঁ...'

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে কী দেখেছি, আমি আর সেটা বললাম না। তা হলে যেটুকু ভরসা পাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাও আর পেতেন না। শেষে যেন আর ভাবতে না পেরেই ভদ্রলোক জোর করে তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যাক্‌গে! তোমার দাদাই তো রয়েছেন। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় ভদ্রলোককে দেখে। খেলোয়াড়-টেলোয়াড় ছিলেন নাকি? না, এক্সারসাইজ করেন?'

'এককালে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন যোগব্যায়াম করেন।'

'ঠিক ধরেছি। আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে অমন ফিট বডি চোখে পড়ে না। চা খাবে?'

পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, তাই বললাম

চায়ে আপত্তি নেই। ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু' কাপ চা অর্ডার দিলেন। চা এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ফেলুদা ফিরে এল। আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যে নিশিকান্তবাবু তাঁর 'মৃত্যু'-র কথাটা ফেলুদাকে বলে দিলেন।'

ফেলুদা আর একবার কাগজটা দেখে বলল, 'আপনাকে এতটা ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে কেন সেটা আঁচ করতে পারছেন ?'

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি স্যার আকাশ-পাতাল ভেবেও এর কূল-কিনারা করতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'আর ভাববেন না। কারণ না থাকলে কেউ কারুর মৃত্যু কামনা করে না। আমার বিশ্বাস ওটা যে-ই ফেলে থাকুক না কেন, ঝড়ের রাতে অন্ধকারে ভুল করে ভুল ঘরে ফেলেছে। তিব্বতি তিব্বতিকেই তিব্বতি ভাষায় শাসায়। আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন, তাতেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে তো শাসানি মাঠে মারা—তাই নয় কি ?'

'তা তো বটেই।'

'ব্যস্—নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আর গোলমাল হলে আপনি তো আছেনই।'

'আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে-মধ্যে একটু বেশিই হয়।'

'তাই বুঝি ?'

ভদ্রলোকের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা আর কোনও রকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। আমি জানি কাঁদুনে ভিতু লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না। নিশিকান্তবাবু যদি ওর সিমপ্যাথি পেতে চান, তা হলে ওঁকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে।

আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি, ফেলুদা আবার তার নীল খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আমি ঢুকতেই বলল, 'টেলিগ্রাফ অফিসগুলোতে বেশির ভাগ লোকই যে অশিক্ষিত, সেটা আগেই জানা ছিল—তবে এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি।

'হঠাৎ টেলিগ্রাফ আপিসে কেন ?'

'শশধরবাবুকে একটা কেব্‌ল করে দিলাম। ও পৌঁছাবার আগেই

অবিশ্যি পৌঁছে যাবে—তাও দেরি করে কোনও লাভ নেই।'

'কী লিখলে?'

'হ্যাভ্ রিজ্‌ন টু সাসপেক্ট শেলভাঙ্কারস্ ডেথ নট অ্যাক্সিডেন্টাল। অ্যাম ইনভেসটিগেটিং।'

'বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলে!'

'ও। সে অন্য ব্যাপার।'

ফেলুদা নাকি টেলিগ্রাফ আপিসে কেরানিদের ঘুষ দিয়ে গত ক' দিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছিল কিনা সেটা জেনে নিয়েছে। 'একটা ছিল শশধরবাবুর টেলিগ্রাম—অ্যাম অ্যারাইভিং ফোর্টিন্‌থ।'

'আর অন্যটা?'

'পড়ে দ্যাখ্'—বলে ফেলুদা তার নীল খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER...PRITEX.

পড়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। সিক্ মনস্টার? রুগণ্ রাক্ষস? সে আবার কী?

ফেলুদা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে যে কোনও গোলমাল করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—কী গোলমাল। আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল।'

আমি বললাম, 'প্রাইটেক্স আবার কী?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। মনে হয়, ওটা কোনও গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন। TEX মানে যে ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না।'

'এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল?'

'কিছুই আশ্চর্য না।'

'আর তার মানে এই এজেন্সিটা শেলভাঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল?'

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু Sick Monster!—হরি হরি!'

আমি বললাম, 'কতগুলো রহস্য এক সঙ্গে সমাধান করবে বলো

তো।'

ফেলুদা বলল, 'সেইটেই তো ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই বেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত। বল তো দেখি একটা একটা করে।'

'এক—Sick Monster।

'তার পর?'

'পাথর কে ফেলল।'

'গুড।'

'তিন—মূর্তিটা কোথায় গেল।'

'ঠিক হ্যায়।'

'চার—নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।'

'আর, কেন ফেলল। বহুৎ আচ্ছা।'

'পাঁচ—খুনের জায়গায় কার বোতাম।'

'অবিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে পারে। যাই হোক্—বলে চল।'

'ছয়—তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে, কে মূর্তির কথা জিগ্যেস করেছিল।'

'স্‌প্লেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যে তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি।'

ফেলুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারলাম যে, আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি।

'শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার। মনে হয় তিনি শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন।'

'কে লোকটা?'

'ডক্টর বৈদ্য। যিনি ভবিষ্যৎ বলেন, আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, আর অন্যান্য যাবতীয় ভেল্‌কি প্রদর্শন করেন। শুনেটুনে লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।'

৬

রুমটেক যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে, সে পথে খানিক দূর ফিরে গিয়ে তার পর ডান দিকে একটা মোড় নিয়ে নতুন পথে সটান সিধে রাস্তায় চলতে হয়। রুমটেকের হাইট গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি, কিন্তু যাবার রাস্তা প্রথমে উৎরাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠে। ছোট ছোট গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার খেতের পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে—চারিদিকের দৃশ্য দার্জিলিং-এর চেয়ে কোনও অংশে কম সুন্দর নয়।

সকালের রোদ এখন আর নেই। হোটেলে থাকতেই মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাতে অবিশ্যি এক হিসেবে ভালই, কারণ গরমের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছু দিন আগের দুর্ঘটনার জন্যেই বোধ হয়, আমাদের ড্রাইভার খুব সাবধানে জিপ চালাচ্ছিল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর ফেলুদা। পিছনের দুটো সিটে মুখোমুখি বসে আছে হেলমুট উঙ্গার আর নিশিকান্ত সরকার। হেলমুটের পায়ের ব্যথাটা নাকি সেরে গেছে। ওর কাছে নাকি কী জার্মান মলম ছিল, তাতেই কাজ দিয়েছে। নিশিকান্তবাবুর ভয়ের ভাবটা বোধ হয় কেটে গেছে, কারণ এখন উনি গুনগুন করে হিন্দি ফিল্মের গানের সুর ভাঁজছেন। গ্যাংটক শহর এখন আমাদের উলটো দিকের পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে। মনে হয় শহরটাকে আর খুব বেশিক্ষণ দেখা যাবে না, কারণ নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

ফেলুদা এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। সেটা আশ্চর্য নয়। আমি জানি ওর মাথার ভিতর এখন সেই ছ'টা প্রশ্নের উত্তর বার করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। নেহাৎ কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল তাই, তা না হলে ও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি লিখত আর হিসেব করত।

বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন বেশ হাইটে উঠে গেছি। সামনে একটা মোড়। ড্রাইভার জিপে হর্ন দিতে দিতে সেটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে রাস্তার দু' ধারে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে বাঁশের এক খুঁটির সঙ্গে আর এক খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রঙ-বেরঙের চারকোণা নিশান। এই নিশানগুলো টাঙিয়ে দিয়ে তিব্বতিরা নাকি অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা দূরে সরিয়ে রাখে। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটা নিশানে নকশা করা আছে।

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল। এবার সেটা ক্রমশ জোর হতে আরম্ভ করল। ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গুরুগম্ভীর শিঙার শব্দ, আর তার সঙ্গে থেকে থেকে ঝম্ ঝম্ করে কাঁসা বা পিতলের ঝাঁঝের আওয়াজ, আর চড়া বেসুরো সানাইয়ের মতো আওয়াজ। এটাই বোধহয় তিব্বতি নাচের বাজনা।

রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে। তার পরে রয়েছে একটা বড় গ্যারাজ গোছের ঘর, যাতে কয়েকটা জিপ রয়েছে, আর বাঁ দিকে রয়েছে কিছু দোকান। রাস্তার দু' ধারেও কয়েকটা জিপ আর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ির দল।

আমাদের জিপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম এইটাই রুমটেক মঠের ফটক। নিশিকান্তবাবু বোধ হয় হেলমুটের খাতিরেই ইংরেজিতে বললেন, 'দ্য লামাজ আর ড্যা—মানে ড্যানসিং।' আমরা চারজনে গাড়ি থেকে নামলাম।

গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন। সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা। এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কখনও দেখিনি। চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে লোকেরা সব ভিড় করে বাবু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা করা পর্দার সামনে আট-দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর বীভৎস সব মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। বাজিয়ের

দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান দিকে। যে শিঙাগুলোতে সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ হাত লম্বা। আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট-দশ বছর বয়সের ছেলেরা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার। এমন জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিওনি বা শুনিওনি।

হেলমুট উঠোনে পৌঁছানো মাত্র পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। আজ তার কাঁধে তিনটে ক্যামেরা। ব্যাগটাও সঙ্গে রয়েছে ; তার মধ্যে আরও ক্যামেরা আছে কিনা কে জানে !

নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বসবেন নাকি ?'

'আপনি কী করছেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আমার তো এ জিনিস দেখা ; কালিমপঙে দেখেছি। আমি একটু পেছন দিকটায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসছি। শুনিচি, ভেতরে নাকি অদ্ভুত সব কারুকার্য রয়েছে।'

আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ফেলুদা বলল, 'এ সব দেখে-শুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি, সে কথা ভুলে যেতে হয়। গত এক হাজার বছরে এ জিনিসের কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'গুম্‌ফা বলে কেন ফেলুদা ?'

ফেলুদা বলল, 'এটা ঠিক গুম্‌ফা নয়। গুম্‌ফা হল গুহা। এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা চলতে পারে। এই যে উঠোনের দু' পাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিস—ওখানে সব লামারা থাকে। আর লক্ষ কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে। সব মাথা মুড়োনো, গায়ে তিব্বতি জোব্বা। এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বড় হলে সব লামাটামা হবে।'

'মঠ আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস ?'

'হ্যাঁ, মঠ—'

এইটুকু বলেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখ দুটো কুঁচকে গেছে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হঠাৎ কী মনে পড়ল ফেলুদার ?

boiRboi.net

মিনিট খানেক চুপ করে মাথা নেড়ে নিজের ওপর একটা ধিক্কারের ভাব দেখিয়ে ফেলুদা বলল, 'পাহাড়ে এলে কি তা হলে আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায় ? এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনি এতক্ষণ ?'

'কী জিনিস ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'কোনটা বুঝতে পারোনি ?'

'Sick Monster! Sick হল সিকিম, আর Monster হল মনাস্টেরি। থ্যাঙ্ক ইউ, তোপ্‌সে।'

সত্যিই তো! বুঝতে পারা উচিত ছিল। 'তা হলে পুরো টেলিগ্রামটার কী মানে দাঁড়াচ্ছে ?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে, সেই পাতাটা খুলে ফের পড়ল—

'YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER—গোড়ার দিকটায় কোনও গোলমাল নেই। Is-টাকে In করে নে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে—ইয়োর সান মে বি ইন এ সিকিম মনাস্টেরি। তোমার ছেলে হয়তো সিকিমের কোনও মঠে রয়েছে। ব্যস্—পরিষ্কার ব্যাপার।'

'তার মানে শেলভাঙ্কারের যে-ছেলে চোদ্দ না পনের বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে এখন এখানে রয়েছে ?'

'প্রাইটেক্স তো তাই বলছে। এখন, প্রাইটেক্সের কেরামতির দৌড় যে কতখানি, তা তো জানি না। তবে এটা ঠিক যে, শেলভাঙ্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা আঁচ করে থাকে, তা হলে তার মনে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে ছেলেকে ভালোবাসত, অনেক দিন ধরে তার খোঁজ করেছে।'

'ও যে সে-দিন কোন্ একটা গুম্ফায় যাচ্ছিল, সেটাও হয়তো টেলিগ্রামটা পাবার পরই ছেলের সন্ধানে।'

'কোয়াইট পসিব্ল। আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে এ তল্লাটে, তা হলে অবিশ্যি...'।

ফেলুদা আবার চুপ করে গেল। মনে পড়ল, শশধরবাবু বলেছিলেন শেলভাঙ্কারের ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে যায়। তার মানে সে তার বাপের শত্রু।

'উইল...উইল...উইল', ফেলুদা আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। 'শেলভাঙ্কার যদি উইলে তাঁর ছেলেকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে সে অনেক টাকা পাবে।'

ফেলুদা ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমিও। বেশ বুঝতে পারলাম, টেলিগ্রামের মানে করতে পেরে ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ দিকে ও দিকে দেখছে সে। ভিড়ের মধ্যে অ-তিব্বতি ভারতীয় চেহারা খুঁজছে কি ?

আমরা দুজনেই ভিড়ের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। বাঁ-দিকের একতলা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে আমরা চললাম মঠের বাড়িটার দিকে—যে দিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকান্তবাবু গেছেন। পিছন দিকটায় ক্রমে ভিড় হাল্কা হয়ে এসেছে। দু'-একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম ঘরের দরজায় চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়ে চলেছে, তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকানো যে, দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই। এদের বেশির ভাগেরই গোঁফ-দাড়ি কামানো, কিন্তু এক-এক জনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও, ঠোঁটের দু' পাশে সরু ঝোলা গোঁফ রয়েছে—যেমন কোনও কোনও চিনাদের থাকে।

পর্দার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনাস্টেরির দালানের বারান্দায় পৌঁছালাম। দেয়ালে বোধ হয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই নানা রকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে। বারান্দার পিছনে অন্ধকার হলঘর রয়েছে, তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকতে হয়।

আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দু' জনে চৌকাঠ পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম। স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে। কিন্তু অন্ধকার হলে কী হবে—তার মধ্যেই চারদিকের রঙিন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে—তিন-তলা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য

কাজ-করা সব সিল্কের নিশান। ঘরের দু' দিকে রঙিন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে, প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মতো কয়েকটা জিনিস খুঁটিতে দাঁড় করানো রয়েছে। আর পিছন দিকের সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদিতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ না, সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারি মুশকিল।

কাছে গিয়ে দেখলাম, এই সব বড় বড় মূর্তির পায়ের কাছে আরও অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে, নানা রকম ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আর ছোট ছোট পেতলের পিদিমে আগুন জ্বলছে।

এই সব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ফেলুদা আমার পিঠে হাত দিল। ঘুরে দেখি, ও দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে। এটা সামনের মেন গেট নয়, পাশের একটা ছোট দরজা।

'বাইরে আয়।'

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি, ডান দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে।

'কোন্ দিকে গেল লোকটা জানি না; তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

'কোন লোকটা?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল। আমি চাইতেই সট্‌কাল।'

'মুখটা দেখোনি?'

'আলো ছিল না।'

দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিশনের লামা থাকেন নাকি? বাঁ-দিকে খোলা ছাত, এখানে-ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে—ভোঁ ভোঁ ভোঁ ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং। এদের নাচ নাকি এক বার শুরু হলে সাত-ঘণ্টার আগে থামে

boiRboi.net

না।

আমরা ছাত দিয়ে হেঁটে উলটো দিকের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছনে পাহাড়ের দৃশ্য আবছা কুয়াশায় ক্রমে ঢেকে আসছে। ডান দিকের মঠের পিছন দিয়ে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে, তার উপর দিকটায় দেখলাম এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশের খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত-তাড়ানো নিশান আস্তে আস্তে কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে।

'শেলভাঙ্কারের ছেলে যদি এখানে—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা বিকট চিৎকারে আমরা দু'-জনেই চমকে থ' মেরে গেলাম।

'ওরে বাবা—ওঃ! হেল্‌প! হেলপ!'

এ যে নিশিকান্তবাবুর গলা!

আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুদা দেখি দৌড় দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে মঠের পিছন দিকের দরজা খুঁজে বার করতে সময় লাগল এক মিনিটেরও কম। দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি, দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল, তাই উঠতে কোনও অসুবিধা হল না। কোন্ দিকে যেতে হবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, কারণ 'হেল্‌প, হেল্‌প' চিৎকারটা এখনও আমাদের হেল্‌প করছে।

খানিক দূর উঠে একটা ফ্ল্যাট জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছালাম, সেটা পাহাড়ের কিনারা। তার পরেই খাদ, তবে সে খাদ বেশি দূর নামেনি—বড় জোর একশো ফুট। আর তাও ধাপে ধাপে। এরই একটা ধাপে—বোধ হয় দু' হাতের বেশি চওড়া নয়—একটা গাছড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা চোখ উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন—মরে গেলুম। বাঁচান!

নিশিকান্তবাবুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তাঁকে জাপটে

ধরে টেনে তোলামাত্র ভদ্রলোক চোখ উলটে ভিরমি দিলেন। অবিশ্যি জিপে এনে চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল।

'কী ব্যাপার বলুন তো'—ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু কঁকিয়ে উঠে বললেন, 'আরে মশাই, কী আর বলব—এই এতখানি পথ—একটু হাল্‌কা হবার দরকার পড়েছিল—তা ধর্মস্থান—মানে মানস্‌—মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি—তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি—ঝোপঝাড়ের তো অভাব নেই—তা জায়গাও পেলুম সুটেব্‌ল—কিন্তু আমাকে যে আবার কেউ ফলো করছে, তা কী করে জানব বলুন!'

'পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল?'

'সেন্ট পারসেন্ট। কী সাং—মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! নেহাৎ হাতের কাছে একটা গাছ পেলুম বলে—নইলে তিব্বতি শাসানি তো, মানে, অক্ষরে অক্ষরে—'

'লোকটাকে দেখেছেন?'

'পেছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারলে আবার দেখা যায় নাকি—হে!'

boiRboi.net

এই দুর্ঘটনার পর রুমটেকে থাকার কোনও মানে হয় না—হয়তো নিরাপদও নয়—তাই আমরা আবার বাড়িমুখো রওনা দিলাম। হেলমুটের একটু আপসোস হল, কারণ ও বলল, ছবি তোলার এত ভাল সাবজেক্ট ও এসে অবধি আর পায়নি। তবে নাচ আগামীকালও হবে, তাই ইচ্ছে করলে আর একবার আসতে পারে।

ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল—বোধ হয় চিন্তা করছিল—কারণ ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে, ওর মতো পরিষ্কার মাথাও হয়তো গুলিয়ে আসছিল। এবার সে নিশিকান্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, 'মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা বোধ হয় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছেন।'

'দায়িত্ব?' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেন পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে

না।

'আপনি কার পিছনে লেগেছেন সেটা না বললে তো কে আপনার পিছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।'

নিশিকান্তবাবু ঢোক গিলে দু' হাত তুলে কান মলে বললেন, 'কী সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন—আমি বলছি—জ্ঞানত আমি কোনও লোকের কোনও অনিষ্ট করিনি, কারও পিছনে লাগিনি—এমন কি কারও বদনাম পর্যন্ত করিনি।'

'আপনার কোনও যমজ ভাই-টাই নেই তো?'

'আজ্ঞে না স্যার। আই অ্যাম ওন্‌লি অফ্‌স্প্রিং।'

'হুঁ...। মিথ্যে বললে অবিশ্যি আপনিই ঠকবেন। কাজেই ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু...'

ফেলুদা চুপ করে গেল। আর সেই যে চুপ করল, সে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত।

ডাকবাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জিপের ভাড়ার শেয়ার দিতে যাওয়াতে ফেলুদা বাধা দিল—'তোমাকে তো আমরাই ইনভাইট করেছি, আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি—কাজেই তোমার পয়সা তো আমরা নেব না।'

'অল রাইট—হেলমুট হেসে বলল, 'তা হলে একটু বসে চা খেয়ে যাও।'

নিশিকান্তবাবুরও আপত্তি নেই দেখে আমরা তিনজনেই জিপটার পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে, বাংলোয় হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

তিনজনে চেয়ারে বসেছি। হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে চায়ের অর্ডার দিতে যাবে, এমন সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি, একজন অদ্ভুত চেহারার ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে 'হ্যালো' বললেন। ভদ্রলোকের মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে, গায়ের উপর দিকে একটা গলাবন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ সিকিম জ্যাকেট, আর তলার দিকে ঢিলে ফ্লানেলের পাতলুন। তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও

রয়েছে—যাকে বোধহয় বলে যষ্টি।

হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই—ইনিই ডক্টর বৈদ্য।'

৭

'আপনাদের দেখিয়ে বঙ্গালি মনে হতেছে।'

ডাক্তার বৈদ্য ঠিক আমার পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

ফেলুদা বলল, 'ঠিকই বলেছেন।... আপনার কথা আমরা আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি।'

'হেলমুট ইজ এ নাইস বয়।'

ভদ্রলোক ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিন রকম ভাষা মিশিয়ে কথা বলে গেলেন।

'তবে হেলমুটকে আমি বলেছি যে এদেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে যার যত বেশি ছবি তোলা হবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে। কারণ, এই যে আমি, এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনও বস্তুতেও থেকে থাকে, তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই অন্য বস্তুর মধ্যে রয়েছে। এবং সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে।'

'আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'করলেই বা কী?' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন। 'হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে? তবে কোনও জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না। এখনও অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে, অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক পরীক্ষা করতে হবে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু আপনি তো সে সব না করেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন।'

'সব সময় না।' বৈদ্য একটু মুচকি হাসলেন। 'পারিপার্শ্বিক

অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। যেমন—' বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর দিকে আঙুল দেখালেন '—ওই ভদ্রলোকটি কোনও কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।'

নিশিকান্তবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?'

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তার পর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এজেন্ট।'

'এজেন্ট?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন, আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।'

নিশিকান্তবাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ অল। আমি আর শুনতে চাই না।'

বৈদ্য হেসে বললেন, 'আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিগ্যেস করলেন, তাই বললাম। স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। তবে একটা কথা বলতে চাই—বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কাইন্ডলি এক্সপ্লেন', বললেন নিশিকান্তবাবু।

'এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চা এসে গিয়েছিল। হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিগ্যেস করে দুধ-চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের সঙ্গে তো মিস্টার শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল।'

বৈদ্য মাথা নেড়ে বলল, 'বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে তো কারও কোনও হাত নেই। দোরোম জোরোবিচিতেও বলেইছে—

হ্রেম দোরমোং দোরজি সিংচিয়াম্
ওম্ পিরিয়ান হোতোরিবিরিচিয়াং !'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চা খেলাম। হেলমুট এই ফাঁকে তার টেবিলটা গোছগাছ করে নিল। নিশিকান্তবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে করে বসে আছেন—বুঝতে পারছি তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—কিন্তু খাবার কথাটা তাঁর যেন মনেই আসছে না। এর মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদাকে। কিংবা তার মনে উদ্বেগ থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে না, দিব্যি একটার পর একটা বিস্কুট খেয়ে চলেছে।

বাইরে রোদ পড়ে আসছে। হেলমুট সুইচ টিপল, কিন্তু বাতি জ্বলল না। কী ব্যাপার ? নিশিকান্তবাবু বললেন, 'পাওয়ার গেছে। এটা প্রায়ই ঘটে।'

'বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি' বলে হেলমুট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার ফেলুদা ডক্টর বৈদ্যকে আর একটা প্রশ্ন করল।

মিস্টার শেলভাঙ্কারের মৃত্যু কি সত্যিই আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস ?'

ডক্টর বৈদ্য হাতের পেয়ালা সামনের বেতের টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে পেটের উপর জড়ো করে বললেন, 'এ কথার উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে।'

'কে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'যে মৃত—একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই। আমাদের জীবিতকালে অজস্র অবান্তর জিনিস আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। ওই যে জানালা খোলা রয়েছে—সে জানালা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আকাশ দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি, আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এ সব হল অবান্তর জিনিস—নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এ সব দৃশ্যবস্তু বাধাস্বরূপ। অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দিই, তা হলে কী দেখব ? ঘরে যদি আলো না থাকে, তা হলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কী

boiRboi.net

থাকে ? অন্ধকার। জীবন হল আলো, আর জীবন হল ওই জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানালার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।'

এত বড় বক্তৃতা একটানা শুনে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল যে ফেলুদা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে। ও বলল, 'তা হলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাঙ্কারই একমাত্র জানেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল ?'

'মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়তো জানত না—কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।'

কেন বলতে পারি না—আমার একটু গা ছমছম করতে শুরু করেছিল। হয়তো অন্ধকার বেড়ে আসছে বলেই ; আর মৃত্যু-টিত্যু নিয়ে এত কথাবার্তা, আর ডক্টর বৈদ্যর চশমার কাঁচে বেগুনি মেঘে ভরা আকাশের ছায়া, আর তাঁর অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গলার স্বর, এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও কেমন যেন থমথমে মনে হচ্ছিল।

বেয়ারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় টেবিলের উপর একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে চলে গেল। ফেলুদা সবাইকে চারমিনার অফার করল, আর সবাই রিফিউজ করল। তখন ও একাই একটা সিগারেট ধরিয়ে পর পর দুটো রিং ছেড়ে বলল—'মিস্টার শেলভাঙ্কারের মতামতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।'

boiRboi.net

ফেলুদা অবিশ্যি প্ল্যানচেট-ট্যানচেট নিয়ে বই পড়েছে। ও বলে যে-জিনিসে বিশ্বাস নেই—সেই নিয়ে বইও পড়া উচিত না—এ কথাটা আমি মানি না। কারণ, যে বইটা লিখেছে, তার মতামতটা জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা। ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তাদের মানুষ সম্বন্ধে জানতেই হবে, আর মানুষ বলতে সব রকম মানুষই বোঝায়, কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না।

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে হাত দুটো উপরে তুলে বললেন, 'দরজা এবং জানালা দুটো বন্ধ করো।'

কথাটা বললেন, হুকুম করার ভঙ্গিতেই, আর সে হুকুম পালন করলেন নিশিকান্তবাবু। মনে হল তিনি যেন হিপ্‌নোটাইজড্ হয়ে প্রায় যন্ত্রের মানুষের মতো কাজটা করলেন।

জানালা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হল্‌দে আলো ছাড়া ঘরে আর কোনও আলোই রইল না।

আমরা সবাই বেতের টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম। আমার ডান পাশে বৈদ্য, বাঁ পাশে ফেলুদা। ফেলুদার অন্য পাশে নিশিকান্তবাবু। আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট। ডক্টর বৈদ্য এবার বললেন, 'তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের উপর রাখো। প্রত্যেকের হাত তার দু' পাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই।'

ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের 'আপ' আর 'আপনি' বলে বলছিলেন, এবার দেখলাম 'তুম' আর 'তুমি' আরম্ভ করলেন।

আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে টেবিলে রাখলাম। সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেলমুটের হাতের মাঝখানে তাঁর নিজের হাত দুটো গুঁজে দিলেন। পাঁচ দশে পঞ্চাশটা উপুড় করা হাতের আঙুল এখন ফুলের পাপড়ির মতো মোমবাতিটাকে গোল করে ঘিরে বেতের টেবিলের উপর রাখা হয়েছে।

'তোমরা সবাই একদৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো।'

ঘরে বাতাস ঢোকার কোনও রাস্তা নেই, তাই মোমবাতির শিখা একেবারে স্থিরভাবে জ্বলছে। অল্প অল্প করে মোম গ'লে বাতির গা বেয়ে গড়িয়ে বেতের বুনুনির ওপর জমা হচ্ছে। একটা ফড়িং জাতীয় পোকা ঘরের ভিতরে ছিল, সেটা বাতির শিখার চারিদিকে পাক খেতে আরম্ভ করল।

কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না। সত্যি

বলতে কী, দু'-এক বার যে আড়চোখে ডক্টর বৈদ্যর দিকে চেয়ে দেখিনি, তা নয়—কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি, কারণ তাঁর চোখ বন্ধ।

হঠাৎ—যেন অনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে—এইভাবে চিঁ চিঁ করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল—'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ?'

ফেলুদা বলল, 'শেলভাঙ্কার কি অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিল ?'

আবার সেই চিঁচিঁ গলায় উত্তর এল—'নো।'

'তা হলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি ?'

কিছুক্ষণ সব চুপ। এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথা পিছন দিকে হেলানো। হেলমুট দেখলাম তার নীল নিষ্পলক চোখে ডক্টর বৈদ্যকে দেখছে। নিশিকান্তবাবুর কুতকুতে চোখও তাঁরই দিকে।

ঘরে হঠাৎ এক ঝলক নীল আলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এবার আরও পরিষ্কার গলায় উত্তর এল—

'মার্ডার।'

'মার্ডার !' এটা নিশিকান্তর গলা—শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে গেছে। কথাটা একটানা বলতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'মা-হা-হারা-ডার !'

'কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি ?' আবার ফেলুদাই প্রশ্ন করল।

আমার বুকের ভিতরে অসম্ভব ঢিপঢিপানি আরম্ভ হয়েছে। নিশিকান্তবাবুর মতো আমারও গলা শুকিয়ে এসেছে। নেহাৎ কথা বলতে হচ্ছে না বলে, না হলে আমিও ধরা পড়ে যেতাম।

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ। ফেলুদা দেখলাম একদৃষ্টে ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে। ভদ্রলোক কয়েকবার খুব জোরে জোরে—যেন বেশ কষ্ট করে—নিশ্বাস নিলেন। তার পর উত্তর এলো—'বীরেন্দ্র।'

বীরেন্দ্র ? সে আবার কে ?

ফেলুদাও নিশ্চয়ই এটা জানতে চাইত, কিন্তু ডক্টর বৈদ্য হঠাৎ

boiRboi.net

তাঁর হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চোখ খুলে বললেন, 'এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ।'

হেলমুট মোড়া থেকে উঠে গিয়ে তার টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্‌ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে বৈদ্যকে দিল। ভদ্রলোকের জল খাওয়া শেষ হলে পর ফেলুদা বলল, 'বীরেন্দ্র যে কে, সেটা বোধ হয় জানার কোনও সম্ভাবনা নেই?'

উত্তর এল হেলমুটের কাছ থেকে।

'বীরেন্দ্র মিস্টার শেলভাঙ্কারের ছেলের নাম। আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয়—অনেকবার।'

জানালা খুলে দিতে গিয়ে দেখি, বাইরে ইলেকট্রিকের আলো দেখা যাচ্ছে। হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল, কারণ ও সুইচ টিপে দিল, আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। আমরা সকলেই উঠে পড়লাম।

ডক্টর বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে।'

নিশিকান্তবাবু একটু হেঁ হেঁ করলেন।

'যাক্‌ গে' ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'মনে হয় আপনার ফাঁড়া কেটে গেছে।'

'ওঃ!' আহ্লাদে হাঁফ ছেড়ে নিশিকান্তবাবু তাঁর সব ক'টা দাঁত বার করে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ক' দিন আছেন?'

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'কাল দিনটা ভাল থাকলে পেমিয়াংচি যাবার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।'

'আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করছেন?'

প্রাচীন সভ্যতা বলতে তো ওই একটিই বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া—এ সব তো বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে কী আছে বলুন—সবই পাঁচমেশালি। যা ছিল তিব্বতেই ছিল—একেবারে খাঁটি অবস্থায়—এই সে দিন পর্যন্ত। এখন তো আর তিব্বতে যাবার কোনও মানে হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে ?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে।'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন।

'নুন ?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই !'

৮

আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়—বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দু' বেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নলি-হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ডিসেন্ট লোক মশাই।'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কি রকম সব বলে-টলে দিলে।'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার তো ভাল লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে—আর কী চাই !'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি ?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায়, তা হলে হবে নিশ্চয়ই। এখনও তো সে স্টেজে পৌঁছায়নি। এমনিতে এ সব লোকের উপর চট্ করে

সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে।'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন।

'নূন?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই!'

৮

আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়—বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দু' বেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নলি-হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ডিসেন্ট লোক মশাই।'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কি রকম সব বলে-টলে দিলে।'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার তো ভাল লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে—আর কী চাই!'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায়, তা হলে হবে নিশ্চয়ই। এখনও তো সে স্টেজে পৌঁছায়নি। এমনিতে এ সব লোকের উপর চট্‌ করে

শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। এত বুজরুকের দল আছে এ লাইনে।'

'কিন্তু সত্যিকার গুণী লোকও তো থাকতে পারে। এঁর কথাবার্তার স্টাইলই আলাদা। শুনলেই ইম্প্রেস্ড হতে হয়। আর যদি ধরুন গিয়ে মার্ডার হয়েই থাকে...'

ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল ; কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না। হয়তো মনের মধ্যে কোনও খট্‌কা রয়েছে। এত ভাল মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যেতে চাইছে না।

'মার্ডারের কথা যে বললেন উনি, সেটা আপনার বিশ্বাস হয়?' নিশিকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'হয়।'

'হয়?'

'হয়।'

'কেন বলুন তো।'

'কারণ আছে।'

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা।

খাবার পরে কালকের মতোই দুজনে পান কিনতে বেরোলাম। বৃষ্টি এখনও নামেনি, তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু'-এক জন নতুন লোককে হাঁটতে দেখলাম। তারা সবাই বিদেশী, বোধ হয় আমেরিকান। এ সব বিদেশী টুরিস্টরা সাধারণত এসে 'নরখিল' বলে একটা হোটেলে থাকে ; ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল।

ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ থেমে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন আছে, সেরে ফেলি গে। তুই বরং এক কাজ কর। কাছাকাছির মধ্যে একটু ঘুরে আয়। আমি আধঘন্টা আন্‌ডিস্‌টার্বড কাজ করতে চাই।'

ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল। ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে বা সাহস কোনওটাই আমার নেই—বিশেষ করে তদন্তের এই জট-পাকানো অবস্থায়।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই বেশি। হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ দোকানের সামনে কয়েকটা নেপালি গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে। মাঝে মাঝে ঘুঁটি নাড়ার শব্দ আর তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন। তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগ্গির আসবে। ধীরে ধীরে তোড়জোড় চলেছে, নামবে গিয়ে হয়তো সেই মাঝরাত্রে।

রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই, আর উপর দিক থেকে পড়ে বলে চেনা লোকের মুখ চিনতে সময় লাগে।

উল্টো দিক থেকে কে যেন আসছে। এখনও প্রায় বিশ-ত্রিশ গজ দূরে। এবার একটা আলোর তলায় এসে পড়াতে মাথার ব্রাউন চুলগুলো চক্‌চক্ করে উঠল।

পরের আলোটায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম হেলমুটকে। সে অন্যমনস্ক ভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে।

এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট। তার ভুরু কুঁচকানো, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল, অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না।

আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর ক্রমে-ছোট-হয়ে-যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম।

ঘরে এসে দেখি, ফেলুদা বুকের উপর খাতা খুলে চিত হয়ে খাটে শুয়ে আছে। বললাম, 'আধঘন্টা হয়ে গেছে ফেলুদা।'

ফেলুদা বলল, 'সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।'

আমি বললাম, 'বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার যে সাসপেক্ট, সেটা তো আগেই জানতাম। শুধু নামটা জানা ছিল না। ডক্টর বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'লোকটা ভেল্‌কি দেখিয়েছে

ভালই। অবিশ্যি, এমন ভেল্‌কি যে সম্ভব নয় তা বলছি না। আর আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে, বৈদ্যর শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলভাঙ্কার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল, সেটা না জানা অবধি এই বৈদ্যটি ভণ্ড-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য সেটা জানা যাবে না।'

'কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।'

'জলের মতো সোজা। নিশিকান্ত যে-রেটে নখ কামড়াচ্ছিল, তার নার্ভাসনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।'

'আর মার্ডার?'

'মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এসেনশিয়ালি নাটুকে। অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় পছন্দ করে, লোককে চমকে দিতে ভালবাসে। এটা মানুষের অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা।'

'তা হলে সাস্‌পেক্ট কাকে কাকে বলতে হয়?'

'যথারীতি সকলকেই।'

'ডক্টর বৈদ্যও?'

'হোয়াই নট? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।'

'আর হেলমুট?' আমি হেলমুটের ঘটনাটা বললাম।

ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হল না। বলল, হেলমুটও যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি। ও বলছে প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার, সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে, অথচ রুমটেকে যে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই তো খট্‌কার কারণ রয়েছে।'

'তার মানে কী হতে পারে?'

'তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও একটা কারণ রয়েছে, যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।'

ফেলুদা আরও কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল। আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না। আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু কোনওটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি। একবার মনে

হল ফেলুদার পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ও একা কেন সমস্ত ব্যাপারটা ঘাড়ে নিচ্ছে? শেলভাঙ্কারকে যে-ই খুন করুক না কেন, সে যে একটা ডাকসাইটে ক্রিমিন্যাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে, আর ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে? কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, পুলিস যদি ফেলুদার আগে খুনীকে ধরে ফেলে, তা হলে সেটা আমার মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একাই করুক। যদি ও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে, তা হলে ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যাবে।

পৌনে এগারটার সময় নিশিকান্তবাবু দরজায় টোকা মেরে 'গুড নাইট' করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম। জুল ভার্নের 'কার্পেথিয়ান কাস্‌ল'। জানি খুব ইন্টারেস্টিং বই, কিন্তু তাও মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে চোখ বুজলাম। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি, ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে।

মনে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক না কেন—রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি। সকালে যখন উঠেছি, তখন জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে। ফেলুদা ঘরে নেই—বোধ হয় স্নান করতে গেছে।

যেখানেই যাক্—যাবার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা কাগজ অ্যাশ-ট্রে চাপা দিয়ে রেখে গেছে—বোধ হয় আমারই দেখার জন্য।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—আমাদের চেনা একটা তিব্বতি কথা—যার মানে হল মৃত্যু।

৯

আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি। ও খুব ভোর থাকতে উঠে নীচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে। বম্বেতে ট্রাঙ্ক-কল। আমি স্নান-টান সেরে নীচে গিয়ে দেখি, ফেলুদা

টেলিফোনে কথা বলছে। শেষ হলে পর জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?' ও বলল, 'শশধরবাবু বম্বেতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বোধ হয় এখানেই আসছেন। আমার আগের টেলিগ্রামটাতে হয়তো কাজ হয়েছে।'

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

এক্সপেরিমেন্টটা কী, সেটা আর আগে থেকে জিগ্যেস করতে সাহস হল না। কোথায় সেটা হবে জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। নিরিবিলি ঘর হলে হবে কিনা জিগ্যেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল, 'তোর মুণ্ডু ! ঘর তো হোটেলেই রয়েছে। চাই একটা রাস্তা, যেখানে লোকজনের ভিড় নেই। কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে।'

সত্যি বলতে কি, এই দু' দিনে গ্যাংটকের একটামাত্র রাস্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি। তাই একটু হেঁটে বেড়াবার ছুতো পেয়ে ভালোই লাগছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রোদের বেশ ঝাঁঝ, তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পরেছেন। বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা ?'

ফেলুদা বলল, 'শহরটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাব—প্যালেসের ও দিকে।'

'আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে। আজ দিনটা ভাল আছে। এ গুড ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি। আপনারা না এলে কিন্তু একটা খুব ভাল জায়গা মিস্ করবেন।'

'যাবার তো ইচ্ছে আছে।'

'আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন। গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক ?'

ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুখোড় আছেন বাবাজী। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি, ও-ও তেমনই উল্টে আমাকে সন্দেহ করছে। হয়তো বুঝে ফেলেছে যে, আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'কিন্তু তোমাকে তো সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা। খাটের উপর কাগজটা দেখলাম যে।'

'এটা কি নতুন জিনিস হল ?'

'তা অবিশ্যি নয়।'

'তবে ! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, ওই একটা তিব্বতি কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব, তা হলে তুই ফেলু মিত্তিরকে এখনও চিনিসনি।'

মুখে সেটা না বললেও, মনে মনে বললাম যে, যদি কেউ ফেলু মিত্তিরকে চেনে তবে সেটা আমিই। বাদশাহী আংটির ব্যাপারে হুমকি সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেলুদা, সেটা তো আমি দেখেছি।

চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় দার্জিলিং-এর ম্যালের মতো—খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। সেটার মাঝখানে একটু নীচে রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে। আবার সেটার মাঝখানে একটা হল্‌দে কাঠের পোস্টে এদিকে-ওদিকে পয়েন্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে। ডান দিকে যে ফলকটা পয়েন্ট করা, তাতে লেখা রয়েছে 'প্যালেস'। ডান দিকে চেয়ে দেখলাম, দু' ধারে গাছের সারিওয়ালা একটা সোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা বাহারের গেট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, ওটাই হল প্যালেসের গেট।

বাঁ দিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে 'নাথুলা রোড।' আশেপাশে কোনও লোকজন নেই। দূরে প্যালেসের রাস্তায় কালকের দেখা বিদেশী টুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে পায়চারি করছে।

ফেলুদা বলল, 'লক্ষণ ভালই। চ' বাঁদিকে চ'।'

যে নাথুলা রোড দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাওয়া যায়, সেটা দিয়ে আমি আর ফেলুদা এগিয়ে চললাম এক্সপেরিমেন্টের

উদ্দেশ্যে। রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে। ফেলুদা বাঁ দিকের খাড়াই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে। এ দিকটা শহরের পুব দিক। কাঞ্চনজঙ্ঘা হল পশ্চিম দিকে। এ দিকে বরফ দেখা যায় না, তবে নীচে বহু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখা যায়। আর-একটা জিনিস যেটা দেখা যায়, সেটা হল রোপ-ওয়ে। শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে ঝুলন্ত গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাড়ের এ-মাথার এক স্টেশন থেকে ও-মাথার আর-এক স্টেশনে।

রোপ-ওয়ে দেখতে এত ভাল লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম ডাকটা শুনতেই পাইনি। তার পর শুনলাম, 'অ্যাই তোপ্‌সে—এদিকে আয়!'

পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে উঠে গেছে ফেলুদা, আর সেখান থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমিও উঠে গেলাম। ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে—সাইজে সেটা একটা পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মতো।

'এই পাথরের পাশে দাঁড়া।'

দাঁড়ালাম। এ রকম বাধ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনও গোয়েন্দা কখনও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

'আমি যাচ্ছি নীচে। ও দিক থেকে এ দিকে হেঁটে যাব। আমি যখন বলব, তখন তুই পাথরটা ঠেলে নীচের দিকে গড়িয়ে দিবি। যেভাবে রয়েছে পাথরটা, বুঝতেই পারছিস একটা ঠেলা দিলেই ওটা নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে। পারবি তো?'

'জলের মতো সোজা।'

ফেলুদা নীচে নেমে যে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিকটায় চলে গেল। তার পর শুনতে পেলাম ওর হাঁক—'রেডি?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম 'রেডি'—আর তার পরেই পেলাম ফেলুদার পায়ের আওয়াজ।

আমার লাইনে আসার আট-দশ পা আগেই ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল—'গো!' আমি পাথর ঠেলে দিলাম। ফেলুদা হাঁটা থামাল না। দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই ফেলুদা

boiRboi.net

তার অন্তত দশ-পা সামনে এগিয়ে চলে গেছে।

'দাঁড়া!'

ফেলুদা ফিরে এল, সঙ্গে পাথর।

'এবার তুই নীচে যা। তোকে হাঁটতে হবে। হাঁটা থামাবি না। আমি পাথর ফেলব। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাগ করে আসছে—হয়তো তোর গায়ে এসে লাগবে—তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি তো?'

'জলের মতো সোজা।'

এবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম—আড়চোখ পাহাড়ের দিকে। ফেলুদা খুব হিসেব করে জিভটিভ কামড়ে একটা বিশেষ টাইমে পাথরটাকে মারল ঠেলা। আমি থামলাম না। লাফিয়ে পাশ কাটানোরও দরকার হল না। পাথর আমি পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় পড়ে দুটো পাক খেয়ে ডান দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে চলে গেল।

ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কী আর করি—আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'কী মূর্খ আমি! কী মূর্খ! এই সহজ—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত পাশে সরিয়ে আনলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাঁই এক সেকেন্ড আগে যেখানে ফেলুদা ছিল, সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তছনছ করে দিয়ে, রাস্তায় একবার মাত্র ঠোক্কর দিয়ে পিছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদা 'জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ নয়' বলে আমার হাত ধরে টেনে একেবারে রাস্তায়। তার পর দুজনে আর টুঁ শব্দটি না করে পা চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। একটা মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল। ফেলুদা খালি একবার মৃদুস্বরে বলল, 'থ্যাঙ্কস্, তোপ্‌সে।' তার দিকে চেয়ে দেখি, সে গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার মনের যে কী

অবস্থা, সে আর বলে কাজ নেই।

কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল। অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের মতো দেখতে। আমরা তার ভিতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে হাঁপ ছাড়লাম। ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল—

'কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?'

বললাম, 'না। অনেক উঁচু থেকে পাথরটা এসেছিল। আমি যখন দেখেছি, তখনই তার ভেলোসিটি অনেক।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে একটা টান দিয়ে বলল, 'আর ঢিলেঢালা ভাব চলবে না। একটা কুইক্ এস্‌পার-ওস্‌পার হওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু অনেক প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা।'

'কে বললে তোকে?' ফেলুদা খেঁকিয়ে উঠল। 'কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আড়াইটে। ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না। এক্সপেরিমেন্ট সাক্‌সেসফুল। যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু সেটাকে অ্যাক্সিডেন্টের চেহারা দেবার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল। মিস্টার শেলভাঙ্করকে অজ্ঞান করা হয়েছিল আগেই। তার পর তাকে জিপ সমেতো খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, তার পর সব-শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।'

'কিন্তু তা হলে...ড্রাইভারটা যে...'

'ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।'

'কিংবা ড্রাইভার তো নিজেই খুন করে থাকতে পারে?'

'না। কারণ, মোটিভ কী? তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 463।'

boiRboi.net

কিন্তু দুঃখের বিষয় SKM 463-এর খোঁজ করে তাকে পাওয়া গেল না। সে গাড়ি কাল রাত্রেই নাকি শিলিগুড়ি চলে গেছে।

'আসলে কী জানিস, জিপটা নতুন বলে সকলেরই চোখ ওটার উপর। ওটা তাই আর বসে থাকে না।'

'তা হলে আমরা কী করব?'

'দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

জিপ-স্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম। ডাইনিং রুমে বসে বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। ফেলুদার চোখ লাল, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে বার বার ব্যর্থ ঘুঁষি মারছে।

'কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?' সে হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'চোদ্দই এপ্রিল।'

'চোদ্দই না পনেরই?'

'চোদ্দই। তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা—সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ—'

'ইয়েস ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?'

'এগারোই।'

'সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডক্টর বৈদ্য।'

'আর বীরেন্দ্র।'

'ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি প্রাইটেক্স ভুল করেনি। আচ্ছা...নিশিকান্তবাবুর জানালা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল?'

'যে দিন আমরা এসেছি, সে দিনই রাত্রে।'

'চোদ্দই রাত্রে। গুড। সে সময় কে কে ছিল শহরে?'

'হেলমুট, শশধর, ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র, আর...আর...'

'নিশিকান্ত।'

'নিশিকান্ত তো থাকবেই।'

'শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে, তা হলে নিজের উপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে, নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে

'হেল্প' বলে চিৎকার করতে পারে।'

'কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু ?'

'সেটা এখনও জানি না। খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে হয় না। লোকটা নেহাতই ভিতু, আর সেটা অভিনয় নয়।'

'তা হলে আর কেউ বাকি রইল কি ?'

'ডক্টর বৈদ্য! ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না! তিনি কবে কালিম্পঙ গেছেন, বা অ্যাট অল গেছেন কি না—সেটা তো আমরা জানি না! ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি, তার গ্যারান্টি কী ?'

ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ করে বলল, 'একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই—কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জিপে গ্যাংটক এসেছেন, এবং পরদিন বম্বে ফিরে গেছেন। ফিরে যে গেছেন, সেটা তাঁর বাড়ির লোকেরা টেলিফোনে কনফার্ম করেছে। অবিশ্যি এখন তিনি বম্বেতে নেই। একটা চান্স আছে, হি ইজ অন হিজ ওয়ে হিয়ার। মনে হচ্ছে পেমিয়াংচিটা—'

ফেলুদা কথা থামাল। বাইরে থেকে একজন লোক এসে হোটেলের ভিতর ঢুকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা আমাদের জার্মান হিপি হেলমুট উঙ্গার। ম্যানেজারকে কী জিগ্যেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

'ওঃ—তোমরা এখানেই আছ ? আমি দেখতেই পাইনি।'

আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেলমুটের যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলল, 'একটা জরুরী আলোচনা ছিল। তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কি ?'

১০

ঘরে এসে ঢোকার পর হেলমুট বলল, 'মে আই ক্লোজ দ্য ডোর ?' তার পর নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার বুকের ভিতরে টিপ টিপ। বিরাট লম্বা লোক—ফেলুদার

চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি। তার উপর জার্মান। এ ছাড়া শুনেছি হিপিরা নানা রকম নেশা করে। আর বিদেশীদের সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল গোছের জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। যদি কোনও বদ মতোলবে এসে থাকে লোকটা?

ফেলুদা হেলমুটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

'কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা-কফি কিছু চলবে?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

হেলমুট কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার উপর রেখে বগলদাবা করা আগ্‌ফা কোম্পানির একটা বড় লাল খামের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বলল, 'তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। এগুলো কালার নেগেটিভে তোলা। এখানে প্রিন্ট হয় না, তাই দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছিলাম। আজই সকালে এনলার্জমেন্টগুলো হয়ে এসেছে।'

হেলমুট একটা ছবি বার করল।

'এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা। অ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে হয়, সেখান থেকে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে উল্টোদিকের পাহাড়ে চলে গেছে। সরু ফিতের মতো রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায়। আমি ছবিটা তুলেছি ওই উল্টোদিকের রাস্তা থেকেই। গ্রাম, নদী আর দশ কিলোমিটার দূরে সিকিমের খানিকটা অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় ওখান থেকে। কথা ছিল শেলভাঙ্কার গুম্ফা যাবার পথে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছ অবধি পৌঁছায়নি। ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সে দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই, যেটা আমি আমার টেলি-ফটো লেন্‌স দিয়ে তুলে রাখি।

আশ্চর্য ছবি। এত দূর থেকে তোলা সত্ত্বেও মোটামুটি সবই বেশ বোঝা যাচ্ছে। একটা জিপ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার কিছু উপরে রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে পড়ন্ত জিপটার দিকে দেখছে। এটা বোধ হয় ড্রাইভারটা। মুখ চেনার উপায় নেই, কিন্তু সে যে নীল রঙের জামা পরা রয়েছে, সেটা

বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও লোক ছবিটাতে নেই।

এবার হেলমুট আর-একটা ছবি বার করল। এটা আগেরটার কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা। এটা আরও অদ্ভুত ছবি। এটার তলার দিকে দেখা যাচ্ছে, জিপটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ডান পাশে কিছু উপরে একটা ঝোপের পিছনে একটা কালো স্যুটপরা লোকের খানিকটা অংশ মাটিতে শোওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবির উপর দিকে রাস্তায় ড্রাইভারটা। এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন করে মাথা উঁচু করে উপর দিকে দেখছে। ছবির একেবারে উপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আর-একজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে ; তারও মুখ চেনার কোনও উপায় নেই, কিন্তু গায়ের জামার রঙ লালচে। সে একটা বড় পাথরের পিছনে উপুড় হয়ে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না ; নীল জামা পরা লোকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে ছবি থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে গেছে ; গাড়ি আর কালো স্যুট পরা লোকটা যেমন ছিল তেমনই আছে। আর পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা ছিল, সেটা পড়ে আছে রাস্তার উপর, একটা গাছের পাশে।

'রিমার্কেবল', ফেলুদা বলে উঠল, 'অদ্ভুত ছবি। এ রকম ছবি আমি কমই দেখেছি।'

'এ রকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়', হেলমুট বলল।

'তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে ?'

'গ্যাংটকে ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম—হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছানোর আগেই শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে শুধু পাথর আর ভাঙা জিপ দেখেছি। গ্যাংটকে ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েছি, আর পেয়েই সোজা হাসপাতালে চলে গেছি। আমি যাবার পরেও শেলভাঙ্কার ঘন্টা দু'-এক বেঁচে ছিলেন।'

'তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলোনি ?'

'বলে কী লাভ ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে, ততক্ষণ

তো সেটাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে! অথচ আমি সেই মুহূর্ত থেকেই জানি ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, জানি যে জিনিসটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন। আরও কাছ থেকে তুললে অবিশ্যি খুনীর চেহারাটাও বোঝা যেত। কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেটা সম্ভব ছিল না।'

ফেলুদা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তা হলে বীরেন্দ্র?'

'ইম্‌পসিবল।' দৃঢ় গলায় বলে উঠল হেলমুট।

আমরা দুজনেই রীতিমতো অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম।

'মানে?' ফেলুদা বলল। 'তুমি অত শিওর হচ্ছ কী করে?'

'কারণ আমিই হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার।'

ফেলুদার চোখ ছানাবড়া হতে এই প্রথম দেখলাম।

'তুমি বীরেন্দ্র মানে? তোমার চুল কটা, তোমার চোখ নীল, তোমার ইংরিজিতে জার্মান টান...'

'ভেরি সিম্পল।' হেলমুট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'আমার বাবা দু' বার বিয়ে করেন। আমি প্রথম স্ত্রীর সন্তান। আমার মা ছিলেন জার্মান। বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখনই আলাপ, আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন। মা'র নাম ছিল হেল্‌গা। বিয়ের আগের পদবি ছিল উঙ্গার। আমি যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি গিয়ে সেট্‌ল করি, তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুট নামটা নিই, আর মা-র পদবিটা নিই।'

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সত্যিই তো—জার্মান স্ত্রী হলে ছেলের চেহারা সাহেবদের মতো হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

'বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'মা মারা যাবার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। বাবার উপরেও টান ছিল, কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা কেমন যেন বিগড়ে গেল। বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এল মনে। তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলাম। বহু কষ্ট করে, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপে পৌঁছাই।

গোড়ায় কয়েক বছর কুলিগিরি থেকে এমন কোনও কাজ নেই, যা করিনি। প্রায় সাত-আট বছর এইভাবে কষ্টে কাটে। তার পর ছবি তুলতে শিখি। ভাল ফটোগ্রাফার হিসাবে নামও হয়। অনেক পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশের ছবি ছাপা হয়। বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে ছবি তুলছিলাম, সেখানে হঠাৎ বাবার এক বন্ধুর সামনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে চিনে ফেলেন, আর তিনিই বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান। তার পর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য। সেই থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করি, আর আমার চোখের মণির রঙটাও বদলে ফেলি।'

'কনট্যাকট লেনস ?' ফেলুদা বলে উঠল।

হেলমুট একটু হেসে তার দুই চোখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে পাতলা লেনস খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মতো কালো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই আবার লেনস দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল—

'বছর খানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে আসি। দেশের উপর থেকে টান আমার কোনও দিনও যায়নি। আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এই খোঁজার ব্যাপারে। কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে একটা মনাস্টেরিতে ছিলাম। যখন দেখলাম সেখানেও পিছনে টিকটিকি ঘুরছে, তখন সিকিমে চলে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হননি ?'

'আমাকে চিনতেই পারেননি ! আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি অনেক। তার উপরে আমার লম্বা চুল, আমার গোঁফ-দাড়ি, আমার চোখের নীল রং—এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি নিজের ছেলেকে চিনতেই পারলেন না। আমার কাছে বসে তিনি বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটা চলে গিয়েছিল ; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে। কিন্তু

boiRboi.net

যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না, তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো দিতাম, কিন্তু তার আর সুযোগ হল কই?'

'খুনী কে, এ-সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'ফ্র্যাঙ্কলি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মতে ডক্টর বৈদ্যকে কোনও মতেই পালাতে দেওয়া উচিত নয়।'

ফেলুদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমতো।'

হেলমুট (নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত?) বলল, 'ও তো জানে না আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটাই করে দিল। আর যে-মুহূর্তে নামটা করল, সেই মুহূর্তেই লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমার মতে লোকটা এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান। ও-ই খুন করেছে। এবং ও-ই মূর্তিটা নিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'সে দিন শেলভাঙ্কার যখন গুম্‌ফাটা দেখতে যান, উনি কি একাই যান?'

'সেটা বলতে পারি না। আমি তো অনেক সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অবিশ্যি ডক্টর বৈদ্য তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে গাড়িতে উঠে থাকতে পারেন। সন্দেহ-বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।'

ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পেমিয়াংচি যাবে?'

হেলমুট দৃঢ়স্বরে বলল, 'বাবাকে যে খুন করেছে, তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি।'

'এখান থেকে কত দূর জানো জায়গাটা?'

'একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি। হয়তো সামান্য বেশিও হতে পারে।'

'তার মানে ছ'-সাত ঘন্টার ধাক্কা।'

'রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেতে পারে। আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ফেলুদা বলল, 'আমারও তাই মতো। আমি একটা জিপের ব্যবস্থা দেখছি। জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি না নেওয়াই ভাল।'

'তুমি জিপ দেখো, আমি ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে—' হেলমুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরে বলল, 'লোকটা যে-পরিমাণে ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এ দিকে আমার কাছে তো ফ্ল্যাশ-গান ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমাদের কাছে—'

হেলমুটের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে দিল।

'আর এই যে আমার কার্ড।'

ফেলুদা তার 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা ভিজিটিং কার্ডের একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন আর কোনও জিপ ভাড়া পাওয়া গেল না। যে ক'টা ছিল, সবগুলো আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারা দিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। আগামীকাল সকালের জন্য জিপের ব্যবস্থা করে বেশির ভাগ দিনটাই হেঁটে গ্যাংটক শহর দেখে কাটিয়ে দিলাম। দুপুরে বাজারের দিকটায় নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে পেমিয়াংচির কথা বলতে তিনি অবিশ্যি লাফিয়ে উঠলেন।

সন্ধের দিকে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে আমাদের দেখালেন। হাতখানেক লম্বা একটা লাঠি, তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট একটা কাপড়ের থলি।

'কী জিনিস বলুন তো এটা', একগাল হেসে জিগ্যেস করলেন নিশিকান্তবাবু। 'জানেন না তো? এই থলের ভিতর আছে নুন আর

তামাকপাতা। পায়ে যদি জোঁক ধরে, এই থলির একটা ঘষাতেই বাবাজী খসে পড়বেন।'

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'নাইলনের মোজা ভেদ করেও জোঁক ঢোকে নাকি?'

'কিছুই বিশ্বাস নেই মশাই। গেঞ্জি, শার্ট আর ডবল পুলওভার ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁককে। আর মজা কী জানেন তো? ধরুন, লাইন করে একদল লোক চলেছে জোঁকের জায়গা দিয়ে। এখন, জোঁকের তো চোখ নেই—জোঁক দেখতে পায় না—মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনও প্রাণী আসছে। লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে, তাকে জোঁক অ্যাটাক করবে না—কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে। দ্বিতীয় লোকের বেলা তারা মাথা উঁচিয়ে উঠবে, আর থার্ড যিনি রয়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নেই—তাঁকে ধরবেই।'

ঠিক হল আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক-ছাড়ানো লাঠি সঙ্গে নিয়ে নেব।

শুতে যাবার আগে ফেলুদা বলল, 'দু' দিন বাদেই বুদ্ধ-পূর্ণিমা—এখানে উৎসব হবে।'

'সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব?' আমি ধরা গলায় জিগ্যেস করলাম।

'জানি না। তবে তার চেয়েও অনেক বড় পুণ্য কাজ হবে, যদি আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে কব্জা করতে পারি।'

সারা রাত আকাশ পরিষ্কার ছিল, আর আমাদের জানালা দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি, ফেলুদা, হেলমুট আর নিশিকান্ত সরকার সামান্য জিনিসপত্র, চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলের তৈরি দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক-ছাড়ানো লাঠি নিয়ে 'দুগ্‌গা' বলে পেমিয়াংচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

boiboi.net

১১

গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে—একটা কিউশিং হয়ে, আর-একটা নামচি দিয়ে নয়া বাজার হয়ে। কিউশিং-এর রাস্তা দিয়ে গেলে দূরত্ব কম হয়, কিন্তু গত ক' দিনের বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমাদের নয়াবাজার দিয়েই যেতে হবে। একশো সাতাশ মাইল পথ। এমনিতে হয়তো দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হত, কিন্তু আমরা হোটেল থেকে লুচি, আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে নিয়েছি। তা ছাড়া দুটো ফ্লাস্‌কে রয়েছে জল, আর দুটোতে গরম কফি ; কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না। সাবধানে গেলেও ঘন্টা আটেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। তাই মনে হয়, বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পৌঁছে যাব। হেলমুট দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি, আর নিশিকান্তবাবু দেখি কোত্থেকে একজোড়া চামড়ার গোলোস জুতো সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'ভেবে দেখলাম, জোঁক যদি পায়ের পিছন দিকে ধরে, তা হলে তো আর দেখতে পাব না ! নুনের থলি কোন্ কাজটা দেবে মশাই ? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল—সেন্ট পারসেন্ট সেফসাইড।'

'যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে জোঁক ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন। 'ম্যাক্—মানে ম্যাক্সিমাম জোঁকের টাইম এটা নয়। সেটা আরও পরে—জুলাই আগস্টে। এখন বাবাজীরা সব মাটিতেই থাকেন।'

নিশিকান্তবাবুকে বলা হয়নি যে, আমরা খুনীর সন্ধানে চলেছি। উনি জানেন, আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন। ওখানে গোলা-গুলি চললে যে ওঁর কী দশা হবে তা জানি না।

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা সিংথাম পৌঁছে গেলাম। এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল। বাজারের মধ্য দিয়ে রাস্তা গেছে। বেশ গিজগিজে ছোট শহর, তিস্তার পাশেই। আমরা

বাঁ দিকে ঘুরে তিস্তার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ে উঠলাম। এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে আমাদের কাছে নতুন।

আমাদের জিপটা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরনো নয়। স্পিডোমিটার, মাইলোমিটার, দুটোই এখনও কাজ করছে, সিটের চামড়া-টামড়াও বিশেষ ছেঁড়েনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার মতো। লোকটা বোধ হয় নেপালি নয়, কারণ নেপালিরা সাধারণত বেঁটে হয়—এ রীতিমতো লম্বা। কালো প্যান্ট, কালো চামড়ার জার্কিন, আর কালো শার্ট পরেছে। শার্টের বোতাম গলা অবধি লাগানো। মাথায় একটা ক্যাপ পরেছে, যেটার রঙও প্রায় কালোই। আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এ রকম চেহারার লোক দেখা যায়। ফেলুদা ওর নাম জিগ্যেস করাতে বলল, 'থোণ্ডুপ'। নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, 'তিব্বতি নাম'।

ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম, এ দিকের দৃশ্য একেবারে অন্য রকম। গাছপালা অনেক কম, আর মাটিটা লালচে আর শুকনো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিহারের কোনও পাহাড়ি জায়গা দিয়ে চলেছি। এক-এক জায়গায় রাস্তা খুবই খারাপ—আর তার মানেই সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে। নেপালি ছেলে-মেয়ের দল হয় পাথর সরাচ্ছে, নাহয় পাথর ভাঙছে, নাহয় মাটি ফেলছে। এই দু' দিনে নেপালি মেয়েদের দেখে কী করে চিনতে হয়, সেটা ফেলুদার কাছে শিখে নিয়েছি। এদের কানে মাকড়ি, নাকে নথ আর গলায় মোটা হাঁসুলি। সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না বললেই চলে। অবিশ্যি পোশাকেও তফাত আছে।

গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষট্টি মাইল। আমি মাইল পোস্টের দিকে চোখ রাখছিলাম। বাইশ মাইল পেরোনোর কিছু পরেই কানে একটা শব্দ এল। পিছন থেকে একটা জিপ বার বার হর্ন দিচ্ছে। থোণ্ডুপ কিন্তু পাশ দেবার কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে কেবল আমাদের গাড়ির স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল। ফেলুদা বলল, 'ও

গাড়ির এত তাড়া কিসের ?’

থোণ্ডুপ বলল, ‘হর্ন দিক ও। ওকে এগোতে দিলে আপনাদের ধুলো খেতে হবে।’

সে দিনের মতোই ফেলুদা আর আমি সামনে বসেছিলাম, আর পিছনে হেলমুট আর নিশিকান্ত। আমরা স্পিড বাড়ানো সত্ত্বেও পিছনের জিপটা বার বার এগিয়ে আসছে আর হর্ন দিচ্ছে, এমন সময় নিশিকান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,—‘আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক !’

‘কোন্ ভদ্রলোক ?’ বলে ফেলুদা পিছনে ফিরল, আর সেই সঙ্গে আমিও।

ও মা—এ যে শশধরবাবু ! আমাদের পিছনে ফিরতে দেখে আবার গ্যাঁ গ্যাঁ করে হর্ন, আর শশধরবাবুর মরিয়া হয়ে হাত নাড়া।

ফেলুদা বলল, ‘জারা রোক দিজিয়ে থোণ্ডুপজী—পিছনে চেনা লোক।’

আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনেরটাও থামল, আর শশধরবাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন।

‘আপনারা তো আচ্ছা লোক মশাই—সিংথামে এত চেঁচালুম, আর শুনতেই পেলেন না !’

ফেলুদা অপ্রস্তুত। বলল, ‘আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি ?’

‘তা আপনি যে রকম টেলিগ্রাম করলেন, তাতে কি আর ওখানে বসে থাকা যায় ? আমি সেই তখন থেকে ফলো করছি আপনাদের।’

পিছনে থাকলে যে কি রকম ধুলো খেতে হয়, সেটা শশধরবাবুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে ভদ্রলোক একেবারে ভস্মমাখা সাধুবাবা হয়ে যেতেন।

‘কিন্তু ব্যাপার কী ? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সে সব ছেড়েছুড়ে এখন এ দিকে কোথায় চলেছেন ?’

ফেলুদা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল, ‘আপনার সঙ্গে মালপত্তর কি অনেক ?’

'মোটেই না। কেবল একটা সুটকেস।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে চলুক ; ওতে বরং আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিই। আপনি আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই !'

জিপ চলতে চলতে ফেলুদা গত দু' দিনের ঘটনাগুলো শশধরবাবুকে বলল। এমন কি হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে দিল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাট হু ইজ দিস ডক্টর বৈদ্য ? শুনেই তো ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনে এ সব বুজরুকির প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ওর হাবভাব দেখেই ওকে সোজাসুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল আপনাদের। সেটা না করে আপনারা ওকে পেমিয়াংচি পালাতে দিলেন ? সত্যি, আপনাদের কাছ থেকে—'

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'হেলমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই তো ওর উপর সন্দেহটা গেল। আর আপনার দিক থেকেই খানিকটা গলতি হয়েছে শশধরবাবু। আপনি তো একবারও বলেননি, শেলভাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।'

শশধরবাবু বললেন, 'আরে সে কি আজকের কথা মশাই ? তাও জার্মান বলে জানতুমই না। বিদেশী, এইটুকুই শুনেছি। শেলভাঙ্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে।... আই হোপ, বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি। না হলে এই এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে।'

boiRboi.net

নামচি পৌঁছালাম ন'টার কিছু পরে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে ; তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। এটা নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা। তা ছাড়া সুন্দরও বটে, আর আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও আমরা মিনিট দশেকের বেশি থামলাম না। যেটুকু থামা, সেটুকু শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠাণ্ডা জল, আর আমাদের পেটে একটু গরম কফি ঢালার জন্য। হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল।

লক্ষ করলাম, সে কথা-টথা বিশেষ বলছে না। ছবিটা তোলা যেন অভ্যাসের বশে। শশধরবাবুও চিন্তিত ও গম্ভীর। নিশিকান্তবাবু ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটে, তবে ভিতরে ভিতরে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা পেয়ে তিনি বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন। নামচির বাজার থেকে একটা কমলালেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'বিপদ যাই আসুক না কেন মশাই, এক দিকে প্রদোষবাবু আর এক দিকে জার্মান বীরেনবাবুকে নিয়ে ডরাবার কোনও কারণ দেখছি না।'

নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে পৌঁছে যায়। এই নদীর ধারেই নয়া বাজার। সেখান থেকে আবার একটা ব্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে ন' হাজার ফুটের উপর পেমিয়াংচি। এ নদী তিস্তা নয়। এর জল তিস্তার মতো ঘোলা নয়। এর জল স্বচ্ছ সবুজ। মাঝে মাঝে জলের স্রোত পাথরে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এ নদীর নাম রঙ্গিত। এত সুন্দর পাহাড়ি নদী এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে আমরা যে পাহাড়ের উপর উঠছি, তাতে গাছপালা অনেক বেশি। এখানে মাটি লাল নয়, আর শুকনো নয়। এ যে বিহারের কোনও পাহাড় নয়, এ যে হিমালয়, তাতে কোনও ভুল নেই। শশধরবাবু বলেছিলেন, ইয়াং মাউনটেনস—তাই ধস নামে। সেই ধসের যে কত চিহ্ন আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। সবুজ পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে ছাই-রঙের সব ক্ষতচিহ্ন—ঠিক মনে হয় পাহাড়ের পায়ে বুঝি শ্বেতি হয়েছে। অজস্র গাছপালা বনবাদাড় সমেত পাহাড়ের এক-একটা অংশ ধসে পড়েছে একেবারে নদীর কিনারে। এই সব ন্যাড়া অংশ নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশের সবুজের সঙ্গে মিশে যাবে, তা কে জানে।

একটা গুম্ফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, সেই ভূত-তাড়ানো নিশানের ঝাড়। সবগুলো নিশানই তকতকে নতুন

বলে মনে হচ্ছে। শশধরবাবু বললেন, 'সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা—তারই তোড়জোড় চলছে।'

ফেলুদা প্রথমে বোধ হয় কথাটা শোনেনি। প্রায় মিনিট খানেক পরে বলল, 'কত তারিখে পড়ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা ?'

শশধরবাবু বললেন, 'কালই বোধ হয় পূর্ণিমা। কাল হল ১৭ এপ্রিল।'

'সতেরই এপ্রিল...তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ...চৌঠা বৈশাখ...'

ফেলুদার বিড়বিড়ানি জিপের শব্দে আর কেউ বোধ হয় শোনেনি। তারিখ নিয়ে এত কী চিন্তা করছে ফেলুদা ? আর ও এত গম্ভীর কেন ? আর হাতের আঙুলই বা মটকাচ্ছে কেন ?

পেমিয়াংচির আগের শহরের নাম গেজিং। এখানেও দেখি নিশানের ছড়াছড়ি। এখান থেকে পেমিয়াংচি তিন মাইল। জিপ ক্রমশ উপরে উঠছে। রাস্তা রীতিমতো খাড়াই। এখানে গাছ কম, তবে উপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ রঙের ঘন বন। খানিকটা রাস্তা রীতিমতো খারাপ। জিপকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। মনে হল, এ দিকে বৃষ্টিটা গ্যাংটকের চেয়ে বেশি হয়েছে। জিপ ফোর-হুইলে অতি সন্তর্পণে একটা গোলমেলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরোল। ঝাঁকুনির চোটে নিশিকান্তবাবুর মাথাটা জিপের উপরের লোহার রডের সঙ্গে ঠকাং করে লাগায় ভদ্রলোক 'উরেশ্‌শা' বলে উঠলেন।

একটু পরেই ক্রমে আলো কমে এল। এটা শুধু মেঘের জন্যে নয়। আমাদের জিপের এক পাশে এখন গাঢ় সবুজ পাতা আর সাদা ডালপালাওয়ালা গাছের বন। হেলমুট বলল, 'ওগুলো বার্চ গাছ—বিলেতে খুব দেখা যায়।'

এখন আমাদের জিপ এই বনের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। আমাদের দু' পাশে বন। তার মধ্য দিয়ে আমরা চড়াই উঠছি সাপের মতো প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে।

এবার আরও গভীর বন, আরও বড় বড় গাছ। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। জিপের আওয়াজ ছাপিয়ে বনের ভিতর থেকে অচেনা পাখির তীক্ষ্ণ শিস। নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বেশ থ্রি—মানে থ্রিলিং

লাগছে।'

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল।

সামনে একটা সবুজ টিপি। উপরে মেঘলা আকাশ।

ক্রমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল। তার পর পুরো বাংলোটা। এই সেই ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত বাংলো। পিছন দিকে আকাশের নীচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া থরে থরে সাজানো পাহাড়।

জিপ থামল। আমরা নামলাম। চৌকিদার বেরিয়ে এল। আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে।

'আউর কোই হ্যায় ইঁহা ?' শশধরবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নেহি সাব—বাংলো খালি হ্যায়।'

'আর কেউ নেই ?' এবার ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'আর কেউ আসেনি ?'

'এসেছিল। তিনি কাল রাত্রেই চলে গেছেন। দাড়িওয়ালা চশমাপরা বাবু।'

১২

চৌকিদারের কথা শুনে হেলমুটই সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। সে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল।

শশধরবাবু বললেন, 'যা বুঝছি—ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা বাজে। অন্তত ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।'

আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো। কাঠের ছাত, কাঠের মেঝে, সামনের দিকে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা তাতে পুরনো ধরনের বেতের টেবিল-চেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। এখন মেঘ করে আছে, তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে

boiRboi.net

কোনও আওয়াজ নেই। সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হল ডাইনিং রুমে। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে। এক পাশে আবার দুটো আরাম কেদারা। শশধরবাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালানোতে এখন আমি কন্‌ভিন্‌স্‌ড। এস. এস. তার এমন একটা দামি জিনিস যাকে-তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে।'

হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু বোধহয় বাথরুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। ফেলুদা বাংলোর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি আর কী করি—খাবার টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এত দূর আসা বৃথা হবে, শেলভাঙ্কারের আততায়ী অল্পের জন্য হাত থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে যাবে, আমরা বোকার মতো দৃশ্য দেখে গ্যাংটকে ফিরে যাব—এ সব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

ডাইনিং রুমের পিছন দিকের দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডরুমে যাওয়া যায়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এলো, হাতে একটা লাঠি।

এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখছিলাম না?

'ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই', ফেলুদার গলার স্বর শুক্‌নো আর ভারী, 'কারণ তিনি চিহ্নস্বরূপ তাঁর লাঠিটা ফেলে গেছেন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ!'

নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। তার পর 'অদ্ভুত জায়গা' বলে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী শব্দ করে হাই তুললেন।

ফেলুদা বসল না। ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর বৈদ্যর লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় ঠক্ ঠক্ করে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগল।

শশধরবাবু বললেন, 'কই, মিস্টার সরকার—আপনাদের ওই খাবারের বাক্সগুলো খুলুন! মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?'

'খাওয়া পরে হবে।'

কথাটা বলল ফেলুদা। আর যেভাবে বলল, তাতে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু উঠতে গিয়ে থথমতো খেয়ে থপ্ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। শশধরবাবুও অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। কিন্তু ফেলুদা আবার যেই কে সেই।

সে চেয়ারে বসল। লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে পকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল, 'ঘাটশিলায় আমার এক পুরনো বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে তো ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন—তাই না, শশধরবাবু?'

শশধরবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না।

'হ্যাঁ—এক ভাগনের বিয়ে ছিল।'

'আপনি তো হিন্দু?'

হঠাৎ এ-প্রশ্ন করল কেন ফেলুদা?

'তার মানে?' শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফেলুদার দিকে।

'নাকি বৌদ্ধ—না খ্রিস্টান—না ব্রাহ্ম—না মুসলমান?'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'বলুন না।'

'হিন্দু—ন্যাচারেলি।'

'হুঁ!' ফেলুদা গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং ছাড়ল। তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু—' ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি, দৃষ্টি সোজা শশধরবাবুর দিকে, '—আপনি আর আমরা তো একই দিনে একই সঙ্গে প্লেনে এলাম। আপনি তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন, তাই না?'

'এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিত্তির? আপনার কথার কোনও মাথামুণ্ডু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঘাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে তো হিন্দুদের বিয়ে হয় না

boiRboi.net

শশধরবাবু ! ওটা যে নিষিদ্ধ মাস ! ও মাসে কোনও লগ্ন নেই—শাস্ত্রের বারণ ! আপনি সেই চৈত্র মাসেই আপনার ভাগ্‌নের বিয়ে দিলেন ?'

শশধরবাবু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিংবা পারলেন না। তাঁর হাত দুটো কাঁপছে।

'আপনি কী ইম্‌প্লাই করছেন ? কী বলতে চাইছেন আপনি ?'

ফেলুদা নিরুদ্বেগ। সে চেয়ে রয়েছে সোজা শশধরবাবুর দিকে, তার চোখের পাতা পড়ছে না।

প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইম্‌প্লাই করছি অনেক কিছু। এক নম্বর—আপনি মিথ্যেবাদী। আপনি ঘাটশিলায় যাননি। দু' নম্বর—আপনি বিশ্বাসঘাতক—'

'মানে ?' শশধরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোন একটা কারণে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। সে কথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন—যদিও কারণ বলেননি। অনেক সময় খুব কাছের কোনও লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়। আমার বিশ্বাস সে-লোক হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর পার্টনার। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। তাঁর সন্দেহ-বাতিকটা ছিল না একেবারেই। সুতরাং তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলেন—এবং জানতে পেরে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর জানার ব্যাপারটা আপনি জানতে পারেন—আর জানার পর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বম্বেতে সেটার সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিমে এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না। আপনিও এলেন। হয়তো তিনি আসার পরের দিনই। আপনি মানে নট শশধর বোস, বাট ডক্টর বৈদ্য—অর্থাৎ ছদ্মবেশী শশধর বোস। বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল, গণৎকার সেজে তাঁর বিষয়ে জানা কথাগুলোই তাঁকে বলল, তাঁকে ইম্প্রেস্ করল। দুজনে একসঙ্গে গুম্‌ফায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে। আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। পথে পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে

তাঁকে অজ্ঞান করলেন। ড্রাইভারকে আগেই হাত করেছিলেন—পয়সায় কী না হয়! তার পর গাড়ি ফেলা। তার পর পাথর ফেলা—আপনার ওই লাঠির সাহায্যে। তখনও শেলভাঙ্কার মরেননি। হয়তো তিনি শেষ মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন, এবং সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করেন।'

'ননসেন্স!' শশধরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি! কী প্রমাণ আছে যে, আমি ডক্টর বৈদ্য?'

ফেলুদা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল।

'আপনার আংটিটা কোথায় গেল শশধরবাবু?'

শশধরবাবু কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

'আমার...'

'হ্যাঁ, আপনার। আপনার "মা" লেখা সোনার আংটি। আঙুলে দাগ রয়েছে, অথচ আংটি নেই কেন?'

'ও—ওটা...' শশধরবাবু ঢোঁক গিললেন, '—ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল, তাই—' ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে আংটি বার করে দেখালেন।

'মেক-আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গেছিলেন—তাই না? ওই একই আঙুলের দাগ সেদিন মোমবাতির আলোয় দেখেছিলাম শশধরবাবু। তখনই একটা খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু কেন তা বুঝতে পারিনি।'

শশধরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—ফেলুদা গর্জন করে উঠল—'বসুন! আরও আছে!'

শশধরবাবু বসলেন, ঘাম মুছলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'শেলভাঙ্কার খুন হল। ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন, কালিম্পঙ যাচ্ছেন লামার সঙ্গে দেখা করতে। আসলে কিন্তু তা নয়! আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন কলকাতায়। এ দিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন 'অ্যারাইভিং ফোর্টিন্‌থ'। সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও বিচলিত হন—কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনও কথা ছিল

boiRboi.net

না—এবং শেলভাঙ্কার আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই চাইছিলেন। যাই হোক—আপনি ফোর্টিন্‌থ এলেন—কারণ এই আসাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই। চোদ্দই এসে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুতে আক্ষেপের ভাণ করে আপনি পনেরই বললেন বম্বে ফিরছেন। আসলে আপনি বম্বে যাননি, গ্যাংটকের আশেপাশেই কোথাও রয়ে গেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে। সে দিনই সন্ধ্যায় ডক্টর বৈদ্যর বেশে আপনিই আমাদের ভেলকি দেখালেন। আপনি জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ—তাই আপনিই পেমিয়াংচি রওনা হবার আগে পাথর গড়িয়ে আমাকে সাবাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং আপনিই রুমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে—'

ঘরের মধ্যে একজন বিকট হু হু হু শব্দ করে উঠল—কান্না আর ভয়ের মাঝামাঝি। ইনি নিশিকান্ত সরকার।

'বসুন নিশিকান্তবাবু।' ফেলুদা বলল, 'আর লুকিয়ে লাভ নেই। আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন ? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে ?'

নিশিকান্তবাবু হাত দুটোকে 'হ্যান্ডস্‌ আপ' করার মতো মাথার উপর তুলে আবার সেই রকমই কঁকিয়ে উঠে বললেন, 'মশাই, জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভ্যা—মানে ভ্যালুয়েবল্‌। তার পর যখন জানলুম—'

'টিবেটান ইনস্টিটিউটে আপনিই গেস্‌লেন ?'

'হ্যাঁ স্যার—আমিই। চাইতেই অন দি স্পট হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। তাই সন্দেহ হল। তাই গেলাম—তা, বলে কিনা ইউ—মানে ইউনিক জিনিস। তাই মানে—'

'ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি কী ? বিশেষ করে এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল !'

'সেই—মানে, সেই আর কি !'

'কিন্তু আপনি সে দিন খুনের জায়গায় কাউকে দেখেননি ?'

'না স্যার !'

'আপনি না দেখলেও, সে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখেছিল—এবং ভেবেছিল, আপনি তাকে দেখে ফেলেছেন। নইলে আর আপনাকে

শাসাবে কেন ?'

'তা হবে !'

'মূর্তিটা কোথায় ?'

'মূর্তি ?' নিশিকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ফেলুদাও অবাক।

'সে কি !... আপনি তা হলে—'

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারি। শশধরবাবু তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়ানো হেলমুটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা একটাই, আর তার সামনে হেলমুটের গড়িয়ে পড়া শরীর—তাই ফেলুদার বেরোতে দশ সেকেন্ডের মতো দেরি হয়ে গেল।

সবাই যখন বাইরে পৌঁছেছি, তখন জিপের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে। এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয়ই হাত করা ছিল, আর সে সেই ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল। শশধরবাবুকে নিয়ে জিপ প্রচণ্ড বেগে ঢাল বেয়ে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে আমাদের জিপটাও গর্জিয়ে উঠেছে, কারণ থোণ্ডুপ বুঝেছে যে, আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব। কিন্তু তার আর দরকার হল না। গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো অব্যর্থ গুলি তার পিছনের দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল।

জিপটা রাস্তার এক দিকে কেত্‌রে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। দেখলাম শশধরবাবু লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটলেন। ড্রাইভারটা উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে জিপের স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটল বনের দিকে—আমরা তিনজন তার পিছনে। ড্রাইভারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের থোণ্ডুপও তার জিপের হ্যান্ডেলটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমরা চারজন অন্ধকার বনের ভিতর ঢুকে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দশ মিনিট খোঁজার পর হেলমুটের একটা হাঁক শুনে তার

দিকে গিয়ে দেখি, শশধরবাবু একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অদ্ভুত ভাবে লাফাচ্ছেন আর ছটফট করছেন।

আরও কাছে যেতে বুঝলাম যে, তাঁকে জোঁকে ধরেছে—একটা নয়—অন্তত দুশো-তিনশো লক্‌লকে জোঁক তাঁর দুই পায়ের হাঁটু অবধি, আর কাঁধে, ঘাড়ে আর কনুইয়ের কাছটায় কিলবিল করছে। হেলমুট বলল, 'ভদ্রলোক বোধ হয় এই আল্‌গা শেকড়টায় হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন, তাতেই এই দশা।'

ফেলুদা শশধরবাবুর কোটের কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে বনের বার করল। তার পর আমাকে বলল, 'দৌড়ে গিয়ে জোঁক-ছাড়ানো লাঠিগুলো নিয়ে আয়।'

আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। হেলমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অকির্ডের ছবি তুলছে। থোণ্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে। মূর্তিটা শশধরবাবুর কাছেই পাওয়া গেছে। খুনের সময় মূর্তিটা নেবার কথা তাঁর খেয়াল হয়নি। পরের দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোভ সামলাতে না পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে খুঁজে বার করেন। উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে আসছেন, তখন নিশিকান্তবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন। নিশিকান্ত শশধরকে দেখেনি, কিন্তু শশধর নিশিকান্তকে দেখেছে, আর সেই থেকে তাকে শাসাতে শুরু করেছে।

আরও একটা ব্যাপার—বম্বেতে নাকি শশধরবাবুর একটি সাক্‌রেদ ছিল—তার সঙ্গে গ্যাংটক থেকেই শশধরবাবুর টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। সেই সাক্‌রেদই নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে, এবং ফেলুদার টেলিগ্রামের খবরটা সে-ই নাকি গ্যাংটকে শশধরবাবুকে জানায়।

ফেলুদা সঙ্গে পান এনেছিল ; চিবোতে চিবোতে নিশিকান্তবাবুকে বলল, 'আপনিও যে একটি ছোটখাটো ক্রিমিন্যাল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নেহাৎ আপনার ভাগ্য ভাল, তাই আপনি

যমকান্তটা ফিরে পাননি। পেলে আপনার জন্যেও একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হত।'

নিশিকান্তবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে বললেন, 'পানিশমেন্ট তো হয়েচেই স্যার ! তিন-তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে আমার ডান পায়ের মোজার ভিতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ উইক বোধ করছি।'

'যাই হোক—ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও তিব্বতি জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার বোতাম।'

এই প্রথম লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের শার্টের গলার সবচেয়ে নীচের বোতামটা নেই।

নিশিকান্তবাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তাঁর চারকোণা গোঁফের নীচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন, 'থ্যা—মানে থ্যাঙ্কস !'

boiRboi.net

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

boiRboi.net

১

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাংগুলী ওরফে জটায়ুর মতে হগ সাহেবের বাজারের মতো বাজার নাকি ভূ-ভারতে নেই। যারা জানে না তাদের জন্যে বলা দরকার যে হগ সাহেবের বাজার হল, আমরা যাকে নিউ মার্কেট বলি তারই আদি নাম।—'দিল্লী বোম্বাই যোধপুর জয়পুর সিমলা কাশী, সবই তো দেখলুম, আর আপনাদের সঙ্গেই দেখলুম, কিন্তু আন্ডার দি সেম রুফ এমন একটা বাজার কোথাও দেখেছেন কি ?'

এ ব্যাপারে অবিশ্যি আমি আর ফেলুদা দুজনেই লালমোহনবাবুর সঙ্গে একমত। মাঝে একটা কথা হয়েছিল যে এই মার্কেট ভেঙে ফেলে সেখানে একটা মাল্টি-স্টোরি সুপার মার্কেট তৈরি হবে। ফেলুদা তো শুনেই ফায়ার। বলল, 'এ কাজটা হলে কলকাতার অর্ধেক কলকাতাত্ব চলে যাবে, সেটা কি এরা বুঝতে পারছে না ? নগরবাসীদের কর্তব্য : প্রয়োজনে অনশন করে এই ধ্বংসের পথ বন্ধ করা।'

আমরা তিনজন গ্লোবে ম্যাটিনিতে এপ অ্যান্ড সুপার এপ দেখে বাইরে এসে নিউ মার্কেটে যাব বলে স্থির করেছি। লালমোহনবাবুর টর্চের ব্যাটারি আর ডট পেনের রিফিল কেনা দরকার, আর ফেলুদাও বলল কলিমুদ্দির দোকান থেকে ডালমুট নিয়ে নেবে ; বাড়ির ডালমুট মিইয়ে গেছে, অথচ চায়ের সঙ্গে ওটা চাই-ই চাই। তা ছাড়া লালমোহনবাবুর একবার মার্কেটটা ঘুরে দেখা দরকার, কারণ কালই নাকি এই মার্কেটকে সেন্টার করে একটা ভালো ভুতুড়ে গল্পের প্লট ওঁর মাথায় এসেছে। ট্রাফিক বাঁচিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সির লাইনের ফাঁক দিয়ে এগোনোর সময়

প্লটের খানিকটা আভাস দিলেন আমাকে—'একজন লোক রাত্তিরে মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবার পরে দেখে কি, সে ভিতরে আটকা পড়ে গেছে। লোকটা রিটায়ার্ড জজ—অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। বোঝো তপেশ—এই বিশাল হগ সাহেবের বাজার, সব দোকান বন্ধ, সব বাতি নিভে গেছে, শুধু লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকের কোল্যাপ্‌সিব্‌ল গেটের ভিতর দিয়ে আসা রাস্তার ক্ষীণ আলোয় যেটুকু দেখা যায়। গলিগুলোর এ মাথা থেকে ও মাথা খাঁ খাঁ করছে, আর তারই মধ্যে কেবল একটিমাত্র দোকান খোলা, একটা কিউরিওর দোকান, তাতে টিমটিমে আলো, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল, হাতে ছোরা! খুনীর কঙ্কাল, যে খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিলেন ওই জজ সাহেব। যে দিকেই পালাতে যান, মোড় ঘুরেই দেখেন সামনে সেই কঙ্কাল, হাতে ছোরা, ড্রিপিং উইথ ব্লাড!'

আমি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললাম ভদ্রলোক ভেবেছেন ভালোই, তবে ফেলুদার হেল্‌প না নিলে গল্পের গোড়ায় গলদ থেকে যাবে ; জজ সাহেবের আটকে পড়ার বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে বার করা জটায়ুর সাধ্যের বাইরে।

সামনেই মোহনস্‌-এর কাপড়ের দোকানের ডান পাশ দিয়ে ঢুকে, বাঁয়ে ঘুরে গুলাবের ঘড়ির দোকান পেরিয়ে ডাইনে একটু গেলেই একটা তেমাথার মোড়ে ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুড্‌সের দোকান। ব্যাটারি সেইখানেই পাওয়া যাবে, আর তার উলটো দিকেই পাওয়া যাবে রিফিল। দে ইলেক্‌ট্রিক্যালসের মালিক ফেলুদার ভক্ত, দেখেই একগাল হেসে নমস্কার করলেন। আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক ঢুকলেন, তিনি গল্পে একটা বড় ভূমিকা নেবেন, তাই তাঁর বর্ণনা দিয়ে রাখি। বছর চল্লিশ বয়স, মাঝারি হাইট, ফরসা রং, মাথার চুল পাতলা, দাড়ি-গোঁফ নেই, সাদা বুশ শার্ট, কালো প্যান্ট আর হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

'আপনি মিস্টার মিত্র না?' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে অবাক হেসে প্রশ্নটা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওই সামনের বইয়ের দোকানের লোক আমাকে চিনিয়ে দিল।

বলল, উনি হচ্ছেন ফেমাস ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র। হাউ স্ট্রেঞ্জ! ঠিক আপনার কথাই ভাবছি আজ দু' দিন থেকে।'

বাংলায় সামান্য টান। হয় ও দিকের লোক এ দিকে সেট্‌লড, নাহয় এ দিকের লোক ও দিকে।

'কেন বলুন তো?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক কিছুটা নার্ভাস কি? গলাটা খাক্‌রে নিয়ে বললেন, 'সেটা আপনার সঙ্গে দেখা করেই বলব। আপনি কাল বাড়ি থাকবেন কি?'

'বিকেল পাঁচটার পরে থাকব।'

'তা হলে আপনার অ্যাড্রেসটা যদি একটু—'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা নোটবুক আর ফাউনটেন পেন বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা ঠিকানা লিখে দিল।

'স্যরি!'

ভদ্রলোকের 'স্যরি' বলার কারণ আর কিছুই না, পেন থেকে সামান্য বেগুনি কালি লিক করে ফেলুদার আঙুলে লেগেছে। আমি জানি ফেলুদা পুরনো ধরনের ফাউনটেন পেনই পছন্দ করে, বলে তাতে হাতের লেখা আরও ভাল হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে লিক করে বলে ইদানীং ডট পেনই ব্যবহার করছে।

'আমার নাম বাটরা,' পেন-খাতা পকেটে পুরে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার গ্র্যান্ডফাদার ক্যালকাটায় সেট্‌ল করেছিলেন সেভেনটি ফাইভ ইয়ারস আগে।'

'আই সি।'

'এর মধ্যেই মক্কেল জুটিয়ে ফেললেন নাকি?'

ভদ্রলোক চলে যাবার পরমুহূর্তেই সামনের দোকান থেকে রিফিল কিনে এনে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। ফেলুদা একটা নিঃশব্দ হাসি ছাড়া কোনও মন্তব্য করল না। তিনজনে রওনা দিলাম ডালমুটের উদ্দেশে।

লালমোহনবাবু পকেট থেকে ওঁর ছোট্ট লাল ডায়রিটা বার করে নোট নিতে শুরু করলেন। তার ফলে মাঝে মাঝে একটু পিছিয়ে পড়ছেন, আবার তৎক্ষণাৎ পা চালিয়ে আমাদের পাশ নিয়ে

boiRboi.net

নিচ্ছেন। গত সপ্তাহে একবার লোডশেডিং-এর মধ্যে এসে দেখেছি, সারা মার্কেটটার উপরে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। আজ আলো থাকায় ভোল পালটে গেছে। পদে পদে কানে আসছে এ পাশ ও পাশ থেকে ছুঁড়ে মারা 'কী চাইলেন দাদা ?'—আর আমরা তারই মধ্যে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছি ভিড় বাঁচিয়ে। ফেলুদার লক্ষ্য একটাই, কিন্তু দৃষ্টি ডাইনে বাঁয়ে সামনে তিন দিকে, যদি তার জন্য ঘাড় ফেরাতে হয় না, চোখ ফেরালেই হল, আর তাতেই মনের মধ্যে অবিরাম ছাপা হয়ে যাচ্ছে ছবি আর কথা, যেগুলো পরে কখন কোন্ কাজে লাগবে কে জানে। আমি জানি, লালমোহনবাবু অত কসরৎ করে খাতায় যা লিখছেন, ফেলুদার মাথায় আগেই তা লেখা হয়ে যাচ্ছে। সামনে পুজো, তাই ভিড় বেশি, তাড়া বেশি, কেনার তাগিদ বেশি, লোকের পকেটে পয়সাও নিশ্চয়ই বেশি।

লালমোহনবাবু বেশ সাহেবী কায়দায় 'কস্‌মোপোলিট্যান' কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কলিমুদ্দির দোকানের সামনে এসে পড়লাম। এ দোকানও চেনা, 'সালাম বাবু' বলে কলিমুদ্দি তার কাজে লেগে গেল। দিব্যি লাগে দু' হাতে ঠোঙা ধরে ঝাঁকিয়ে মেশানোর ব্যাপারটা। আর সেই সঙ্গে টাট্‌কা, নোনতা, জিভে-জল আনা গন্ধ।

আমি গরম ঠোঙাটা হাতে নিয়েছি, এমন সময় দেখি ওয়ালেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে কী যেন একটা দেখে ফেলুদা একেবারে স্ট্যাচু।

কারণটা স্পষ্ট। আমাদের পাশ দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে লোকটা এই মুহূর্তে মার্কেটের আরও ভিতর দিকে চলে গেল, সে হল মিঃ বাটরার ডুপলিকেট।

'টুইন্‌স,' চাপা গলায় মন্তব করলেন জটায়ু।

সত্যি, যমজ ছাড়া এ রকম হুবহু মিল কল্পনা করা যায় না। তফাৎ শুধু শার্টের রঙে। এঁরটা গাঢ় নীল । হয়তো কাছ থেকে সময় নিয়ে দেখলে আরও তফাত ধরা পড়ত, কিন্তু সেও নিশ্চয়ই খুবই সূক্ষ্ম। অবিশ্যি আর-একটা তফাত এই যে, ইনি ফেলুদাকে আদপেই চেনেন না।

'এতে অবাক হবার কিচ্ছু নেই,' ফেরা-পথে রওনা দিয়ে বলল ফেলুদা, 'মিঃ বাটরার একটি যমজ ভাই থেকে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'সে আপনার নীলগিরি, বিন্ধ্য, আরাবল্লী, ওয়েস্টার্ন ঘাট্‌স—যাই বলুন না কেন, পাহাড়ের মাথায় যদি বরফ না থাকে, তাকে আমি পাহাড়ই বলব না।'

এবার পুজোয় পাহাড়ে যাবার কথাটা ক' দিন থেকেই হচ্ছিল। নতুন উপন্যাস বেরিয়ে গেছে, লেখার তাগিদ নেই, তাই লালমোহনবাবু তার সেকেন্ড হ্যান্ড সবুজ অ্যাম্ব্যাসাডারে রোজই বিকেলে আসছেন আড্ডা দিতে। কাশ্মীরটা আমাদের কারুরই দেখা হয়নি, কিন্তু ওখানকার অক্‌টোবরের শীত সহ্য হবে না সেটা বোধ হয় নিজেই বুঝতে পেরে লালমোহনবাবু দু-একবার 'কাশ' 'কাশ' করে থেমে গেছেন। একটা অ্যাটলাস পড়ে আছে সামনের টেবিলে চা-ডালমুটের পাশে, সেটা খুলে বোধহয় ভারতবর্ষের ম্যাপটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের, এমন সময় কলিং বেল।

শ্রীনাথ আমাদের বাড়িতে চোদ্দ বছর কাজ করছে, তাই মিঃ বাটরা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে আর-এক পেয়ালা চা এসে গেল।

'আপনার কি কোনও যমজ ভাই আছে?'

বাটরা কপালের ঘাম মুছে রুমালটা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বাটরার ভুরু যে কতটা ওপরে উঠতে পারে, আর তলার ঠোঁট যে কতটা নিচে নামতে পারে, সেটা এই এক প্রশ্নেই বোঝা গেল।

'আপনারা...আপনারা কী করে... ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হবার মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই নিউ মার্কেটেই তাকে দেখেছি আমরা', বলল ফেলুদা।

'মিস্টার মিটরা',—চেয়ারে প্রায় এক হাত এগিয়ে এসে হাতলে একটা জবরদস্ত চাপড় মেরে বললেন মিঃ বাটরা—'আই অ্যাম দি

boiRboi.net

ওনলি চাইল্ড অফ মাই পেরেন্টস্। আমার ভাই বোন কিচ্ছু নেই।'

'তাহলে— ?'

'সেজন্যেই তো আপনার কাছে এলাম মিঃ মিটরা। এক উইক হল এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। ফ্রম কাঠমাণ্ডু। আমি কাঠমাণ্ডুর একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করি—সান ট্র্যাভেলস—আই অ্যাম দ্য পি আর ও। আমাকে কাজের জন্য ক্যালকাটা বোম্বাই দিল্লি যেতে হয় মাঝে মাঝে। আমার অফিসের কাছে একটা ভাল রেস্টোরান্ট আছে—ইন্দিরা—সেখানেই লাঞ্চ করি আমি এভরি ডে। লাস্ট মানডে গেছি—ওয়েটার বলছে, আপনি তো আধঘন্টা আগে লাঞ্চ করে গেলেন, আবার কী ব্যাপার ?—বুঝুন মিঃ মিটরা ! আরও দু-একজন চেনা লোক ছিল, তারাও বলল আমাকে দেখেছে। দেন আই হ্যাড টু টেল দেম—কি আমি আসিনি। তখন ওয়েটার বলে কি, ওর সাসপিশন হয়েছিল, কারণ যে লোক খেতে এসেছিল, হি হ্যাড এ ফুল লাঞ্চ, উইথ রাইস অ্যান্ড কারি অ্যান্ড এভরিথিং ; আর আমি খাই স্রেফ স্যাণ্ডউইচেজ অ্যান্ড এ কাপ অফ কফি !'

মিঃ বাটরা দম নিতে থামলেন। আমরা তিন জনেই যাকে বলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লালমোহনবাবু বেশি মনোযোগ দিলে মুখ হাঁ হয়ে যায়, এখনও সেই অবস্থা। মিঃ বাটরা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন।

'আমি কলকাতায় এসেছি পরশু, সানডে। কাল সকালে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি—আমি আছি গ্র্যান্ডে—ফ্র্যাঙ্ক রসে যাব টু বাই সাম অ্যাসপিরিন। আপনি জানেন বোধ হয়, হোটেলের ভিতরেই একটা কিউরিওর দোকান আছে ? সেইটের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ শুনি, ভিতর থেকে আমায় ডাকছে—মিঃ বাটরা, প্লিজ কাম ফর এ মোমেন্ট !—কী ব্যাপার ? গেলাম ভিতরে। সেলসম্যান একটা একশো টাকার নোট বার করে আমাকে দেখাচ্ছে। বলে—মিঃ বাটরা, আপনার এই নোটটা জাল নোট, নো ওয়াটারমার্ক, প্লিজ চেঞ্জ ইট !—আমার তো মাথায় বাজ পড়ল মিঃ মিটরা ! আমি তো

দোকানে ঢুকিইনি ! অ্যান্ড দে ইনসিসটেড, কি আমি গেছি আধ ঘন্টা আগে, আর আমি ওই একশো টাকার নোট দিয়েছি ওদের, অ্যান্ড আই বট এ কুক্‌রি !'

'কুক্‌রি ? মানে, নেপালী ছুরি ?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'বুঝুন কী ব্যাপার ! আমি থাকি কাঠমাণ্ডুতে ; কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে আমি নেপালের জিনিস কিনব কেন ? নেপালে তো ও জিনিস আমি হাফ প্রাইসে পাব !'

'আপনাকে নোটটা বদলে দিতে হল ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'অনেকবার বললাম, যে আই অ্যাম নট দ্য সেম পারসন। শেষকালে এমন ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগল যেন আমি আইদার পাগল, অর ফোর-টোয়েন্টি। এ অবস্থায় কী করা যায়, বলুন !'

'হুঁ...'

ফেলুদা ভাবছে। হাতটা সাবধানে বাড়িয়ে চারমিনারের ডগা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনি বেশ অসহায় বোধ করছেন সেটা বুঝতে পারছি।'

'আমার রেগুলার প্যানিক হচ্ছে, মিঃ মিটরা। সে যে কখন কী করবে, তার ঠিক কী ?'

'খুবই অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল ফেলুদা। 'আপনার কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হত, যদি না আমরা নিজের চোখে সে লোককে দেখতাম। কিন্তু তাও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কীভাবে হেল্‌প করতে পারি, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোকও চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটা ঠিক। এখন, আমি তো কাল কাঠমাণ্ডু ফিরে যাচ্ছি। ভরসা কী যে সে লোক আমার পিছে পিছে যাবে না, আর সেখানেও আমাকে হ্যারাস করবে না ? এ তো বুঝতে পারছি যে সে লোককে আমি না দেখলেও, সে আমাকে দেখেছে, আর ডেলিবারেটলি আমার পিছনে লেগেছে। দিস ইজ এ নিউ টাইপ অফ ক্রাইম, মিঃ মিটরা। এবারে

হান্ড্রেড রুপিজের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এর পরে কী হবে কে জানে ?'

বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় ফেলুদা এমনিতে পায়ের উপর পা তুলে বসে। যখন বোঝে আর কথা বলার নেই, বেশি বললে সময় নষ্ট হবে, তখন পা-টা এমন ভাবে নামিয়ে নেয় যে তাতেই বেশ বোঝা যায় 'এবার আপনি আসুন'। আজও তাই করল, আর তাতে ফলও হল। মিঃ বাটরা উঠে পড়লেন। বুঝলাম কতকটা ভদ্রতার খাতিরেই ফেলুদা বলল, 'আশা করি কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে কোনও অসুবিধায় পড়তে হবে না।'

'লেট আস হোপ সো', বললেন ভদ্রলোক। 'এনিওয়ে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি মিঃ সর্বেশ্বর সহায়ের কাছে।'

সর্বেশ্বর সহায় ফেলুদার এক মক্কেল। কোডার্মায় থাকেন। হাজারিবাগে তাঁর একটা বাংলো প্রায়ই খালি পড়ে থাকে ; আমরা একবার সেখানে গিয়ে ছিলাম দিন দশেক।

'কাঠমাণ্ডুতে কোনও গোলমাল দেখলে আপনি পুলিসে খবর দিয়ে দেবেন', বলল ফেলুদা। 'এসব লোকের দরকার স্রেফ ধোলাই।'

মিঃ বাটরা চলে যাবার পর লালমোহনবাবুই প্রথম মুখ খুললেন।

'আশ্চর্য! ফরেন কান্ট্রি বলেই বোধ হয় এই হিল স্টেশনের কথাটা একবারও মাথায় আসেনি।'

boiRboi.net

২

পরদিন সকালে যে ঘটনাটা ঘটল, বলা যেতে পারে সেটা থেকেই আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের শুরু। অবিশ্যি সেটার বিষয়ে বলার আগে গতকাল রাত্রের টেলিফোনটার কথা বলা দরকার।

কলকাতায় অক্টোবর মাসেও মাঝে মাঝে আকাশ কালো-টালো করে বৃষ্টি এসে যায়। কালও তাই হল। লালমোহনবাবু সাধারণত

বিকেলে এলে আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকেন ; কাল সাতটা নাগাদ মেঘের গর্জন শুনে হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়লেন—'বরঞ্চ কাল সকালে আসা যাবে, তপেশ। নিউ মার্কেটের প্লটটা আরও খানিকটা এগিয়েছে ; তোমার একটা ওপিনিয়ন নেওয়া দরকার।'

বৃষ্টি এল আটটায়, আর ফোনটা পৌনে নটায়। ফেলুদা ওর ঘরে এক্সটেনশনে কথা বলল, আর আমি বসবার ঘরের মেইন টেলিফোনে শুনলাম।

'মিস্টার প্রদোষ মিত্র ?'

'কথা বলছি।'

'ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর।'

'নমস্কার। আমার নাম অনীকেন্দ্র সোম। আমি বলছি সেন্ট্রাল হোটেল থেকে।'

'বলুন।'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। একটু দেখা করা যাবে কি ?'

'ব্যাপারটা জরুরী ?'

'খুবই। আজ তো বাদলা, তবে কাল সকালে যদি একটু সময় দিতে পারেন। আমি বাইরে থেকে এসেছি, এবং আসার একটা প্রধান কারণ হল আপনার সঙ্গে দেখা করা। মনে হয়, আপনি ব্যাপারটা শুনলে ইন্টারেস্টেটেড হবেন।'

'টেলিফোনে এর বেশি বলা যাবে না বোধ হয় ?'

'আজ্ঞে না। ভেরি স্যরি।'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল সকাল নটায়। 'কণ্ঠস্বরে বেশ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়', বলল ফেলুদা। আমারও অবিশ্যি তাই মনে হয়েছিল। মনে মনে বললাম—সকালে বাটরা, বিকেলে সোম—মক্কেলের কিউ লেগে গেছে।

আজকাল ফেলুদার সঙ্গে আমিও যোগব্যায়াম করি। সকাল আটটার মধ্যে স্নান-টান সেরে দু'জনেই সারা দিনের জন্য তৈরি। সে দিন সাড়ে আটটায় লালমোহনবাবু ফোন করে বললেন,

নিউমার্কেটে একটা দোকানের উইন্ডোতে নাকি একটা লাইট গ্রিন জার্কিন দেখেছেন, সেইটের দরটা জেনেই আমাদের বাড়িতে চলে আসবেন। বুঝলাম, ভদ্রলোক হিল স্টেশনে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিয়েছেন।

পৌনে দশটাতেও যখন অনীকেন্দ্র সোম এলেন না, তখন হাত থেকে খবরের কাগজটা পাশে ফেলে ফেলুদার মাথা নাড়ার ভাবটা দেখে বুঝলাম, বাঙালিদের পাংচুয়ালিটির অভাব নিয়ে একটা তেতো মন্তব্য করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল।

'মার্ডার ভিকটিমের নোটবুকে আপনার ফোন নম্বর দেখছি কেন মশাই ?'

প্রশ্নটার মধ্যে একটা ভড়কে দেবার ভাব থাকলেও, আসলে সেটা যে হালকা মেজাজেই করা হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রশ্নকর্তা হচ্ছে জোড়াসাঁকো থানার ইন্সপেক্টর মহিম দত্তগুপ্ত।

ফেলুদার কপালে খাঁজ।

'কে খুন হল ?'

'চলে আসুন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। সেন্ট্রাল হোটেল। তেইশ নম্বর ঘর।'

'অনীকেন্দ্র সোম কি ?'

'আপনার চেনা নাকি ?'

'পরিচয় হবার কথা ছিল আজ সকালেই। কীভাবে খুন হল ?'

'ছুরিকাঘাত।'

'কখন ?'

'আর্লি মর্নিং। এলে সব জানতে পারবেন। আমি এসেছি এই মিনিট কুড়ি।'

'আমি চেষ্টা করছি আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে।'

লালমোহনবাবু এলেন দশ মিনিট পরেই, তবে ঘরে ঢোকার আর সুযোগ পেলেন না। 'মার্ডার!' বলে লালমোহনবাবুকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তার গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে তাঁর পাশে বসে ফেলুদা ড্রাইভার হরিপদবাবুকে বলল, 'সেন্ট্রাল হোটেলে, চট-জলদি।'

boiRboi.net

আপিসের ট্রাফিক, তার মধ্যেই যথাসম্ভব স্পিডে চলেছে আমাদের গাড়ি, আমি সামনে বসে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখেই বুঝেছি, লালমোহনবাবুর অবস্থা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। এটাও তিনি জানেন যে, এ অবস্থায় ফেলুদাকে কোনও প্রশ্ন করেই উত্তর পাবেন না।

হোটেলে পৌঁছে যেটা জানা গেল, তা মোটামুটি এই। রবিবার সন্ধ্যাবেলা অনীকেন্দ্র সোম এসে হোটেলে ওঠেন। খাতা থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি থাকেন কানপুরে। আগামীকাল তাঁর চলে যাবার কথা ছিল। আজ ভোর পাঁচটায় নাকি একজন লোক এসে তাঁর খোঁজ করেন। তাঁকে বলা হয় সোম থাকেন তেইশ নম্বর ঘরে। দোতলার ঘর, তাই আগন্তুক লিফটে না উঠে সিঁড়ি দিয়েই ওঠেন, আর মিনিট পনের বাদেই নাকি চলে যান। চেহারার বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, পরিষ্কার রঙ, দাড়ি-গোঁফ নেই, পরনে ছাই রঙের প্যান্ট আর নীল বুশ সার্ট। দারোয়ান বলল যে, ভদ্রলোক নাকি একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

মিঃ সোম আটটায় ব্রেকফাস্ট চেয়েছিলেন, রুমবয় ঠিক সময়ে গিয়ে দরজার বেল টিপে কোনও সাড়া পায়নি। তার পর ডুপলিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে দেখে, দরজার সামনেই পড়ে আছে মিঃ সোমের মৃতদেহ। অস্ত্রটা হচ্ছে একটা নেপালি কুক্‌রি। সেটা মেরেছে বুকের মোক্ষম জায়গায়, এবং সেটাকে আর বার করা হয়নি।

তেইশ নম্বর ঘরে পুলিস খানাতল্লাসি করছে, তবে জিনিস বলতে বিশেষ কিছুই নেই। একটি মাত্র ছোট ভি আই পি ব্যাগ, তাতে দিন-তিনেকের ব্যবহারের জন্য জামা-কাপড়। টাকা-পয়সা কিছুই পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলো আততায়ীই সরিয়েছে। ফেলুদা লাশ দেখে এসে বলল ভদ্রলোক রীতিমতো সুপুরুষ ছিলেন, বয়স ত্রিশের বেশি নয়। রুম-বয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মিঃ সোম সিগারেট খেতেন না, ড্রিংক করতেন না। রিসেপশনে বসেন মিঃ লতিফ, তিনি বললেন মিঃ সোম নাকি গতকাল বেশির ভাগ সময়টাই হোটেলের বাইরে ছিলেন, ফেরেন

বৃষ্টি নামার ঘন্টাখানেক আগে। আজ ভোরে ছাড়া ওঁর কাছে কোনও ভিজিটর আসেনি, কেউ টেলিফোনেও ওঁর খোঁজ করেনি। তবে হ্যাঁ, এই হোটেলের ঘরে টেলিফোন নেই, তাই মিঃ সোম নাকি কাল রাত্রে রিসেপশন থেকে ডিরেক্টরি দেখে একটা নম্বর বার করে কাকে যেন টেলিফোন করেন, এবং করার পর নিজের নোটবুকে নম্বরটা লিখে নেন।

যে নোটবুকে ফেলুদার নম্বরটা ছিল, সেটা পাওয়া যায় খাট এবং বেডসাইড টেবিলের মাঝখানে মেঝেতে। নতুন কেনা নোটবুক, তার প্রথম তিনটে পাতাতেই শুধু লেখা। এলোমেলো টুকরো টুকরো কথা—বাংলা ইংরেজি মেশানো। 'কী মনে হচ্ছে বল তো ?'—একটা পাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'লেখা মাঝে মাঝে কেঁপে গেছে, বিশেষ করে "ঘাঁটি" কথাটা তো প্রায় পড়াই যায় না।'

'প্রচণ্ড নার্ভাস টেনশনে লিখেছেন বলে মনে হয়', মন্তব্য করলেন জটায়ু।

'অথবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান কোনও যানে,' বলল ফেলুদা, 'ধরুন ঘন্টায় ছ'শো মাইল।'

বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা প্লেনের কথা বলছে। জেটপ্লেনের স্পিড গড়ে ঘন্টায় ছ'শো মাইল হতে পারে।

'আমার বিশ্বাস ঘাঁটি কথাটা লেখার সময় প্লেনটা একটা এয়ারপকেটে পড়েছিল,' বলল ফেলুদা।

'মোক্ষম ধরেছেন,' বললেন জটায়ু, 'সেবার বম্বে যাবার সময় মনে আছে সবেমাত্র কফিতে চুমুক দিয়েছি—আর অমনি পকেট ! সে মশাই কফি অন্ননালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষম-টিষম লেগে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।'

ফেলুদা লেখাগুলো নিজের খাতায় টুকে নিয়ে নোটবুকটা মহিমবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল।

'আমরা কানপুরে জানিয়ে দিচ্ছি,' বললেন মহিম দত্তগুপ্ত, 'লাশ সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে তো।'

ফেলুদা বলল, 'আমার বিশ্বাস, রাত্তিরে দিল্লি থেকে একটা ফ্লাইট আছে, যেটা কানপুর হয়ে আসে। গত রবিবারের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম নামে কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল কিনা, সেটাও খোঁজ করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা লোকটা কোনও পাহাড়ি জায়গা থেকে আসছে।'

'কেন বলুন তো ?'

'এক জোড়া মাউন্টেনিয়ারিং বুটস দেখলাম, তার একটার তলায় এক টুকরো ফার্ন লেগে রয়েছে, যেটা পাহাড়েই থাকা স্বাভাবিক।'

মহিমবাবু বললেন নতুন কোনও তথ্য পেলেই জানিয়ে দেবেন, বিশেষ করে কুক্‌রির হাতলে কোনও ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া গেল কিনা।

'আর গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকেই প্যাসেজের বাঁ দিকে একটা কিউরিওর দোকান আছে,' বলল ফেলুদা, 'খোঁজ করে দেখতে পারেন, কুক্‌রিটা ওখান থেকেই কেনা হয়েছে কিনা।'

ফেরার পথে নোটবুকের তিনটে পাতায় যে লেখাগুলো ছিল, সেগুলো দেখাল ফেলুদা।

প্রথম পাতায় দু' লাইন লেখা—১) only L S D কি ? ২) ASK C P about methods and past cases.

দ্বিতীয় পাতায় তিন লাইন—১) ঘাঁটি এখানে না ওখানে ? ২) A B সম্বন্ধে আগে জানা দরকার ; ৩) Ring up P C M, D D C.

তৃতীয় পাতায় শুধু আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর।

'ফরেন কারেন্সি ঘটিত কোনও ব্যাপার নাকি মশাই ?' প্রশ্ন করলেন জটায়ু। মেট্রো ছাড়িয়ে চৌমাথায় লাল বাতিতে এসে থেমেছে আমাদের গাড়ি।

'কেন বলুন তো ?'

'না, ওই এল এস ডি দেখলাম কিনা। পাউন্ড-শিলিং-পেন্স তো ?'

'আপনি বৈষয়িক চিন্তাটা একটু কম করুন তো মশাই,' মেকি ধমকের সুরে বলল ফেলুদা—'এল এস ডি হল এক রকম ড্রাগ। লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইয়েথিলামাইড। হিপিদের দৌলতে এর

খ্যাতি এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বলেন, মানুষের মগজে সেরোটোনিন বলে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেটা মানুষকে সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে বুঝতে, চিন্তা করতে সাহায্য করে। এল এস ডি নাকি সেরোটোনিনের মাত্রা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য মানুষ তাই একটা অবাস্তব জগতে বিচরণ করে। ধরুন, এই চৌরঙ্গিকে মনে হতে পারে নন্দনকানন।'

'বলেন কি! এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায় নাকি?'

'তা যায় বইকি। তাই বলে কি আর দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সে গিয়ে চাইলে পাবেন? এ সব পাওয়া যায় গোপন আস্তানায়। গ্লোব সিনেমার পিছন দিকে হিপিদের একটা হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলে পরে এক-আধটা শুগার কিউব পেলেও পেতে পারেন।'

'শুগার কিউব?'

'চার চৌকো চিনির ডেলা দেখেননি? তার মধ্যে পোরা থাকে এক কণা এল এস ডি। এই এক কণার তেজ আপনার ভাষায় ফাইভ থাউজ্যান্ড হর্স পাওয়ার। অবিশ্যি এল এস ডি সেবন করে সাময়িক স্বর্গবাস নরকবাস দুই-ই হতে পারে। সেটা কে খাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। সিঁড়ি নামছে মনে করে সাততলার ছাতের কার্নিশে দাঁড়িয়ে শূন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে এল এস ডি-র প্রভাবে, এও শোনা যায়।'

'তার মানে পপাত চ— ?'

'অ্যান্ড মমার চ।'

'কী ভয়ঙ্কর!'

boiRboi.net

৩

খুনটা হয়েছিল মঙ্গলবার সকালে। বিষ্যুদবার দুপুরে ফেলুদার ফোন এল মহিম দত্তগুপ্তর কাছ থেকে। খবর আছে অনেক।

অনীকেন্দ্র সোম কানপুরের আই আই টি-তে অধ্যাপনা

করতেন। সেখানে তাঁর কোনও আত্মীয় থাকে না। তবে তাঁরা খবর পাঠান যে কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোমের এক ভাই থাকে। সে নাকি স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করে। পুলিস তার হদিশ বার করে। ভদ্রলোক নাকি খবরের কাগজে তাঁর দাদার মৃত্যু-সংবাদটা মিস্ করে গেছিলেন। যাই হোক, তিনি লাশ সনাক্ত করে যান, এবং বলেন যে অনীকেন্দ্রবাবু নাকি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতেন না। কলকাতায় প্রায় আসতেন না বললেই চলে। তবে দাদা একটু খামখেয়ালী হলেও, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন সেটা ভাই স্বীকার করেন।

দু' নম্বর—কুক্‌রিতে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ খুনী অত্যন্ত সাবধানী লোক। যে ভাবে যে অ্যাঙ্গেলে ছোরা বুকে ঢুকেছে, তাতে মনে হয় খুনী ন্যাটা বা লেফট-হ্যান্ডেড। গ্র্যান্ড হোটেলের কিউরিওর দোকানের মালিক ছোরাটা দেখে চিনেছেন এবং বলেছেন সেটা তাঁরা বিক্রি করেন সোমবার সকালে মিঃ বাটরা নামক এক ব্যক্তিকে। ইনি গ্র্যান্ড হোটেলেই ছিলেন, এবং যেদিন খুন হয় সেদিন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সকাল ন'টার ফ্লাইটে চলে যান কাঠমাণ্ডু।

তিন নম্বর—কানপুর হয়ে আসা দিল্লীর রবিবারের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম বলে কোনও যাত্রী ছিলেন না। তবে রবিবারের অন্য সব ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে পুলিস জেনেছে যে, সে দিন কাঠমাণ্ডু-ক্যালকাটা বিকালের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম নাকে একজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। এক ঘন্টা লেট ছিল ফ্লাইটটা; সেটা এসে দমদমে পৌঁছায় সাড়ে পাঁচটায়।

মহিমবাবু শেষ কথা বললেন এই যে, খুনী যখন বিদেশে ভাগলওয়া, তখন এখান থেকে কিছু করার কোনও সোজা রাস্তা নেই। কেসটা আপাতত চলে যাচ্ছে সি আই ডি হোমিসাইডের হাতে। সেখান থেকে দিল্লীর হোম ডিপার্টমেন্টে জানালে পর তারা আবার নেপাল সরকারের অনুরোধ জানাবেন এই খুনের তদন্তে সহায়তার জন্য। নেপাল সরকার সম্মতি জানালে পর এখান থেকে সি আই ডি-র লোক চলে যাবে কাঠমাণ্ডু।

ফেলুদা ফোনটা রাখার সময় শুধু একটি কথাই বলল—

'বেস্ট অফ লাক্ !'

এর পর দুটো দিন ফেলুদার কথা একদম বন্ধ। তবে ও যে গভীরভাবে চিন্তা করছে সেটা ওর ঘনঘন পায়চারি, মাঝে মাঝে আঙ্গুল মটকানো, আর হঠাৎ হঠাৎ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে থাকা দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

দ্বিতীয় দিন লালমোহনবাবু এসে প্রায় দু' ঘন্টা রইলেন, অথচ পুরো সময়টা ফেলুদা টোট্যালি মৌনী। ভদ্রলোক শেষটায় যা বলার আমাকেই বললেন, এবং মোদ্দা ব্যাপারটা এই যে, উনি নাকি গতকাল এক আশ্চর্য পামিস্টের কাছে গিয়ে হাত দেখিয়ে এসেছেন।

'বুঝলে ভাই তপেশ, ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মৌলিনাথ ভট্টাচার্য। শুধু যে দুর্ধর্ষ হাত-দেখিয়ে তা নয়, ওরিজিন্যাল রিসার্চ আছে। বলেন, মানুষের মতো বাঁদরের হাতেও নাকি রেখা থাকে, আর সে রেখা পড়া যায়। আমাদের চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাজি আছে। মৌলিবাবু কিউরেটারকে বলে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে, যে লোকটা শিম্পাজিটার দেখাশোনা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিলেন খাঁচার ভেতর। বললেন ভারী সভ্য জানোয়ার। দশ মিনিট ধরে হাত বাড়িয়ে বসে ছিল, টুঁ শব্দটি করেনি। কেবল বেরোবার সময় নাকি ভদ্রলোকের কাছাটা টেনে খুলে দেয়, হুইচ মে বি অনিচ্ছাকৃত। যাই হোক, হেড লাইন, লাইফ লাইন, হার্ট লাইন, ফেট লাইন—সব আছে ওই বাঁদরের হাতে। ওটা মরবে এইটটি-থ্রির অগাস্টে। অ্যাট দি এজ অফ থার্টি থ্রি। আমি ডায়রিতে নোট করে নিয়েছি। আমার তো মনে হয় ফলে যাবে। তুমি কী বল ?'

আমি বললাম, 'ফললে নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। কিন্তু আপনাকে কী বললেন ?'

'সে তো আর-এক মজা। বছর পাঁচেক আগে কৈলাস বোস স্ট্রিটে এক পামিস্টকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ফরেন

ট্যুর নেই। ইনি দেখিয়ে দিলেন পষ্টো রয়েছে। না হয়ে যায় না।'

লালমোহনবাবু হতাশ হননি। পরদিনই সকালে চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'বুঝলি তোপসে, মন বলছে অল রোডস্ লিড টু নেপাল। আর তার মধ্যে কিছু রাস্তা বেশ সর্পিল। অতএব নেপাল যাওয়াটা ফেলু মিত্তিরের কর্তব্য।'

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে কাঠমাণ্ডু ফ্লাইটে তিনজনের টিকিট কিনে, লন্ড্রি থেকে গরম জামা আনিয়ে, পুষ্পক ট্র্যাভেলস-এর সুদর্শনবাবুকে দিয়ে ওখানকার হোটেল বুক করার কথা বলে দিয়ে আমাদের রওনা হতে আরও তিন দিন লেগে গেল।

এরই মধ্যে একদিন আমি ফেলুদাকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার কি ধারণা নকল বাটরাও কাঠমাণ্ডু চলে গেছে?'

ফেলুদা বলল, 'খুন করে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে আছে। শুনলি তো মহিমবাবু কী বললেন—দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত তো খুনী নিশ্চিন্ত। যুক্তরাষ্ট্রে খুন করে অনেকে সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে যায় মেকসিকোতে, শুনেছিস তো। ভারত আর নেপালও তো সেই একই ব্যাপার।'

যাবার আগের দিন সকালবেলা লালমোহনবাবু এসে বলে গেলেন যে, লেনিন সরণির মোড়ে নকল বাটরাকে দেখেছেন। সে নাকি একটা ঠাণ্ডাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লস্যি খাচ্ছিল। ফেলুদা চারমিনারে টান দিয়ে সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করল, 'গেলাসটা বাঁ হাতে ধরেছিল কিনা সেটা লক্ষ করেছিলেন?'

'এই রে!'

লালমোহনবাবু জিভ কেটে বুঝিয়ে দিলেন সেটা করেননি।

'তা হলে আপনার স্টেটমেন্টের কোনও মূল্য নেই', বলল ফেলুদা।

এয়ারপোর্টের কাউনটারে ফেলুদার চেনা লোক ছিল। তিনি বললেন, 'আপনাদের ডান দিকে সিট দিচ্ছি, তা হলে ভাল ভিউ পাবেন।'

ভাল ভিউটা যে কতটা ভাল সেটা যে না দেখেছে তাকে বলে বোঝানো মুশকিল। স্বপ্নেও কি ভাবা যায় যে কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ডান দিকে চেয়ে দেখতে পাব দূরে ঝলমল করছে আমাদের সেই ছেলেবেলা থেকে চেনা কাঞ্চনজঙ্ঘা ?

আর তার পরেই অবিশ্যি শুরু হল সারা ডান দিকটা জুড়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত সব পর্বতশৃঙ্গ, তার অনেকগুলোই কোনও-না-কোনও সময়ে কোনও-না-কোনও দেশের বিখ্যাত পর্বতারোহী দলগুলোকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গেছে শেরপাদের দেশে, যেখান থেকে তারা থোড়াই-কেয়ার মেজাজে মরণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শৃঙ্গবিজয় অভিযানে।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি যে এই প্লেনের অধিনায়ক সেটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা জানালা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বরফের চুড়োগুলোর দিকে দেখছি, এমন সময় একজন বাঙালি এয়ার হোস্টেস এসে ফেলুদার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন একবার আপনাকে ককপিটে ডেকেছেন।'

ফেলুদা ওঠবার জন্য তৈরি হয়ে মেয়েটিকে বলল, 'আমার পরে এঁরা দু-জনও একবার যেতে পারেন কি ?'

এয়ার হোস্টেস হেসে বললেন, 'আপনারা তিনজনেই আসুন না।'

ককপিটে জায়গা খুবই কম, তবে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের দু' দিক দিয়ে গলা বাড়িয়ে আমরা দুজনে যা দেখলাম, তাই যথেষ্ট। দেখে মনের যে ভাবটা হল, সেটাকে লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন 'স্তব্ধভাষ রুদ্ধশ্বাস বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়'। পর পর চুড়োর লাইন ডান দিক থেকে এসে বাঁয়ে ঘুরে প্লেন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটা প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। দূরত্ব যতই কমে আসছে, শৃঙ্গগুলো ততই ফুলে ফেঁপে মেঘ চিতিয়ে উঠছে। কো-পাইলটের হাতে একটা হ্যাডলি চেজের বই, তিনি সেটাকে বন্ধ করে পর পর চুড়াগুলো চিনিয়ে দিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরই মাকালু, আর তার দুটো চুড়োর পরেই এভারেস্ট। বাকিগুলোর মধ্যে যে নামগুলো

আমার চেনা সেগুলো হল গৌরীশঙ্কর, অন্নপূর্ণা আর ধবলগিরি।

মিনিট পাঁচেক ককপিটে থেকে আমরা ফিরে এলাম। এক ঘন্টা লাগে কাঠমাণ্ডু পৌঁছাতে। এয়ার হোস্টেস চা দিয়েছিল, সেটা শেষ হতে না হতে বুঝতে পারলাম প্লেন নিচে নামতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, নিচে ঘন সবুজ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এই সেই বিখ্যাত তেরাই। এর পরে মহাভারত পাহাড় পেরিয়েই কাঠমাণ্ডু ভ্যালি।

সামনে একটা বিশাল সাদা মেঘের কুণ্ডলী, আমাদের প্লেনটা তার মধ্যে ঢুকতেই বাইরের দৃশ্য মুছে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি শুরু হল।

মিনিটখানেক এই অবস্থায় চলার পর হঠাৎ মেঘ সরে গেল, ঝাঁকুনি থেমে গেল, আর ঝলমলে রোদে দেখতে পেলাম, নিচে বিছিয়ে আছে এক আশ্চর্য সুন্দর উপত্যকা।

'এ যে ফরেন কান্ট্রি সে আর বলে দিতে হয় না মশাই,' ঢোক গিলে কানের তালা ছাড়িয়ে অবাক চোখ করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা ঠিকই। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই। পাহাড় নদী ধানক্ষেত গাছপালা ঘরবাড়ি সবই আছে, কিন্তু তাও যেন একেবারে অন্য রকম।

'গ্রামের বাড়িগুলো লক্ষ কর,' বলল ফেলুদা, 'চিনেদের তৈরি ইটের দোতলা বাড়ি, তার উপর খড়ের চাল। এ জিনিস আমাদের দেশে দেখতে পাবি না।'

'ওগুলো কি মন্দির নাকি মশাই?'

'বৌদ্ধমন্দির,' বলল ফেলুদা। 'নদীর এ পারে, তাই মনে হয় ওটা পাটন শহর। আর ওইটে কাঠমাণ্ডু।'

আমাদের প্লেনের ছায়াটা কিছুক্ষণ থেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। লক্ষ করছিলাম, সেটার বড় হওয়ার স্পিড ক্রমেই বাড়ছে; এবারে সেটা যেন হঠাৎ তড়িঘড়ি ছুটে এসে বিরাট হয়ে আমাদের প্লেনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমরা ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছি।

boiRboi.net

৪

এয়ারপোর্টে বেশ চনমনে অভিজ্ঞতা হল। এ রকম বিদেশী টুরিস্টের ভিড় এর আগে একবারই দেখেছি, বোম্বের তাজমহল হোটেলের লবিতে।

আগেই জানতাম এখানে কাস্টমস-এর ঝামেলা আছে, চেকিং-এর একটু বাড়াবাড়ি, সকলেরই সুটকেস নাকি খুলে দেখে। আমাদের কাছে আপত্তিকর কিছুই নেই, তাও লালমোহনবাবু দাঁতে দাঁত চেপে আছেন কেন জিগ্যেস করাতে বললেন, একটা টিফিন বক্সে কিছু আমসত্ত্ব এনিচি ভাই। ফরেন কান্ট্রি, যদি সন্দেহ-টন্দেহ করে।'

শেষ পর্যন্ত কাস্টমস কিছু বলল না দেখে লালমোহনবাবু একটা হাঁপ-ছাড়া হাসি হেসেই হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন, সেটা ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম।

ফেলুদা আগেই দেখেছে লোকটাকে। একজন লালচে দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ ঢ্যাঙ্গার সঙ্গে কথা বলছেন লাউঞ্জের কোণে দাঁড়িয়ে হয় নকল নাহয় আসল বাটরা।

না, নকল নয়, আসল।

ফেলুদার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে ভদ্রলোক সাহেবকে 'এক্সকিউস মি' বলে ভুরু কপালে তুলে হেসে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'ওয়েলকাম টু কাঠমাণ্ডু!'

'শেষ পর্যন্ত নিজেদের তাগিদেই এসে পড়লাম', বলল ফেলুদা।

'ভেরি গুড, ভেরি গুড!' তিনজনের সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করলেন ভদ্রলোক। 'ফরচুনেটলি, সে লোক বোধ হয় আর আমাকে ফলো করেনি, মিঃ মিটরা। এ ক' দিনে আর কোনও গোলমাল হয়নি। আপনারা ক' দিন আছেন?'

'দিন সাতেক?'

'কোথায় উঠছেন?'

'হোটেল লুম্বিনীতে রিজার্ভেশন আছে।'

boiRboi.net

'নতুন হোটেল', বললেন মিঃ বাটরা, 'অ্যান্ড কোয়াইট গুড। আপনারা সাইট-সিইং-এ যেতে চাইলে আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমার আপিস আপনাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ইয়ে—এ খবরটা আপনি দেখেছেন কি? কলকাতার কাগজ এখানে আসে?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কাটিং বার করে বাটরার হাতে দিল। আমি জানি এটা অনীকেন্দ্র সোমের খুনের খবর, স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল। তাতে এটাও বলা হয়েছিল যে, খুনটা করা হয়েছিল একটা নেপালি কুক্‌রির সাহায্যে।

'আপনি যেদিন এলেন, সে-দিনকারই ঘটনা এটা।'

boiRboi.net

মিঃ বাটরা খবরটা পড়ে কাগজটা থেকে চোখ তুলে গভীর সংশয়ের দৃষ্টিতে চাইলেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলল, 'কুকরিটা গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল খুনের আগের দিন সেটা পুলিশ ভেরিফাই করেছে। দোকানী এটাও বলে যে, যিনি কিনেছিলেন তার নাম বাটরা।'

'হাউ টেরিব্‌ল !'

মিঃ বাটরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'আপনি বোধ হয় এই অনীকেন্দ্র সোমের নাম শোনেননি ?'

'নেভার,' কাটিংটা ফেরত দিয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

'ইনি কিন্তু একই প্লেনে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে।'

'ফ্রম কাঠমাণ্ডু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নেপাল এয়ার লাইনস্ ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চেহারা দেখলে হয়তো চিনতে পারতাম। একশো ত্রিশজন প্যাসেঞ্জার ছিল ওই ফ্লাইটে, মিঃ মিটরা।'

'যাই হোক, আপনি আর এর মধ্যে কলকাতা-টলকাতা যাবেন না, তা হলে গোলমালে পড়তে পারেন,' মোটামুটি হালকা ভাবেই বলল ফেলুদা।

'কিন্তু আমাকে ফাঁদে ফেলার এ রকম চেষ্টা কেন, মিঃ মিটরা ?' প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

ফেলুদা বলল, 'একজন ক্রিমিন্যাল যদি আবিষ্কার করে যে, আর-একজন লোকের সঙ্গে তার চেহারায় খুব মিল, তা হলে তার নিজের ক্রাইমের বোঝাটা সেই লোকের ঘাড়ে ফেলার চেষ্টাটা কি তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক ?'

'সে তো মানছি, কিন্তু এ তো সাধারণ ক্রাইম নয়, এ যে মার্ডার !'

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা খুনী কাঠমাণ্ডুতেই ফিরে আসবে, এবং আমার সঙ্গে তার একটা মোকাবিলা হবেই। এই অনীকেন্দ্র সোম কতকটা আমার সাহায্য চাইতেই কলকাতায় গিয়েছিলেন।

কী কারণে সেটা আর জানা হয়নি। তার খুনী বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে সেটা আমি মানতে পারছি না, মিঃ বাটরা। আমি অনুরোধ করব, আপনি বা আপনার কোনও লোক যদি তাকে কাঠমাণ্ডুতে দেখেন, তা হলে আমি যেন একটা খবর পাই।'

'সেটা আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে,' বললেন মিঃ বাটরা। 'আমি কালকের দিনটা থাকছি না, একটা অ্যামেরিকান টুরিস্ট দলের সঙ্গে পোখরা যেতে হচ্ছে, পরশু ফিরে এসে আপনাকে কনট্যাকট করব।'

কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে আমরা ট্যাক্সিতে করে রওনা দিলাম। জাপানী ডাটসুন ট্যাক্সি, রাস্তায় জাপানী ও বিদেশী গাড়ির ছড়াছড়ি, পরিষ্কার চওড়া রাজপথের ধারে ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি, পেল্লায় পার্কের মধ্যে বাহারের স্পোর্টস স্টেডিয়াম, বিরাট বিরাট বিলিতি ধাচের বিল্ডিং—যার অনেকগুলোই নাকি আগে রাণাদের প্রাসাদ ছিল—দূরে এখানে-ওখানে মাথা উঁচিয়ে আছে হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরের চুড়ো—সব মিলিয়ে ফরেন-ফরেন ভাবটা যে ক্রমে লালমোহনবাবুকে আরও বেশি করে পেয়ে বসছে, সেটা তাঁর হাত কচলানি আর আধ-বোজা চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। নেপালের রাজাই যে পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাজা—সেটা শুনে তিনি যেমন ইমপ্রেসড, তেমনই ইমপ্রেসড শুনে যে নেপালের লুম্বিনী শহরেই বুদ্ধের জন্ম, আর নেপাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল চিন আর জাপানে!

শহরের মেইন রাস্তা 'কান্তি পথ' দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে একটা কারুকার্য করা তোরণের ভিতর দিয়ে আমরা এসে পড়লাম নিউ রোডে। এই নিউ রোডেই আমাদের হোটেল। দু' দিকে দেখে বুঝলাম, এটা দোকান আর হোটেলেরই পাড়া। লোকের ভিড়টাও এখানেই প্রথম চোখে পড়ল।

একটা চৌমাথার কাছাকাছি এসে আমাদের ট্যাক্সিটা রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে রাস্তার উল্টো দিকে একটা বাহারের কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো দরজার সামনে থামল। এক দিকের পাল্লার কাচে লেখা 'হোটেল', অন্য দিকে 'লুম্বিনী'!

ফেলুদা একদিন বলছিল ভ্রমণের বাতিকটা বাঙালিদের মধ্যে যেমন আছে, ভারতবর্ষের আর কোনও জাতের মধ্যে তেমন নেই ; আর এই বাতিকটা নাকি মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাতায়াতের খরচ যত বাড়ছে, ভ্রমণের নেশাও নাকি বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

কাঠমাণ্ডুতে এসেও যার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল, তিনি একজন বাঙালি ট্যুরিস্ট। হোটেলের রিশেপসনে দাঁড়িয়ে খাতায় নাম লেখা হচ্ছে, এমন সময় ভদ্রলোক পাশের একটা সোফা থেকে উঠে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'আপনারা আই-এ ফ্লাইটে এলেন ?' লালমোহনবাবুকে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখে তাকেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস। দশ মিনিট লেট ছিল।'

'এদিকে এই প্রথম ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পারলে পোখরাটা একবার ঘুরে আসবেন। বেড়াতে এসেছেন তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হলিডে,' ফেলুদার দিকে একবার আড়-চোখে দেখে বললেন জটায়ু।

'আপনি এখানে থাকেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। বেয়ারা এসে আমাদের মালপত্র নিয়ে গেছে দোতলায়। দুটো পাশাপাশি ঘর আমাদের—দুশো ছাব্বিশ, দুশো সাতাশ।

'আমি কলকাতার লোক,' বললেন ভদ্রলোক, 'বেড়াতে এসেছি ফ্যামিলি নিয়ে। ইনি অবিশ্যি এখানেরই বাসিন্দা।'

আর-একজন বয়স্ক ভদ্রলোকও যে সোফাটায় বসেছিলেন, সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, টকটকে রং, চুল ধপধপে সাদা। সব মিলিয়ে রীতিমতো সৌম্য চেহারা।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের নমস্কার করলেন।

'এনারা নেপালে আছেন প্রায় তিনশো বছর,' প্রথম ভদ্রলোকটি বললেন।

'বলেন কি !' ফেলুদা ও জটায়ু একসঙ্গে বলে উঠল।

boiRboi.net

'সে এক ইতিহাস। শুনে দেখবেন এঁর কাছে।'

'তা চলুন না আমাদের ঘরে,' বলল ফেলুদা। 'আমি এমনিতেই নেপালের বাঙালিদের সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম, একটা বিশেষ দরকারে।'

আমি জানি ফেলুদা কী দরকারের কথা বলছে, আর এটাও জানি যে, দরকার না থাকলে ফেলুদা চট করে কাউকে প্রথম আলাপেই নিজের ঘরে ডেকে এনে গপ্পো করে না।

দুশো ছাব্বিশ-টা ডাবল রুম, অর্থাৎ আমার আর ফেলুদার ঘর। সেখানেই বসে রুম সার্ভিসকে বলে আনানো চা খেতে খেতে কথা হল।

কাঠমাণ্ডুর বাসিন্দা ভদ্রলোকটির নাম হরিনাথ চক্রবর্তী। ত্রিভুবন কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন, পাঁচ বছর হল রিটায়ার করেছেন। তিনি তাঁদের বংশের ইতিহাস যা বললেন তা হল এই—

প্রায় তিনশো বছর আগে নেপালে নাকি একবার প্রচণ্ড খরা হয়। এখানে তখন মল্লদের রাজত্ব। রাজা জগৎজয় মল্ল এক বিখ্যাত তান্ত্রিককে নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে, যদি তার তন্ত্রের জোরে তিনি খরা দূর করতে পারেন। এই তান্ত্রিক ছিলেন হরিনাথের পূর্বপুরুষ জয়রাম চক্রবর্তী। জয়রামের পুজোর জোরে নাকি কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় এগারো দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়। জগৎজয় মল্ল জমিজমা দিয়ে জয়রামকে সপরিবারে কাঠমাণ্ডুতেই রেখে দেন। পঁচিশ বছরে এক পুরুষের হিসেবে চক্রবর্তীরা কাঠমাণ্ডুতে দশ-পুরুষ ধরে আছেন। মল্লদের পরে রাণাদের আমলেও চক্রবর্তীদের খাতির কমেনি, কারণ রাণারাও ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। দুই পুরুষ আগে অবধি পুজো-আচ্চার কাজই চালিয়ে এসেছেন চক্রবর্তীরা। হরিনাথবাবুর এক কাকা এখনও পশুপতিনাথের মন্দিরের পূজারীদের একজন। হরিনাথের বাবা দীননাথই প্রথম কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ফিরে এসে তিনি রাণাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউশনি করেন বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। হরিনাথবাবুও কলকাতায় লেখাপড়া করেন। তাঁর ছিল ইংরেজি সাহিত্যের দিকে

ঝোঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে তিনিও কাঠমাণ্ডু ফিরে এসে একই রাণা পরিবারে প্রাইভেট টিউশনি করেন। তার পর যখন রাণাদের প্রতিপত্তি চলে গিয়ে রাজা ত্রিভুবনের নামে কলেজ তৈরি হল, তখন হরিনাথ সেই কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

'অবিশ্যি আমার ছেলেরা মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিল', তাঁর কাহিনী শেষ করে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী। 'বড়টি—নীলাদ্রি—ছিল মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের শিক্ষক।'

'ছিল মানে ?'

'সে সেভেনটি-সিক্সে পাহাড় থেকে পড়েই মারা যায়।'

'আর অন্যটি ?'

'হিমাদ্রি করত নেপাল সরকারের চাকরি। হেলিকপটার-পাইলট। তেরাই-এর জঙ্গল আর হিমালয়ের পিকগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসত টুরিস্টদের। সেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে আজ তিন হপ্তা হল।'

'এয়ার ক্র্যাশ ?'

ভদ্রলোক বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন।

'তা হলে তো তবু এক রকম বীরের মৃত্যু হত। এক বন্ধুকে থ্যাংবোচে নিয়ে যায় সেখানকার মনাস্টারি দেখাতে। ফিরে এসে দেখে, কখন যেন হাতে একটা সামান্য ইনজুরি হয়েছে। কাউকে বলেনি, ডেটল লাগিয়ে চুপচাপ ছিল। শেষটায় ওর বন্ধুর চোখে পড়ে। তার ধারণা, একটা কাঁটাতারের বেড়া পেরোনোর সময় স্ক্র্যাচটা হয়েছে, সুতরাং কোনও রিস্ক না নিয়ে অ্যান্টি-টিট্যানাস ইনজেকশন নেওয়া উচিত। শেষটায় বন্ধুই ডাক্তার ডেকে এনে জোর করে ইনজেকশন নেওয়ায়।'

'তার পর ?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'কিছুই হল না। সেই টিট্যানাসেই মরল।'

'দেরি হয়ে গিয়েছিল কি ইনজেকশন নিতে ?'

'দেরি আর কী করে বলি ? বন্ধুটির হিসেবে বিকেলে জখমটা

হয়েছে। পরদিন সকালে ইনজেকশন পড়েছে। কিন্তু ফল হল না। ইনজেকশনের কিছু পর থেকেই কনভালশন শুরু হল। এক দিনের মধ্যে সব শেষ।'

'ডাক্তার কি আপনার বাড়ির ডাক্তার ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'বাড়ির ডাক্তার না হলেও, ডঃ দিবাকরকে আমরা যথেষ্ট চিনি। ইদানীং প্র্যাকটিসও বেড়েছে খুব—নতুন গাড়ি, বাড়ি—বোধ হয় ডঃ মুখার্জি মারা যাবার পর থেকেই। মুখার্জি ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।'

এবার অন্য বাঙালি ভদ্রলোকটি একটি মন্তব্য করলেন।

'ডাক্তারের কথা জিগ্যেস করে কী হবে ? বরং ওষুধের কথা জিগ্যেস করুন। ওষুধে কাজ না দেওয়াটা আর আজকের দিনে কি আজব ব্যাপার মশাই ? এ তো আকছার হচ্ছে। অ্যামপুলে জল, ক্যাপসুলে চুণ, চকখড়ি, এমন কি স্রেফ ধুলো—এ সব শোনেননি ?'

হরিনাথবাবু একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'বেশির ভাগ লোকে আপনার কথাটাই বলবে। আজকের যুগে সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। আমাকেও মেনে নিতে হল !'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন, আর সেই সঙ্গে অন্যজনও, যাঁর নাম এখনও জানা হয়নি।

'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম,' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী, 'কিছু মনে করবেন না।'

'মোটেই না,' বলল ফেলুদা, 'শুধু একটা কথা জানার ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলের বন্ধুটি কি এখন এখানে ?'

'না। তবে কোথায় তা বলতে পারব না। ভয়ানক শক পেয়েছিল হিমুর মৃত্যুতে। তাকে বললাম, কপালের লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি ! সে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। আমার বাড়িতেই ছিল। দিন আষ্টেক হল একদিন দেখি কোথায় যেন চলে গেছে। অবিশ্যি ফিরে সে আসবেই। কারণ তার কিছু জিনিসপত্র এখনও রয়ে গেছে আমার বাড়িতে। দশ বছর এক ইস্কুলে, এক

boiRboi.net

কলেজে পড়েছে দু' জনে।'

'তার নামটা ?'

'অনীক বলে ডাকি। অনীকেন্দ্র সোম।'

৫

আধঘন্টার মধ্যে স্নান সেরে নিয়ে তিনজনে একতলায় গেলাম হোটেলেরই নিরভানা রেস্টোর‍্যান্টে লাঞ্চ খেতে। কাঠমাণ্ডুতে আসার এত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনা একটা বিরাট ধাপ এগিয়ে গেছে ভাবতে মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব এসে গেছে, আর সেই সঙ্গে খিদেটাও পেয়েছে জবর। কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোম খুন, নেপালে বাঙালি হেলিকপটার পাইলটের মৃত্যু, মিঃ বাটরার ডুপলিকেট—এ সবই যে এক-সঙ্গে জট-পাকানো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মিঃ সোম কি চেয়েছিলেন ফেলুদা ওঁর বন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপারেই তদন্ত করুক ? ইনজেকশনে ভেজাল ছিল বলেই কি হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ? কিন্তু এ ব্যাপারে ফেলুদা আর কত দূর কী করতে পারে ?

আমরা দুজনে মোটামুটি চেনাশোনা খাবার অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু লালমোহনবাবু হঠাৎ কেন যেন মেনু দেখে ওয়েটারকে জিগ্যেস করে বসলেন, 'হোয়াট ইজ মোমো ?'

'ইটস মিট বলস ইন সস, স্যার,' বলল ওয়েটার।

'তরল পদার্থে ভাসমান মাংসপিণ্ড,' বলল ফেলুদা। 'তিব্বতের খাবার। শুনেছি, মন্দ লাগে না খেতে। ওটা খেলে আপনি কলকাতায় গিয়ে বলতে পারেন যে দালাই লামা যা খান, আপনিও তাই খেয়ে এসেছেন।'

'দেন ওয়ান মোমো ফর মি, ইফ ইউ প্লিজ।'

এ ছাড়া অবিশ্যি ভাত আর ফিশ কারি অর্ডার দিয়েছেন ভদ্রলোক। বললেন, 'মোমোটা ফর একসপিরিয়েন্স।'

একটা হালকা সবুজ রংয়ের কার্ড হাতে নিয়েই রেস্টোর‍্যান্ডে ঢুকেছিলেন লালমোহনবাবু, এবার সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললেন, 'এইটে যে ধরিয়ে দিল হাতে হোটেলের কাউন্টারে, এর মানেটা কিছু বুঝলেন ? আমি তো মশাই হেড অর টেল কিছুই বুঝছি না। ক্যাসিনো কথাটা চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ব্ল্যাকজ্যাক, পনটুন, রুলেট, জ্যাকপট—এগুলো কী ? আর বলছে এই কার্ডের ভ্যালু নাকি পাঁচ ডলার। তার মানে তো চল্লিশ টাকা। ব্যাপারটা কী বলুন তো।

আমিই লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা আরও গুছিয়ে বলতে পারবে বলে ওর ওপর ছেড়ে দিলাম।

'এখানে একটা বিখ্যাত হোটেল আছে,' বলল ফেলুদা। 'নানা রকম জুয়া খেলার ব্যবস্থা আছে সেখানে। জ্যাকপট, পনটুন, কিনো—এ সবই এক-এক রকম জুয়ার নাম। আর খেলার জায়গাটাকে বলে ক্যাসিনো। আমাদের দেশে এ ধরনের পাবলিক গ্যাম্বলিং নিষিদ্ধ, তাই ক্যাসিনো জিনিসটা পাবেন না। এই কার্ডটা নিয়ে ক্যাসিনোতে গিয়ে আপনি পাঁচ ডলার পর্যন্ত জুয়া খেলতে পারেন, নিজের পকেট থেকে পয়সা না দিয়ে।'

'লেগে পড়ব নাকি, তপেশ ?'

'আমার আপত্তি নেই।'

'নাকের সামনে মূলোর টোপ ঝোলালে গাধা কি আর না খেয়ে পারে ?'

'খেলার শেষে নিজেকে গর্দভ গর্দভ মনে হতে পারে, সেটা কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্ছি,' বলল ফেলুদা। 'অবিশ্যি জ্যাকপটে এক টাকা দিয়ে হাতলের এক টানে পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছে, এমনও শোনা যায়।'

ঠিক হল একদিন সন্ধেবেলা গিয়ে দেখে আসা যাবে ক্যাসিনো ব্যাপারটা। হোটেল থেকেই বার-তিনেক বাস যায় সেখানে, তার জন্য আলাদা পয়সা লাগে না।

মোমো খেয়ে লালমোহনবাবু বললেন যে, এর পাকপ্রণালীটা জেনে নেওয়া দরকার। ওঁর রান্নার লোক বসন্ত নাকি খুব এক্সপার্ট—'উইকে একদিন করে মোমো খেতে পারলে মশাই ছ' মাসের মধ্যে চেহারায় একটা ধ্যানী ভাব এসে যাবে। রাস্তায়

বেরোলে পাড়ার ছোঁড়াগুলো যে মাঝে মাঝে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসে, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

মনে মনে বললাম যে লালমোহনবাবু যখন মাঝে মাঝে ধ্যানী ভাব আনার চেষ্টা করেন, তখনই ওঁকে দেখে সবচেয়ে বেশি হাসি পায়।

তবে কাঠমাণ্ডুতে কেউ হাসবে না সেটা ঠিকই।

দুপুরে খাওয়ার পর নিউ রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে মনে হল, দেশী-বিদেশী এত জাতের লোক—নেপালী তিব্বতী পাঞ্জাবী সিন্ধী মারোয়াড়ি, জার্মান সুইডিশ ইংলিশ আমেরিকান ফ্রেঞ্চ—আর এত রকম ঘর বাড়ি দালান দোকান মন্দির হোটেলের এ রকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

ফেলুদা বলল আমরা যেখানে যাচ্ছি—দরবার স্কোয়ার—যেটাকে বলা চলে কাঠমাণ্ডুর নার্ভ-সেন্টার, যেমন কলকাতার চৌরঙ্গি ধর্মতলার মোড়—সেইখানেই নাকি এখানকার পুলিস ঘাঁটি। ওকে একবার সেখানে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ চারপাশটা ঘুরে দেখব। আধঘন্টা পরে একটা বাছাই করা জায়গায় আমরা আবার মিট করব।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই একটা চৌমাথা পড়ে, তার পর থেকে নিউ রোডের নাম হয়ে গেছে গঙ্গা-পথ। তার পর খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে। এটা হল বসন্তপুর স্কোয়ার। ডাইনে পুরনো রাজার প্যালেস। সেটা ছাড়িয়ে ডাইনে ঘুরতেই বুঝে গেলাম দরবার স্কোয়ারে এসে গেছি, আর এমন একটা বিচিত্র জায়গা আমরা এর আগে কখনও দেখিনি।

লালমোহনবাবু বার তিনেক 'এ কোথায় এলাম মশাই' বলাতে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে বলল, 'আপনার প্রশ্নের যে উত্তরটা এক কথায় হয়, যেটা আপনি ম্যাপ খুলেই পেতে পারেন, সেটা আপনি নিশ্চয়ই চাচ্ছেন না। আর অন্য যে উত্তর, সেটা সোজা গদ্যে বলার জিনিস নয়। আপাতত আপনাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি—চোখ-কান সজাগ রেখে মনপ্রাণ ভরে দেখে নিন। প্রাচীন

boiRboi.net

শহরের এমন চেহারা আপনি ভারতবর্ষের কোথাও পাবেন না। এক পেতে পারেন কাশীর দশাশ্বমেধে, কিন্তু তার মেজাজ একেবারে আলাদা।'

সত্যিই, যে দিকে চাই সে দিকেই চমক। দাবা খেলা কিছুক্ষণ চলার পর যেমন ছকের উপর রাজা মন্ত্রী বড়ে গজ নৌকো সব ছড়িয়ে বসে থাকে, তেমনই কোনও খামখেয়ালি দানব যেন এই সব ঘর বাড়ি প্রাসাদ মন্দির মূর্তি স্তম্ভ ছড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ আর যানবাহন। কাশীর কথা যে মনে পড়ে না তা নয়, কিন্তু কাশীর আসল মন্দিরগুলো সব গলির মধ্যে হওয়াতে সেগুলো আর দূর থেকে দেখার কোনও উপায় থাকে না। এখানে কিন্তু তা নয়। রাস্তা দিব্যি চওড়া। পুরোনো প্যালেসের বারান্দায় এসে রাজা দর্শন দিতেন বলে অনেকখানি খোলা জায়গা রাখা আছে।

'ম্যাপ অনুযায়ী একটু এগিয়েই কালভৈরবের মূর্তি,' বলল ফেলুদা। 'ওই মূর্তির সামনে আধঘন্টা পরে তোদের মিট করছি।'

ফেলুদা পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

নেপালের কাঠের কাজ প্রসিদ্ধ সেটা আগেই শুনেছিলাম, সেটা যে কেন, এখানে এসে বুঝতে পারলাম। পুরোনো বাড়িগুলোর জানালা দরজা বারান্দা, ছাত, সবই কাঠের তৈরি, আর তার কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়। এখানকার মন্দিরগুলোও কাঠের, আর তেমন মন্দির আর-কোথাও দেখিনি। এমনিতে ভারতবর্ষের ধাঁচের হিন্দু মন্দিরও আছে, কিন্তু আসল হল যেগুলোকে গাইড বুকে বলে প্যাগোডা। দো-চালা, তিন-চালা, চার-চালা মন্দির, চওড়া থেকে ধাপে ধাপে ক্রমে সরু হয়ে উপর দিকে উঠেছে।

তবে দরবার স্কোয়ার শুধু ধর্মস্থান নয়, বাজারও বটে। রাস্তায় ফুটপাথে সিঁড়িতে বারান্দায়—সব জায়গায় জিনিস ফেরি হচ্ছে। শাকসবজি ফলমূল থেকে ঘটি-বাটি জামা কাপড় অবধি। এখানকার নেপালীরা যে টুপি ব্যবহার করে, তার মধ্যে বেশ বাহার আছে। এক জায়গায় সেই টুপি বিক্রি হচ্ছে দেখে দুজনে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে জটায়ুর মন এখন

কাঠমাণ্ডুর বাজারে চলে এসেছে, সেটা বুঝতে পারলাম ভদ্রলোককে তাঁর লাল ডায়রিটা বার করতে দেখে।

টুপির শেপ সবই এক, কিন্তু নকশা প্রত্যেকটাতে আলাদা। আমি নিজে একটা বাছাই করে দর করছি, এমন সময় পিছন থেকে চাপা গলা পেলাম জটায়ুর।

'তপেশ!'

নামটা কানে আসতেই ঘুরে দেখি ভদ্রলোক কী যেন দেখে তটস্থ হয়ে গেছেন।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাইনে মুখে ঘোরাতেই দেখলাম—

হাত পঁচিশেক দূরে দাঁড়িয়ে বাটরা বা নকল বাটরা আমাদের দিকে পাশ করে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ডান দিকে একটা গলি লক্ষ করে।

'তোমার দাদাকে বাঁ হাতে লাইটার ধরাতে দেখেছ কখনও?'

'না।'

'ইনি ধরালেন।'

'দেখেছি। আর বাঁ পকেটে রাখলেন লাইটারটা।'

'ফলো করবে?'

'আপনাকে দেখেছে লোকটা?'

'মনে তো হয় না।'

রোখ চেপে গেল। ফেলুদার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আরও বিশ মিনিট দেরি।

দুজনে এগিয়ে গেলাম।

সামনে একটা মন্দিরের চার পাশে ভিড়। লোকটা হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে।

মন্দিরটা পেরোতেই আবার দেখতে পেলাম তাকে। সে এবার গলিটার মধ্যে ঢুকেছে। প্রায় বিশ হাত তফাত রেখে আমরা তাকে অনুসরণ করে চললাম।

গলিটার দু' দিকে দোকান, ছোট ছোট হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট। 'পাই শপ' কথাটা অনেক রেস্টোরান্টের গায়েই লেখা রয়েছে। 'কলকাতায় পাইস হোটেল ছিল এক-কালে বলে জানি,' চাপা গলায়

boiRboi.net

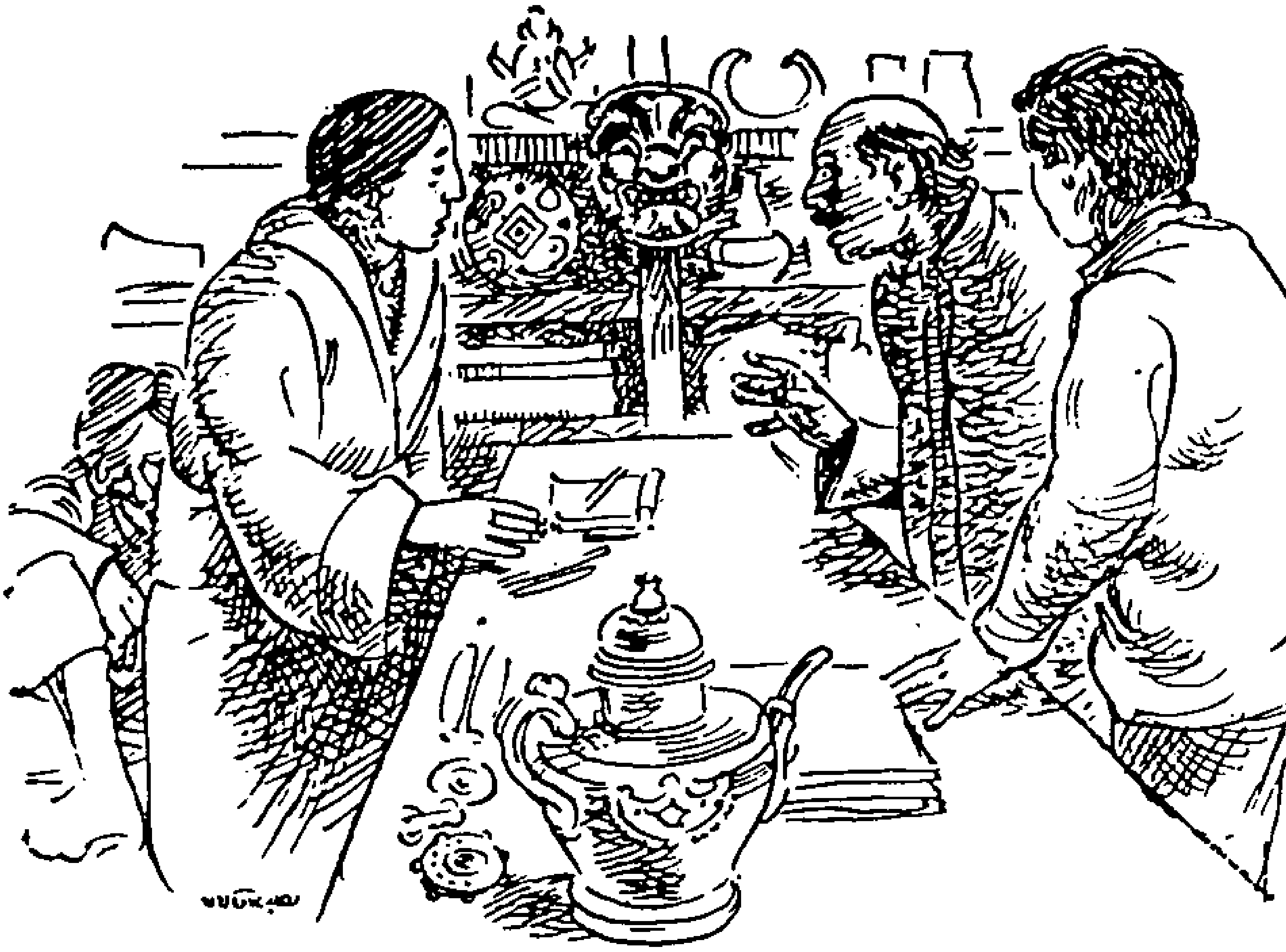

মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু, 'পাই শপ তো কখনও শুনিনি।'

আমি বললাম, 'এ পাই টাকা-আনা-পাই না ; পাই এক রকম বিলিতি খাবার।'

একদল হিপি আসছে। গলিতে পাঁচমিশালি গন্ধ, তার বেশির ভাগটাই খাবারের। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা নতুন গন্ধ যোগ হল যখন হিপির দলটা আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাঁজা, ঘাম আর অনেক দিনের না-ধোয়া জামা-কাপড়ের গন্ধ।

'এই রে !'

কথাটা লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, কারণ লোকটা ডাইনে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কী করব এবার ? লোকটা আবার বেরোবে নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করব ? যদি দেরি করে ? হাতে আর পনের মিনিট সময়। বললাম, 'চলুন যাই গিয়ে ঢুকি দোকানে। সে তো আমাদের চেনে না, ভয়টা কিসের ?'

'ঠিক বলেছ।'

তিব্বতি হ্যান্ডিক্র্যাফটের দোকান। মাঝারি দোকান, দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা কাউন্টার। তার পাশে ফাঁক দিয়ে দোকানের

পিছন দিকে যাওয়া যায়। পিছনে দরজা, তারও পিছনে একটা অন্ধকার ঘর।

সেই ঘরেই হয়তো গিয়ে থাকবেন নকল বাটরা, কারণ আমার কোনও যাবার জায়গা নেই।

'ইয়েস ?'

কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো তিব্বতি মহিলা হাসিমুখে আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন। তার পিছনে একটি মাঝবয়সী তিব্বতি পুরুষ, গালে অসংখ্য বলিরেখা, একটা চোখ একটু ছোট, বেঞ্চিতে বসে আছে ঝিম ভাব নিয়ে।

আমরা দোকানে ঢুকে পড়েছি, তাই মহিলার প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলা দরকার। কিছু দেখতে চাইতে হবে, যেন কিনতে চাই এমন ভাব করে। জিনিসের অভাব নেই দোকানে—মুখোশ, তংখা, জপযন্ত্র, তামার ঘটিবাটি, ফুলদানী, মূর্তি।

'আই লাইক মোমো,' হঠাৎ কী কারণে যেন বলে বসলেন লালমোহনবাবু।

'মোমো ইউ গেট ইন টিবেটান রেস্টোরান্ট, নট হিয়ার।'

ইংরিজিটা মোটামুটি ভালোই বলেন মহিলা।

'নো নো নো,' বললেন লালমোহনবাবু, 'মানে, আই ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো।'

মহিলার ভুরু বিশেষ না থাকলেও, যেটুকু আছে সেটুকু উপর দিকে উঠে গেছে।

'ইউ লাইক মোমো, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো ?'

'নো নো—মানে, নট নাউ। ইন হোটেল আই এট মোমো। নাউ আই ওয়ন্ট টু, মানে, নো হাউ—মানে...'

এর কোনও শেষ নেই, অথচ ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর পিঠে হাত দিয়ে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ডু ইউ হ্যাভ এ টিবেটান কুক-বুক ?'

আমি জানতাম এ জিনিসটা দোকানে থাকবে না। মহিলাও মাথা নেড়ে 'স্যরি' বলে বুঝিয়ে দিলেন নেই।

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে বেরিয়ে এলাম দুজনে। হাতে মিনিট আষ্টেক সময়। নকল-বাটরা-উধাও রহস্যটাকে হজম করে যে পথে গিয়েছিলাম, সে পথে ফিরে এসে একজন লোকের কাছ থেকে দুটো নেপালি ক্যাপ কিনে সেগুলো মাথায় চাপিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই দেখি, পৌঁছে গেছি কালভৈরবের মূর্তির সামনে।

বাপ্‌রে কী ভয়াবহ মূর্তি! দিনের বেলা দেখেই গা শিউরে ওঠে, আর রাত্তিরে যখন লোক থাকে না তখন দেখলে না জানি কী হবে। এর কাছেই কোথায় যেন আবার একটা শ্বেতভৈরবের মূর্তি আছে, সেটাও এক সময় এসে দেখে যেতে হবে।

ফেলুদা এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। থানার ফটক মূর্তির ঠিক সামনেই।

আমরা দুজনেই নকল বাটরার ঘটনাটা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ফেলুদার কী বলার আছে সেটা জানা দরকার, সে যে কেন থানায় গিয়েছিল সেটাই জানি না। বলল, 'দিব্যি লোক ও সি মিঃ রাজগুরুং। বললেন নেপাল সরকার যদি ভারত সরকারের অনুরোধ রাখতে রাজি হয়, তা হলে মিঃ সোমের আততায়ীকে ধরার ব্যাপারে এরা সব রকম সাহায্য করবেন।'

'দ্যাট ম্যান ইজ হিয়ার, ফেলুবাবু!' আর চাপতে না পেরে বলে ফেললেন জটায়ু।

আমি ব্যাপারটা আর-একটু খুলে বললাম।

'তুই ঠিক দেখেছিস বাঁ হাতে লাইটার ধরাল?'

'আমরা দুজনেই দেখেছি!' বললেন জটায়ু।

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা। 'মিঃ বাটরাকে কাল খবরটা দিতে হবে। ইয়ে, তোরা বরং বাজার-টাজার একটু ঘুরে দেখ, আমার হোটেলে গিয়ে দু'-একটা ফোন করার আছে।'

বুঝলাম কাঠমাণ্ডুতে এসে সাইট-সিইং ব্যাপরটা খুব বেশি হবে না ফেলুদার।

৬

আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েই যে চৌমাথার কথা বলেছিলাম, সেটা দিয়ে ডাইনে ঘুরলে পড়ে শুক্র পথ। এই শুক্র পথ দিয়ে কিছু দূর গেলেই এখানকার সুপার মার্কেট। একটা বেশ বড় ছাতওয়ালা চত্বরের চার দিক ঘিরে দোকানের সারি। কোনটা যে কিসের দোকান বোঝা মুশকিল, কারণ প্রায় সবকটাতেই সব কিছুই পাওয়া যায়। জামাকাপড় ঘড়ি ক্যামেরা রেকর্ডার রেডিও ক্যালকুলেটার কলম পেনসিল টফি চকোলেট—কী না নেই, আর সবই অবশ্য বিদেশী জিনিস।

'ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ভাই তপেশ', একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন লালমোহনবাবু।

'কেন ?'

'এ সব দোকান কি আর আমাদের জন্যে ? এখানে আসবে জন ডি রকফেলার, কি বোম্বাইয়ের ফিল্ম স্টার !'

শেষ পর্যন্ত আর লোভ সামলাতে না পেরে পৌনে দু মিটার জাপানী টেরিউলের ট্রাউজারের কাপড় কিনে ফেললেন লালমোহনবাবু। 'এই গেরুয়া টাইপের রংটা লামাদের দেশে মানাবে ভালো, কি বল তপেশ ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল লামাদের দেশটা আসলে হল তিব্বত, নেপালের শতকরা আশি ভাগ লোকই হিন্দু।

ট্রাউজারস আগামী কাল বিকেলে চারটেয় রেডি থাকবে, ট্রায়াল লাগবে না। লোকে দু' দিনের জন্য এসেও কোট-প্যান্ট করিয়ে নিয়ে যায় কাঠমাণ্ডু থেকে, আর তার ফিটিংও হয় নাকি দিব্যি ভাল।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, ফেলুদা তার খাটে বসে নোটবুকটা খুলে কী যেন লিখছে। বলল, 'বোস। ডাক্তারকে কল দিয়েছি।'

ডাক্তার ? ডাক্তার আবার কেন ? শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ফেলুদার ?

আমরা দুজনে সোফায় বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলাম রহস্য

উদ্ঘাটনের অপেক্ষায়।

ফেলুদা আরও দু' মিনিট সময় নিল। তার পর খাতাটাকে পাশে সরিয়ে রেখে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'হরিনাথ চক্রবর্তী মশাইয়ের ছেলেকে যে ইনজেকশন দিয়েছিল, সেই ডঃ দিবাকরকে একটা কল দিয়েছি। ধর্ম পথে স্টার ডিসপেনসারিতে বসেন। তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। কিছু পয়সা খসবে, ভিজিট নেবে, তা সে আর কী করা যায়!'

'আমাদের এই তদন্তে ওষুধপত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে হচ্ছে!' লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা তার কথাগুলোর ওপর বেশ জোর দিয়ে বলল, 'শুধু ভূমিকা নয়, আমার ধারণা প্রধান ভূমিকা।'

'সেই যে সার্জিক্যাল অ্যাসিডের কথা অনীকেন্দ্র সোমের নোটবুকে লেখা ছিল, সেটা কি—'

'সার্জিক্যাল নয়, লাইসার্জিক অ্যাসিড। এল এস ডি। অবিশ্যি—'

ফেলুদা আবার খাতাটা হাতে তুলে নিয়েছে, তার কপালে ভাঁজ।

'এল এস ডি অক্ষরগুলোর আর-একটা মানে হতে পারে। সেটা এই কিছুক্ষণ হল খেয়াল হয়েছে। এল এস ডি—লাইফ সেভিং ড্রাগস, অর্থাৎ যে ড্রাগ বা ওষুধের উপর মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে। যেমন টিট্যানাস-রোধক ইনজেকশন। বা পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টি বি-র ওষুধ, হার্টের ওষুধ। আমার তো মনে হচ্ছে—'

boiRboi.net

ফেলুদা আবার খাতাটার দিকে দেখল। তারপর বলল—

A-B-র বিষয় জানা দরকার—কথাটাও এই সব ওষুধের বিষয়েই বলা হয়েছে। এ বি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকস। মিঃ সোম বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—এই সব ড্রাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে চাচ্ছিলেন। রিং আপ পি সি এম, ডি ডি সি—পি সি এম তো প্রদোষচন্দ্র মিত্র, আর ডি ডি সি নির্ঘাৎ আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেকটোরেট অফ ড্রাগ কন্ট্রোলকে দিয়ে টেস্ট করাতে

চেয়েছিল। আশ্চর্য। লোকটা যে রকম মেথডিক্যালি এগোচ্ছিল, তাতে তো মনে হয় ও ইচ্ছে করলে আই আই টি-র প্রোফেসরি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরিতে নেমে পড়তে পারত।'

'আর C P নিয়ে যে ব্যাপারটা ছিল ?'

'ওটা সহজ। সি পি হল ক্যালকাটা পুলিস। আস্‌ক সি পি অ্যাবাউট মেথডস্ অ্যান্ড কেসেস—অর্থাৎ পুলিসকে জিগ্যেস করতে হবে কত রকম ভাবে ওষুধ জাল হয়, আর আগে এ রকম জালের কেস কী কী ধরা পড়েছে।'

'তা হলে তো খাতায় যা লেখা ছিল, তার সবই—'

কলিং বেল।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখলে বেশ হকচকিয়ে যেতে হয়, কারণ এত ফিটফাট ডাক্তার এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স ষাটের মধ্যে, বিলিতি পোশাকটা নিশ্চয়ই কাঠমাণ্ডুর সেরা টেলারের তৈরি, চশমার সোনার ফ্রেমটা বিলিতি, হাতের সোনার ঘড়িটা নিশ্চয়ই পেশেন্টের কাছ থেকে পাওয়া।

ফেলুদা খাটে ছিল বলে ভদ্রলোক অনুমান করে নিলেন সেই রুগী। আমি খাটের পাশে একটা চেয়ার দিয়ে দিলাম। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন খাটেই বসল।

'কী ব্যাপার ?'

ভদ্রলোক বাংলা বলবেন আশা করিনি, কারণ 'দিবাকর' পদবিটা হয়তো বাংলা নয়। তার পর মনে হল এখানকার অনেকেই তো কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেছে। ইনিও নির্ঘাৎ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা।

'এই নিন।'

ফেলুদা বালিশের তলা থেকে একটা খাম বার করে ভদ্রলোককে দিল। ডাক্তার কিঞ্চিৎ হতভম্ব।

'এটা—'

'ওটা আপনার ফি। আর এইটে আমার কার্ড।'

কার্ড মানে ফেলুদার ভিজিটিং কার্ড, যাতে নামের তলায় ওর

boiRboi.net

পেশাটা লেখা আছে।

ভদ্রলোক কার্ডটার দিকে দেখতে দেখতে চেয়ারে বসলেন।

'আমি জানি, আপনার কাছে ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু কয়েকটা কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

ডাক্তারের ভাব দেখে বুঝলাম, তিনি সত্যিই এখনও অন্ধকারে রয়েছেন।

ফেলুদা বলল, প্রথমেই বলি দিই, আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। খুনটা হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু আমার ধারণা খুনী এখানে রয়েছে। আমি সেই ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি। আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।'

খুন শুনেই ভদ্রলোকের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। বললেন, 'কে খুন হয়েছে?'

'সেটা পরে বলছি,' বলল ফেলুদা, 'আগে একটা জিনিস একটু ভেরিফাই করে নিই—হরিনাথ চক্রবর্তীর ছেলেকে তো আপনি অ্যান্টি-টিট্যানাস ইনজেকশন দেন?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'ইনজেকশনটা বোধ করি আপনার স্টক থেকেই এসেছিল?'

'হ্যাঁ। আমার ডিসপেনসারির স্টক।'

'কিন্তু তাতে কাজ দেয়নি!'

'তা দেয়নি, কিন্তু তার জন্য আমাকে রেসপনসি—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডঃ দিবাকর। দায়িত্বের প্রশ্ন এখনও আসছে না। ইনজেকশন দিয়েও লোকে টিট্যানাসে মরেছে এমন ঘটনা নতুন নয়। সাধারণ লোক সেটা মেনেই নেয়। হরিনাথবাবুও তাঁর ছেলের মৃত্যু মেনেই নিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার হয়ে, হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যুর কী কারণ, সে সম্বন্ধে হয়তো আপনার কোনও মতামত থাকতে পারে।'

'কারণ একটা নয়,' বললেন ডঃ দিবাকর, 'প্রথমত সে নিজেই জানত না তার ইনজুরি কখন হয়েছে। তার বন্ধু বলেছে পনের-ষোল ঘন্টা আগে। সেটা যদি ষোল না হয়ে ছাব্বিশ হয়,

দেন দ্য ইনজেকশন মাইট হ্যাভ বিন টু লেট। দ্বিতীয়ত, সে ছেলে আগে কোনও কালে প্রিভেনটিভ নিয়েছে কিনা সেটারও কোনও ঠিক নেই। নেওয়া থাকলে ইনজেকশনে কাজ দেবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। ছেলে বলছে মনে নেই, বাবা বলছে নিয়েছে। হরিনাথবাবুর কথা, খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। ওঁর স্ত্রী আর ছেলে মারা যাবার পর থেকে আমি দেখেছি, ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে মেমরি ফেল করে।'

ফেলুদা বলল, 'হিমাদ্রির মৃত্যুর পর ওর বন্ধু কি আপনার ডিসপেনসারি থেকে কোনও ইনজেকশনের অ্যামপুল নেয় ?'

'নিয়েছিল।'

'অ্যান্টি-টিট্যানাস ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা আপনি জানলেন কী করে ? সে কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল ?'

'দেখা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না। সে আমার চেম্বারে ঢুকে এসে আমায় জানিয়ে দিয়ে যায় যে, আমিই তার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আর সেটা যে সে খুব নরম ভাবে জানিয়েছিল, তা নয়।'

'এই বন্ধুটিই খুন হয়েছে।'

'মানে ?'

'হিমাদ্রি চক্রবর্তীর বন্ধু। অনীকেন্দ্র সোম।'

ডঃ দিবাকর অবাক হয়ে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলে চলল—

'সে আপনার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাবে বলে। সম্ভবত সে-কাজটা তার করা হয়ে ওঠেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইনজেকশনে ভেজাল ছিল। সে চেয়েছিল যে আমার সাহায্য নিয়ে এই জাল ওষুধের চোরা কারবারটা একবার তলিয়ে দেখবে।'

'আমার ডিসপেনসারি থেকে কোনও জাল ওষুধ বেরোয়নি,' দৃঢ় স্বরে বললেন ডঃ দিবাকর।

boirboi.net

'আপনি কি ওষুধ খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে ইনজেকশন দেন ?'

ভদ্রলোক রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'হাউ ইজ দ্যাট পসিবল ? এমারজেন্সি কেস, তখন আমি ওষুধ পরীক্ষা করব, না ইনজেকশন দেব ?'

'আপনার ডিসপেনসারির ওষুধ আসে কোত্থেকে ?'

'হোলসেলারদের কাছে থেকে। তাতে ব্যাচ নাম্বার থাকে, এক্সপায়ারি ডেট থাকে—'

'সে সবই যে জাল করা যায়, সেটা আপনি জানেন ? ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে চোরা কারবারিদের, সেটা জানেন ? নাম-করা বিলিতি কম্পানির লেবেল পর্যন্ত ছাপাখানার ব্যাকডোর দিয়ে চলে যায় এই সব জালিয়াতদের হাতে, সেটা আপনি জানেন ?'

ডঃ দিবাকরকে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে, তিনি এ কথার যুৎসই উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

'শুনুন ডঃ দিবাকর,' ফেলুদা এবার একটু নরম সুরে বলল, 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, ঘুণাক্ষরে কেউ ব্যাপারটা জানবে না। আপনি স্টক থেকে একটা অ্যান্টি-টিট্যানাসের অ্যামপুল নিয়ে তার ভেতরের পদার্থটি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে তার রিপোর্ট আমাকে দিন। সময় বেশি নেই, সেটা বুঝতেই পারছেন।'

ডঃ দিবাকর ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। 'কাল একটা জরুরি কেস আছে,'—দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন ভদ্রলোক—'কাল সম্ভব না হলে পরশু জানাব।'

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ; এবং আপনাকে এভাবে উত্যক্ত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

আমরা যে একটা সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আর, যতই নতুন নতুন ব্যাপার শুনছি, ততই অনীকেন্দ্র সোম লোকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এমন একজন লোকের এভাবে খুন হওয়াটা যে ফেলুদা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক। কুকরিটার জন্য দু' নম্বর বাটরাকেই খুনি বলে মনে হয় ; কিন্তু তা না হয়ে যদি অন্য

কেউও হয়, ফেলুদা তাকে সায়েস্তা না করে ছাড়বে না।

ফেলুদা আগেই বলে রেখেছিল যে খাবার পরে আমাদের নিয়ে একবার ঘুরতে বেরোবে, তবে সেটা কী উদ্দেশ্যে সেটা আন্দাজ করতে পারিনি। দরবার স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি দেখে মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, আর সেটা যে ঠিক, সেটা বুঝতে পারলাম যখন পুরনো প্যালেসের সামনে খোলা জায়গাটায় এসে ফেলুদা বলল, 'এবার বল কোন গলিটায় গিয়েছিলি দুপুরে।'

রাত্তিরে দরবার স্কোয়ারের চেহারা একেবারে অন্যরকম। এখান থেকে ওখান থেকে মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, এরই মধ্যে কোত্থেকে যেন হিন্দি ফিল্মের গান ভেসে আসছে। টুরিস্টদের ভিড় আর সাইকেল-রিকশার ভিড় কাটিয়ে আমরা গলিটার মুখে গিয়ে পড়লাম। 'এটার নাম আগে ছিল মারু টোল', বলল ফেলুদা, 'হিপিরা এর নতুন নাম দিয়েছে পিগ অ্যালি—শুয়োর গলি।'

পাই শপগুলোর পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের সেই তিব্বতি দোকানটার দিকে।

দোকানটা এখনও খোলা রয়েছে। দু' একজন খদ্দেরও রয়েছে কাউন্টারের এদিকে, আর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সকালের সেই মহিলা। সেই পুরুষটি নেই।

ফেলুদা দোকানের বাইরে থেকেই ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দোতলা বাড়ির এক তলায় দোকানটা। দোতলায় রাস্তার দিকে দুটো পাশাপাশি জানলা, দুটোই বন্ধ। কাঠের পাল্লাগুলোর একটার ফাটলের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতর একটা ক্ষীণ আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দোকানের ডান পাশে একটা সরু চিলতে গলির পরেই একটা তিনতলা হোটেল, নাম 'হেভেনস্ গেট লজ'। স্বর্গদ্বার বলতে চোখের সামনে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য নেই।

ফেলুদা হোটেলটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, পিছনে আমরা দুজন।

'হাউ মাচ ডু ইউ চার্জ ফর রুমস হিয়ার?'

কাউন্টারে একটা রোগামতন লোক বসে একটা ছোট্ট পকেট

ক্যালকুলেটরের উপর পেনসিলের ডগা দিয়ে টোকা মেরে মেরে হিসেব করে একটা খাতায় লিখছে। লোকটা নেপালি কি ভারতীয় সেটা বোঝা গেল না। ফেলুদা তাকে প্রশ্নটা করেছে।

'সিঙ্গল টেন, ডাব্‌ল ফিফটিন।'

কাউন্টারের সামনে খোলা জায়গাটার এক পাশে একটা খালি সোফা, তার উপরে দেওয়ালে তিনটে পাশাপাশি ট্যুরিস্ট পোস্টার, তিনটেতেই হিমালয়ের কোনও না কোনও বিখ্যাত শৃঙ্গের ছবি।

'ঘর খালি আছে?' ফেলুদা ইংরেজিতে জিগ্যেস করল।

'ক'টা চাই?'

'একটা সিঙ্গল একটা ডাবল। দোতলার পুব দিকে হলে ভাল হয়। অবিশ্যি নেবার আগে একবার দেখে নেওয়া দরকার।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক যাকে বলে স্বল্পভাষী। মুখে কিচ্ছু না বলে শুধু একটা বেল টিপলেন, তার ফলে একটি নেপালি বেয়ারার আবির্ভাব হল। ভদ্রলোক তার হাতে একটা চাবি দিয়ে আমাদের দিকে একবার শুধু দেখিয়ে দিয়ে, আবার হিসেব করতে লেগে গেলেন।

বেয়ারার পিছন পিছন সিঁড়ি উঠে আমরা সোজা চলে গেলাম পুবমুখো একটা প্যাসেজ দিয়ে। ডাইনের শেষ ঘরটা চাবি দিয়ে খুলে দিল বেয়ারা।

ঘরের বর্ণনা দেবার কোনও মানে হয় না, কারণ ফেলুদা যে ঘর ভাড়া করতে আসেনি, সেটা খুব ভাল করেই জানি।

যেটা বলা দরকার সেটা এই যে, ঘরটার পুব দেয়ালে একটা জানালা রয়েছে, যেটা দিয়ে তিব্বতি দোকানের দোতলার একটা জানালা এক পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে।

লালমোহনবাবু যতক্ষণ খাটের গদি-টদি টিপে, বাথরুমের বাতি জ্বালিয়ে ভিতরটা দেখে, টেবিলের দেরাজ খোলা কিনা দেখে, আমরা যে সত্যিই ঘর নিতে এসেছি—এমন একটা ধারণা বেয়ারার মনে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন, ততক্ষণে আমি আর ফেলুদা যা দেখার দেখে নিলাম।

দোকানে দুপুরে যে তিব্বতি লোকটাকে দেখেছিলাম, সে বসে

আছে ওই টিমটিমে বাতি-জ্বালা ঘরটার ভেতর। তার কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে। তবে বেশ বোঝা যায়, সে কোনও একটা কাজে ব্যস্ত। তার পিছনে কার্ড বোর্ডের প্যাকিং কেসের স্তূপ দেখে মনে হল, সে হয় বাক্স থেকে জিনিস বার করছে, নাহয় বাক্সের মধ্যে পুরছে।

আর-একজন লোক রয়েছে ঘরের ভেতর, তবে তার ছায়াটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সে যে ঘাড় নিচু করে তিব্বতিটার কাজ দেখছে, সেটা বোঝা যায়।

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল।

ছায়াটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেছে।

সিগারেট মুখে গোঁজার পর আর-একটা জিনিস বার করল পকেট চাপড়িয়ে।

লাইটার।

এবার লাইটারটা জ্বালানো হল।

বাঁ হাতে।

৭

'তোরা দুজন দেখবার জায়গাগুলোর কিছু কিছু আজ সকালেই দেখে নে,' পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় বলল ফেলুদা।—'আমার আর-একবার থানায় যাওয়া দরকার। ট্রান্সপোর্ট তো সান ট্র্যাভেলস্ থেকে পেয়ে যাবি। আর কিছু না হোক, স্বয়ম্ভু, পশুপতিনাথ ও পাটনটা ঘুরে আয়। এক দিনের পক্ষে এই তিনটেই যথেষ্ট।'

রেস্টোর‍্যান্ট থেকে বেরিয়ে সামনেই দেখি মিঃ বাটরা। একেই বলে টেলিপ্যাথি।

ভদ্রলোক হাসিমুখে তিন জনকেই 'গুড মর্নিং' জানালেন বটে, কিন্তু সে হাসি টিকল না।

'দ্যাট ম্যান ইজ ব্যাক হিয়ার,' গম্ভীরভাবে বললেন মিঃ বাটরা। 'কাল বিকেলে নিউ রোডেরই এক জুয়েলারি শপ থেকে ওকে

বেরোতে দেখেছে আমাদের আপিসের এক ছোকরা।'

'সে ছোকরা কি ভেবেছিল, আপনি হঠাৎ পোখরা থেকে ফিরে এসেছেন?'

বাটরা একটু হেসে বলল, 'সেখানে একটা সুবিধে আছে। আমার যমজ ভাইটি একটু উগ্র রং-এর জামাকাপড় পছন্দ করে। কাল পরেছিল একটা শকিং পিংক পুলোভার আর একটা সবুজ শার্ট। আমাকে যারা চেনে, তারা কখনও ওকে দেখে আমি বলে ভুল করবে না। যাই হোক, আমি আজ শুনেই পুলিশে জানিয়েছি ব্যাপারটা। এক সাব-ইনস্‌পেকটর আছে, তাকে আমি ভাল করে চিনি।'

'তিনি কী বললেন?'

'যা বলল, তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিত বোধ করছি। বলল, পুলিশ এ লোক সম্বন্ধে জানে। ওদের সন্দেহ লোকটা কোনও স্মাগলিং র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত। তবে, কোনও পাওয়ারফুল, ধনী লোক ওর পিছনে থাকায় পুলিশ ওকে বাগে আনতে পারছে না। তা ছাড়া লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বেচাল চালছে, ততক্ষণ পুলিশের ওঁত পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

'কিন্তু আপনার নিজের যে অসুবিধে হচ্ছে, সেটা বললেন না? কুকরিটা কিন্তু সে আপনার নামেই কিনেছিল।'

বাটরা বললেন, 'আপনার কথাটা মনে করেই ওদের জিগ্যেস করলাম যে, লোকটা তার ক্রাইমের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে পারে কিনা। তাতে ওই সাব-ইনস্‌পেকটর হেসেই ফেলল। বলল, মিঃ বাটরা, ডোন্ট থিংক দ্য নেপাল পোলিস আর সো স্টুপিড।'

'যাক, তা হলে আপনি এখন খানিকটা হালকা বলুন।'

'মাচ রিলিভ্‌ড, মিঃ বাটরা। আমি বলি কি, আপনারাও একটু রিল্যাক্স করুন। প্রথম বার কাঠমাণ্ডুতে এসে স্রেফ একটা ক্রিমিন্যালের পিছনে ঘুরে বেড়াবেন, সেটা কি ভাল হবে? আপনি একটা দিন ফ্রি রাখুন। এই জন্যে বলছি কি, আমাদের কোম্পানি একটা নতুন ফরেস্ট বাংলো করেছে রাপ্তি ভ্যালিতে, ইন দ্য

তেরাইজ। এ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল স্পট। আপনি বিকেলে বলবেন, আমি পরদিন সকালে আপনার ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জ করে দেব। চাই কি, আমি ফ্রি থাকলে আপনাদের সঙ্গে চলেই আসব। কী বলেন ?'

তেরাই শুনেই আমার মনটা নেচে উঠেছে। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক। তবু ভাল যে ফেলুদা কথা না দিলেও ব্যাপারটা বাতিল করে দিল না।

'আপনি শূকর-সরণির ঘটনাটা চেপে গেলেন কেন ?' ভদ্রলোক চলে যাবার পর জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'তার কারণ,' বলল ফেলুদা, 'তদন্তের সব কথা সব্বাইয়ের কাছে ফাঁস করে দেওয়াটা আপনার গোয়েন্দা-হিরো প্রখর রুদ্রের অভ্যাস হলেও, প্রদোষ মিত্রের নয়। বিশেষ করে যে ব্যক্তির সঙ্গে সর্বসাকুল্যে আড়াই ঘন্টার আলাপ, তার কাছে তো নয়ই।'

'বুঝলাম,' বললেন জটায়ু। 'জানলাম। শিখলাম।'

সকালের আর একটা ঘটনা হল—যে-বাঙালি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাল এসেই আলাপ হল, যাঁর নাম আজ জানলাম বিপুল ভৌমিক—তাঁর সঙ্গে দেখা হল মিঃ বাটরাকে বিদায় দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়।

'এটা কী চিনতে পারছেন ?' ভনিতা না করেই হাতের একটা বোতল ফেলুদার দিকে তুলে ধরে প্রশ্নটা করলেন ভদ্রলোক। বোতল আমার চেনা, বিশেষ করে তার ভিতরের লাল রঙের ওষুধটার জন্য। কাশির ওষুধ, আমাদের বাড়িতে সব সময়ই থাকে। বেন্যাড্রিল একস্‌পেকটোর‍্যান্ট।

'চিনতে তো পারছি,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু রঙটা তো—'

'আপনি রঙে তফাত পাচ্ছেন ? সেটা বোধ হয় আপনাদের বিশেষ ক্ষমতা। আমি পাচ্ছি গন্ধে।'

ভদ্রলোক ক্যাপ খুলে বোতলটা ফেলুদার নাকের সামনে ধরলেন।

'আপনার ঘ্রাণশক্তি তো খুবই প্রখর,' বেশ তারিফের সঙ্গে বলল ফেলুদা।—'তফাত আছে, তবে খুবই সূক্ষ্ম।'

'অন্তত একটি ইন্দ্রিয় তো জোরদার হওয়া চাই,' বললেন বিপুলবাবু, 'আপনি চারমিনার খেয়েছেন না একটু আগে ? আমি দেখিনি খেতে, কিন্তু গন্ধ পাচ্ছি। কেমন, ঠিক তো ?'

'ঠিক তো বটেই। কিন্তু আপনি বোতল নিয়ে চললেন কোথায় ?'

'ফেরত দোব। পয়সা ফেরত নোব,' বললেন বিপুলবাবু, 'ছাড়ব না। একি ইয়ার্কি পেয়েছে ?'

'কোন্ দোকান ?'

'আইডিয়াল মেডিক্যাল স্টোর্স, ইন্দ্র চক। আপনাকে বললাম না সে দিন, ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেতাই কারবার হচ্ছে ? মিল্ক পাউডারে খড়ি মিশিয়ে দেয়, জানেন ? শিশুদের পর্যন্ত বাঁচতে দেবে না এরা।'

মিঃ বাটরাকে গাড়ির কথা বলে দিয়েছিলাম, সাড়ে নটায় একটা জাপানী টয়োটা এসে হাজির। আমরা যখন বেরোচ্ছি, তখন ফেলুদা টেলিফোন ডিরেকটরি নিয়ে পড়েছে। বলল এ অঞ্চলের ওষুধের দোকানগুলোর নাম নোট করে নিচ্ছে।

•

একই শহরে স্বয়ম্ভুনাথের মতো বৌদ্ধস্তূপ আর পশুপতিনাথের মতো হিন্দু মন্দির—এ এক কাঠমাণ্ডুতেই সম্ভব। পশুপতিতে 'তপেশ, তুমি দৃশ্য দেখো' বলে আমাকে ফেলে রেখে মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়ে ফোঁটা-টোটা কেটে এলেন লালমোহনবাবু। মন্দিরটা কাঠের তৈরি, দরজাগুলো রূপোর আর চুড়োটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই যেটা সামনে পড়ে, সেটা হল পাথরের বেদিতে বসানো সোনায় মোড়া বিশাল নন্দীর মূর্তি। চাতাল দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখা যায়—নিচ দিয়ে বাগমতী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানেই শ্মশান। নদীর ও পারে পাহাড়।

স্বয়ম্ভুতে যেতে হলে গাড়ি প্যাঁচালো পাহাড়ি পথ দিয়ে উপরে উঠে একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। বাকি পথ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি, সিঁড়ির মুখ অবধি রাস্তার ধারে তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। লালমোহনবাবুর হঠাৎ শখ হয়েছে

একটা জপযন্ত্র কিনবেন। জিনিসটা আর কিছুই না—একটা লাঠির মাথায় একটা কৌটো, তার পাশ থেকে ঝুলছে একটা চেনের ডগায় একটা বলের মতো জিনিস। লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘোরালে মাথার বল সমেত কৌটোটা ঘুরতে থাকে। ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'লিখতে লিখতে যখন আইডিয়ার অভাবে থেমে যাই, বুঝলে তপেশ, তখন অনেক সময় মনে হয়েছে হাতে একটা কিছু নিয়ে ঘোরাতে পারলে হয়তো মাথাটা খুলে যেত। দেখে মনে হচ্ছে জপযন্ত্র ইজ আইডিয়াল ফর দ্যাট।'

চার রকমের হয় জিনিসটা—কাঠের, তামার, রূপোর আর হাতির দাঁতের। কাঠের হলেই চলত, কিন্তু এখানে টুরিস্টদের জন্য সব জিনিসের দাম চড়িয়ে রেখেছে এরা ; কাঠও সত্তর টাকার কমে হবে না শুনে ভদ্রলোক আর এগোলেন না।

দু' হাজার বছর আগে পাহাড়ের চুড়োয় বসানো বৌদ্ধস্তূপ স্বয়ম্ভুনাথে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মনে থাকে, সেটা হল স্তূপের চুড়োর ঠিক নিচে চারকোনা স্তম্ভের চার দিকে আঁকা ঢেউ খেলানো ভুরুওয়ালা জোড়া জোড়া চোখ—যে চোখ মনে হয় সেই আদ্যিকাল থেকেই সারা কাঠমাণ্ডু উপত্যকার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে আসছে, কোথায় কী ঘটেছে সব জানে, কিন্তু কোনওদিন বলবে না।

স্তূপটা যে সমতল চাতালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেমন গিজগিজ করছে দেখবার জিনিসে, তেমনই করছে মানুষ আর বাঁদরের ভিড়ে। লালমোহনবাবু একবার কোমরে একটা খোঁচা খেয়ে বললেন, বাঁদরের খোঁচা, কিন্তু সেটা যে আসলে তা নয়, সেটা পরে জেনেছিলাম। সেটার কথা, যাকে বলে, যথাস্থানে বলব।

আসল ঘটনা ঘটল পাটনে।

পাটন শহর, যার প্রাচীন নাম ললিতপুর, হল বাগমতীর ও-পারে, কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র তিন মাইল। শহরে ঢোকবার মুখে একটা পেল্লায় তোরণ, সেটা পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে আমেরিকান কোকা-কোলা খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানকার দরবার স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলুদা এবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল—'আমাদের কাঠমাণ্ডু অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে যখন লিখবি, তখন খেয়াল রাখিস যে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দা কাহিনী যেন নেপালের টুরিস্ট গাইড না হয়ে পড়ে।'

ফেলুদার কথা মনে রেখে শুধু এইটুকুই বলছি যে, দেড় হাজার বছর আগে লিচ্ছবি বংশের রাজা বরদেবের পত্তন করা পাটন বা ললিতপুরের মন্দির, স্তূপ, প্রাসাদ, কাঠের কারুকার্য, স্বর্ণস্তম্ভের মাথায় রাজার মূর্তি ইত্যাদির এ-বলে-আমায়-দেখ ও-বলে-আমায়-দেখ অবস্থার মধ্যে পড়ে লালমোহনবাবু অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অতুলনীয়, অননুকরণীয়, অবিস্মরণীয় ইত্যাদি ছাব্বিশ রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন গড়ে তিন মিনিটে একটা করে। আমার বিশ্বাস সেই সময় সেই বিশেষ ঘটনাটা না ঘটলে তিনি আরও মিনিট পনের এই ভাবে চালিয়ে যেতে পারতেন।

ঘটনাটা ঘটল দরবার স্কোয়ার পেরিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে একটা বাজারে পড়বার পর। এই বাজার যে মঙ্গল বাজার নামে বিখ্যাত, সেটা পরে জেনেছিলাম। এখানে চার দিকে ছোট ছোট দোকানে নেপালি আর তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুর চেয়ে দাম কম, আর ভিড় কম বলে দেখার বেশি সুবিধে।

আমরা জিনিস দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। লালমোহনবাবুর দৃষ্টি জপযন্ত্রের দিকে, ফেলুদা বলে দিয়েছে পাটনের কাঠের কাজ পৃথিবী-বিখ্যাত, তাই দাম স্বয়ম্ভুর চেয়ে অনেক কম হলেও 'হাই ক্লাস কারুকার্য নয়' বলে অনেকগুলোই হাতে নিয়েও বাতিল করে দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলাম, বাজারের শেষ দিকে একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে একটা বেশ বড় পুরনো বাড়ির নিচে একটা দোকানের সামনে টেম্পোতে মাল তোলা হচ্ছে।

দোকানের কাছে গিয়ে দেখি, লালমোহনবাবু যা চাইছেন সেই জিনিসই বাক্স-বোঝাই হয়ে চালান যাচ্ছে, সম্ভবত কাঠমাণ্ডুর বাজারে।

'এইখেনেই বোধহয় তৈরি হচ্ছে জিনিসগুলো, বুঝলে তপেশ।

দেখে একেবারে টাট্‌কা বলে মনে হয়। এটা বোধ হয় একটা ফ্যাকটরি।'

সেটাও অসম্ভব না। ফেলুদা বলেছিল, পাটনে নাকি অনেক কারিগর এইসব পুরনো কালের জিনিস নতুন করে তৈরি করছে।

'সুবিধের দরে পাওয়া যেতে পারে। জিগ্যেস করব?'

'করুন না।'

সে গুড়ে বালি। দোকানদার বলল অন্য দোকানে দেখো, আমাদের স্টক ফুরিয়ে গেছে। যা মাল চালান যাচ্ছে সব অর্ডারের মাল।

'যাচ্চলে, লাক্‌-টাই—'

লালমোহনবাবুর কথা আটকে গেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি চলে গেছে পাশের গলিটায়।

একটা লোক গলির ডান দিক থেকে বাঁয়ে আসছে। তিব্বতি। একে আমরা চিনি। সেই হলদে টুপি, সেই লাল জোব্বা, সেই একটা চোখ বড়, একটা ছোট।

এ সেই শুয়োর গলির তিব্বতি দোকানের বেঞ্চিতে বসা আধঘুমো লোকটা। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা যে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তারই একটা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

ঢুকেছে কি? আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে দরজাটা দৃষ্টির বাইরে। সেটা দেখতে পাওয়া যাবে চার পা সামনে গিয়ে বাঁয়ের গলিটায় ঢুকে এগিয়ে গেলে।

আবার সেই ফলো করার রোখ চেপেছে আমাদের দুজনের একসঙ্গে।

লোকটা কোথায় গেল দেখা দরকার।

গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাবটা যথা সম্ভব চেপে রেখে দুজনে এগিয়ে গেলাম গলিটা দিয়ে।

হাত-বিশেক যেতেই বাঁয়ে একটা দরজা পড়ল, যার পাল্লা আর ফ্রেমে কাঠের কাজ দেখলে তাক্‌ লেগে যায়।

দরজাটা বন্ধ।

বাড়িটার এ দিকের দেওয়ালে এই একটাই দরজা।

boiRboi.net

এই দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে লোকটা।

আরও দশ-পা গিয়ে বাড়িটা শেষ হয়েছে ; তার পাশ দিয়ে একটা গলি বাঁয়ে চলে গেছে। একটা ছড়-টানা বাজনার শব্দ আসছে। মনে হল গলিটা থেকেই।

এগিয়ে গেলাম গলিটার মুখ অবধি। এ দিকটা একেবারে নির্জন।

গলির ডাইনে, আমাদের থেকে দশ-বারো হাত দূরে, একটা ভিখিরি একটা বাড়ির রোয়াকে বসে সারিন্দা বাজাচ্ছে। লোকটা নেপালি, কারণ সারিন্দা নেপালের যন্ত্র, তিব্বতের নয়। অবিশ্যি এই রকমই যন্ত্র একই নামে পূর্ববঙ্গেও পাওয়া যায়।

যতটা সম্ভব টুরিস্টের ভাব করে এগিয়ে গেলাম গলি ধরে। লোকটার সামনে একটা মরচে-ধরা টিনের কৌটো। যেখানে বসেছে, তার উল্টো দিকে একটা দরজা। এটা সেই একই বাড়ির দরজা, যার সামনের দিকে দোকান থেকে জপযন্ত্র চালান যাচ্ছে কাঠমাণ্ডু। এই বাড়িতেই ঢুকেছে শুয়োর গলির সেই তিব্বতি।

ভিখিরি এক মনে বাজিয়ে চলেছে তার নেপালি গৎ, আমাদের সম্বন্ধে তার কোনও কৌতূহল নেই।

লালমোহনবাবু টিনের কৌটোটায় কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'যাবে নাকি ভেতরে ?'

এ দরজাটা খোলা। এটা সাইজেও ছোট আর এটার বাহারও কম, কারণ এটা হল ব্যাকডোর, যাকে বলে খিড়কি।

'চলুন।'

'যদি জিগ্যেস করে তো কী বলবে ?'

'বলব টুরিস্ট, ভেতরে কী আছে দেখতে এসেছি।'

'চলো।'

ভিখিরিটার দিকে একটা আড়দৃষ্টি দিয়ে, গলিতে আর কোনও লোক নেই দেখে—আমরা দুজনে মাথা হেঁট করে দরজাটা দিয়ে ভেতরের প্যাসেজে ঢুকলাম।

প্যাসেজটা পেরিয়ে ডাইনে একটা উঠোনের এক চিলতে দেখা যাচ্ছে। তারও ডাইনে নিশ্চয়ই ঘর আছে। সেই ঘরের দিক

থেকেই শব্দটা আসছে।

যান্ত্রিক শব্দ।

না, ঠিক যান্ত্রিক না। যদি বা একটা মেশিন গোছের কিছু চলে, তার সঙ্গে আরও কয়েকটা শব্দ মিশে আছে। মোটামুটি বলা যায় যে, শব্দটার মধ্যে একটা তাল আছে।

আমরা দম বন্ধ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম।

বাঁয়ে একটা দরজার পিছনে অন্ধকার ঘর।

একটা পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ডান দিক থেকে আসছে সেটা। শব্দটা বাড়ছে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে, এর মধ্যে কখন যেন সারিন্দার সুর পালটে গেছে। আগেরটা ছিল করুণ, মোলায়েম ; এটা নাচানি, হালকা সুর।

এবারে যে লোকটা আসছে, তাকে দেখা যাবে।

গলা শুকিয়ে গেছে।

বুঝলাম লোকটা যদি কিছু জিগ্যেস করে তো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না।

আর চিন্তা না করে এক ঝটকায় লালমোহনবাবুকে টেনে নিয়ে দুজনে ঢুকে পড়লাম বাঁ পাশের অন্ধকার ঘরটায়। রাস্তার দিকের একটা খুপরি জানালা দিয়ে ঘরে সামান্য আলো আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটা খাটিয়া, একটা তামার পাত্র, দড়িতে ঝোলানো কিছু জামা-কাপড়।

আমরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম, পায়ের শব্দটা বাইরে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তার দিকে চলে গেল।

সারিন্দা থেমেছে। তার বদলে গলার আওয়াজ পেলাম। লোকটা বাইরে গিয়ে ভিখিরিটার সঙ্গে কথা বলছে।

আমাদের ডাইনে আর একটা দরজার পরে আর একটা ঘর। এটাও অন্ধকার।

জটায়ুর আস্তিন ধরে টেনে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম।

কাঠ ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে বোঝাই ঘরটা। তা ছাড়া আছে কিছু তামার জিনিস, কিছু মূর্তি, গোটা কুড়ি-পঁচিশ কাঠের ছাঁচ। বাঁয়ে

ঘরের কোণায় পড়ে আছে লালমোহনবাবুর শখের জিনিস—তিনটে কাঠের জপযন্ত্র।

আমরা ঢুকেই বাঁয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, এ ঘরের বাইরেই বারান্দা পেরিয়ে উঠোন, আর উঠোনের ও দিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছিল।

এখন শব্দ নেই।

এবার একটা নতুন শব্দ।

লোকটা বাইরে থেকে ফিরে এসেছে।

সে খুঁজছে আমাদের।

প্যাসেজ ধরে পায়ের শব্দ এগিয়ে গিয়ে কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এল। যে ঘরে আছি, সে ঘরের ডাইনের দেওয়ালে উঠোনের দিকে পর পর তিনটে দরজা। দরজার বাইরে থেকে আসা আলো তিনবার বাধা পেল সেটা দেখতে পেলাম।

এবারে আমাদের ঠিক পাশের দরজার সামনে এসে পায়ের শব্দটা থামল।

একটা আবছা ছায়া ঢুকে এল ঘরের ভিতরে চৌকাঠ পেরিয়ে।

আমার দম বন্ধ। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে তৈরি হচ্ছি। যা করবার আমাকেই করতে হবে।

লোকটা আর দু' পা এগোতেই আমাদের দেখতে পেল।

ওর প্রথম হকচকানিটা কাটবার আগেই আমি ডাইভ দিয়ে পড়লাম লোকটার উপর। হাত দুটো সমেত কোমর জাপটে ধরে ঘুরিয়ে দেয়াল-ঠাসা করব।

কিন্তু লোকটা ষণ্ডা। এক ঝটকায় হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কোটের ল্যাপেল দুটো দু' হাতের মুঠোয় ধরে এক হ্যাঁচকায় মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল আমায়। বোধ হয় ইচ্ছে ছিল ছুঁড়ে ফেলবে, কিন্তু লালমোহনবাবু সে ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছেন। আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে লোকটার হাত দুটোকে আমার কোট থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু পারলেন না।

লোকটার কনুইয়ের ধাক্কা লালমোহনবাবুকে ছিটকে ফেলে দিল

boiRboi.net

কার্ডবোর্ডের বাক্সের স্তূপের ওপর।

আমার দু' হাতের তেলো লোকটার থুতনির তলায় রেখে উপর দিকে চাড় দিয়ে মাথাটাকে চিতিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমি এখনও শূন্যে, এখনও লোকটা আমাকে ধরে—।

ঠকাং!

হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। আমার পায়ের তলায় আবার মাটি। লোকটা দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

মাথায় বাড়ি।

জপযন্ত্রের বাড়ি।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দুজনে আবার রাস্তায়, জপযন্ত্র লালমোহনবাবুর থলিতে।

৮

কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বসে আমি আর ফেলুদা অনেক সময় আমাদের পুরনো অ্যাডভেঞ্চারগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে, যাদের শয়তানি বুদ্ধি ফেলুদাকেও মাঝে মাঝে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল। লখ্‌নউ-এর বনবিহারী সরকার, কৈলাসের মূর্তি চোর, সোনার কেল্লার বর্মন আর মন্দার বোস, মিঃ গোরে, কাশীর মগনলাল মেঘরাজ—এরা সব কোথায়? কী করছে? ভোল পালটে সৎপথে চলছে, না শয়তানির মওকা খুঁজছে? নাকি অলরেডি আরম্ভ করে দিয়েছে শয়তানি?

এসবগুলো এত দিন শুধু প্রশ্নই ছিল; শেষে কাঠমাণ্ডুতে এসে এই পুরনো আলাপীদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে নেগেটিভ-পজিটিভের ঠোকাঠুকিতে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে, সেটা কে জানত?

পাটন থেকে ফিরে ইন্দিরা রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খেয়ে (এদের মেনুতে মোমো ছিল না) প্রায় তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে দেখি, ফেলুদা খাটে শুয়ে সদ্য-কেনা একটা ইংরিজি বই পড়ছে, নাম 'ব্ল্যাক

মার্কেট মেডিসিন'। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই চোখ কপালে উঠে গেল।

'ব্যাপার কী ? খুব ধকল গেছে বলে মনে হচ্ছে ?'

দুজনে ভাগাভাগি করে পাটনের পুরো ঘটনাটা বললাম। জানতাম, ফাঁকে ফাঁকে অনেক প্রশ্ন গুঁজে দেবে ফেলুদা। বেশ বুঝতে পারছি, আমরা দুজনে মিলে আজ একটা জবরদস্ত কাজ করে এসেছি। কেন—তা ঠিক বলতে পারব না, সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন জালিয়াতির একটা গন্ধ ছড়িয়ে ছিল। অথচ বাইরে থেকে দেখলে প্রাচীন পাটনের ইমারতি আর কাঠের কাজের তারিফ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

সব শুনে-টুনে ফেলুদা 'সাবাস' বলে আমাদের দুজনেরই পিঠ চাপড়ে দিল।

'গোয়েন্দাগিরিতে বীরচক্র থাকলে আমি তোদের দুজনেরই নাম রেকমেন্ড করতাম। কিন্তু আপনি যে জিনিসটা দিয়ে বাজিমাত করলেন, সেটা একবার দেখান!'

লালমোহনবাবু হালকা মেজাজে থলি থেকে জপযন্ত্রটা তুলে ধরে দেখালেন।

'ওর মধ্যে মন্ত্র পোরা আছে কিনা সেটা দেখেছেন ?'

'আজ্ঞে ?'

'ওম্ মণি পদ্মে হুম্।'

আজ্ঞে ?'

'ওম্—মণি—পদ্মে—হুম্। তিব্বতি মহামন্ত্র। এই মন্ত্রটা একটা কাগজে হাজার বার লিখে অথবা ছেপে প্রত্যেকটা জপযন্ত্রে পুরে দেবার কথা।'

'পুরে দেবে ? কোথায় পুরে দেবে ?'

'ওই ওপরের জিনিসটা তো একটা কৌটো। ওটার মাথাটা তো ঢাকনার মতো খুলে যাবার কথা।'

'তাই বুঝি ?'

লালমোহনবাবু একটা মোচড় দিতেই মাথাটা খুলে এল।

'উঁহু—নো সাইন অফ মন্ত্র।'

amarboi.net

'ভেতরে কিচ্ছু নেই ?'

লালমোহনবাবু আর একবার ভেতরটা দেখলেন আলোর কাছে এনে।

'নাথিং।—না না, দেয়ার ইজ সামথিং। কিসের যেন গুঁড়ো চক্‌চক্ করছে।'

'কই দেখি !'

এবার ফেলুদা ভাল করে দেখল ভেতরটা। তার পর ল্যাম্পের পাশে বেডসাইড টেবিলের উপর উপুড় করে ধরল কৌটোটা।

'কাঁচ। কাঁচের টুকরো।'

'একটা বড় টুকরো রয়েছে, ফেলুদা।'

'দেখেছি।'

'মনে হয় একটা ছোট্ট পাইপ জাতীয় কিছুর অংশ।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'পাইপ নয়। অ্যামপুল। অসাবধানে ভেঙে ফেলাতে এই পুরো জিনিসটাকে বাতিল করে দিয়েছে।'

'তার মানে বলছেন, এই জপযন্ত্রের মধ্যে জাল ওষুধ চালান হত ?'

'কিছুই আশ্চর্য না। জপযন্ত্রের ভিতর পুরে প্যাকিং কেসে করে জমা হত পিগ অ্যালির তিব্বতি দোকানের দোতলায়। সেখান থেকে নিশ্চয়ই চলে যেত হোলসেলারদের কাছে। তার পর সেখান থেকে দাওয়াখানায়। যে বাক্সগুলো কাল ওই হোটেলের ঘর থেকে দেখেছিলি, আর আজ টেম্পোতে যে বাক্সগুলো তুলছিল—সে কি একই রকম ?'

'আইডেনটিক্যাল,' উত্তর দিলেন জটায়ু।

'বুঝেছি'—ফেলুদার কপালে ত্রিশূলের মত দাগ—'সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা তদ্বির করছে নকল বাটরা। আর ব্যাপারটা যদি বড় স্কেলে হয়, তা হলে হয়তো বেশ কিছু মাল চলে যাচ্ছে সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষে। বিহার, ইউ পি-র ছোট ছোট শহরে কত লোক এই ভেজাল ওষুধ খায়, আর ভেজাল ইনজেকশন ব্যবহার করে, তার হিসেব কে রাখছে ? ডাক্তারের সন্দেহ হলেও সে যে

boiRboi.net

সোরগোল তুলবে না, সে তো দেখাই গেল। এই যুগটাই যে ওই রকম। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!'

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ বেশ তেজের সঙ্গে পায়চারি করে নিল। লালমোহনবাবু আবার জপযন্ত্রে ঢাকনা পরিয়ে সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে অনেক সময়ই তিনি কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন ; আজ তিনি যাকে বলে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

ঘড়িতে দেখি পৌনে চারটে। আমি লালমোহনবাবুকে মনে করিয়ে দিলাম যে, এতক্ষণে তাঁর প্যান্ট রেডি হয়ে থাকার কথা।

'এইদ্দ্যাখো! ভুলেই গেস্‌লাম।'

ভদ্রলোক এক লাফে সোফা থেকে উঠে পড়লেন। 'আজ ক্যাসিনো যাচ্ছি তো আমরা? ট্রাউজারটা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই করানো।'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা তালি মেরে মন থেকে যেন সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে বলল, 'গুড আইডিয়া। আজকে উই ডিজার্ভ এ হলিডে। ডিনারের পরে এক ঘন্টা ক্যাসিনোয় যাপন।'

অবিশ্যি ক্যাসিনো-পর্ব এক ঘণ্টায় শেষ হয়নি। কেন হয়নি সেটা জানতে হলে আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাসিনো খোলা থাকে নাকি ভোর চারটে অবধি, আর আসল ভিড়টা হয় এগারোটার পর থেকে। এখন গেলে খানিকটা খালি পাওয়া যাবে।

হোটেলটা শহর থেকে খানিকটা বাইরে। বাসে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমরা লোকালয় ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি, কারণ রাস্তার আলো ছাড়া আর বিশেষ আলো চোখে পড়ছে না।

মিনিট পনের চলার পর খানিকটা চড়াই উঠে একটা গেট পড়ল। তার পর ডাইনে বেশ বড় একটা লন ও সুইমিং পুল পেরিয়ে আবার ডাইনে ঘুরে বাসটা গিয়ে থামল হোটেলের পোর্টিকোর ঠিক আগে একেবারে ক্যাসিনোর প্রবেশদ্বারের সামনে।

boiRboi.net

পেল্লায় হোটেলের এক পাশটায় এই ক্যাসিনো। বুঝলাম যারা বাইরে থেকে আসবে, তাদের আর আসল হোটেলে ঢুকতেই হবে না।

আমাদের আজকের হিরো—অন্তত এখন পর্যন্ত—হলেন লালমোহনবাবু। বিদেশী ফিল্মে দেখা আদব-কায়দার কোনটাই বাদ দেবেন না এমন একটা সংকল্প নিয়েই যেন তিনি ক্যাসিনোতে এসেছেন। অবিশ্যি এ সব আদব-কায়দা যে তিনি সব সময় ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন, তা নয়। যেমন, সুইং ডোর দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে কাউনটারের পিছনে যে দুটি বো-টাই পরা ভদ্রলোক বসেছিলেন—যাদের কাছে হোটেল থেকে পাওয়া পাঁচ ডলারের কার্ডটা দেখিয়ে তবে ক্যাসিনোয় ঢুকতে হয়—তাদের দিকে চেয়ে রীতিমতো গলা তুলে 'হেল্‌লো' বলাটা ঠিক বিলিতি কেতার মধ্যে বোধ হয় পড়ে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কাঠমাণ্ডুর টেলার ভদ্রলোকের প্যান্ট বেশ ভালই বানিয়েছে। তার সঙ্গে নিউ মার্কেটে কেনা হাল্‌কা সবুজ জার্কিন আর মাথায় নেপালি ক্যাপ—সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটা স্মার্টনেসের ভাব এসেছে সেটা স্বীকার করতেই হবে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে তবে আসল ক্যাসিনো। এক জাপানী ভদ্রমহিলা উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা ভরতে ভরতে, আর লালমোহনবাবুর দৃষ্টি হাতের কার্ডের দিকে; ফলে দুজনের মধ্যে একটা কোলিশন লাগত, যদি না আমি ভদ্রলোকের জার্কিনের আস্তিনটা ধরে ঠিক সময়ে একটা টান দিতাম। লালমোহনবাবু মহিলার দিকে চেয়ে যেভাবে হেসে "হেহেকসখিউজ মিহিহি' বললেন, সেটার দামও লাখ টাকা।

অবিশ্যি যতই কনফিডেনস্‌-এর ভাব করুন না কেন, খোদ ক্যাসিনোয় ঢুকে চারিদিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভদ্রলোককে ফেলুদার শরণাপন্ন হতেই হল। ফেলুদাও তৈরি ছিল ওঁকে উদ্ধার করার জন্য।

'হাতের কার্ডটায় দেখুন পাঁচ রকম খেলার জন্য পাঁচটা কুপন রয়েছে। আপনার দ্বারা জ্যাকপট ছাড়া আর কিছু খেলা চলবে না।

অন্যগুলোর তল পাবেন না। আপনি জ্যাকপটের কুপনটি ছিঁড়ে ওই কাউন্টারে দিন। ওটা হল ক্যাসিনোর ব্যাঙ্ক। আপনাকে এক ডলারের হিসেবে যত টাকা হয় দিয়ে দেবে। বোধ হয় এগারো টাকার মতো হবে—নেপালি টাকা। তাতে আপনি এগারোটা চান্স পাবেন জ্যাকপটে। তাতে যদি কিছু মূলধন হয়, তা হলে আরও খেলতে পারবেন। যদি টাকাগুলো যায়, তবে আরও খেলতে হলে ট্যাক থেকে দিতে হবে। কখন থামবেন, সেটা সম্পূর্ণ আপনার মর্জি। বেশি হারলে কী হয় তার একটা বড় নজির তো রয়েইছে—যুধিষ্ঠির।'

একটা বড় হল-ঘর আর তার ডান দিকে একটা মাঝারি ঘর মিলিয়ে ক্যাসিনো। বড়টায় পনটুন, ব্ল্যাকজ্যাক, ফ্লাশ আর আসল খেলা রুলেট ছাড়াও কিছু জ্যাকপটের মেশিন রয়েছে, আর ছোটটায় রয়েছে কিনো আর জ্যাকপট। ফেলুদা দেখলাম, রুলেটের দিকে এগিয়ে গেল: আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডাইনের ঘরে। আমরা দুজনেই কুপন ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে নিয়েছি।

তিন দিকের দেয়ালের সামনে পর পর দাঁড়িয়ে আছে বারো-চোদ্দটা জ্যাকপট মেশিন।

'ব্যাপারটা খুব সোজা,' একটা মেশিনের সামনে নিয়ে গিয়ে বললাম লালমোহনবাবুকে, 'এই দেখুন স্লট। ওয়েইং মেশিনের মতো করে এর মধ্যে টাকা গুঁজে দেবেন। তার পর এই ডাইনের হাতল ধরে টান। তার পর যা হবার আপনিই হবে।'

'মানে?'

'জিত হলে মেশিন থেকে টাকা বেরিয়ে এই পাত্রটায় পড়বে, যেমন ওজনে কার্ড পড়ে। হার হলে কিছুই বেরুবে না।'

'হুঁ...'

'আপনি একবার ফেলে দেখুন।'

'দেখব?'

'হ্যাঁ। গুঁজুন টাকা।'

'গুঁজলাম।'

একটা ঘড়ঘড় শব্দের পর বোঝা গেল টাকাটা একটা জায়গায়

গিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের গায়ে এক লাইন লেখা জ্বলে উঠল—'কয়েন অ্যাক্সেপটেড।'

'এবার হাতল টানুন। জোরে।'

লালমোহনবাবু মারলেন টান।

মেশিনের সামনে একটা চৌকো কাঁচের জানালার পিছনে পাশাপাশি তিনটে তিন-রকম ছবি ছিল—হল্‌দে ফল, লাল ফল, ঘন্টা। হাতলে টান দিতেই মেশিনের ভিতর থেকে একটা ঘড়ঘড় করে ঘোরার শব্দ শুরু হল, আর চোখের সামনে কাঁচের পিছনের ছবিগুলো বদলাতে বদলাতে সেকেন্ড পাঁচেক পরে ঘট ঘট ঘট শব্দে একটা নতুন কম্বিনেশনে এসে দাঁড়াল। হল্‌দে ফল, হল্‌দে ফল, নীল ফুল।

আর তার পরমুহূর্তেই ঝনাৎ ঝনাৎ করে দুটো টাকা এসে পড়ল পাত্রের মধ্যে।

'জিতলুম নাকি?' চোখ গোল গোল করে জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'জিতলেন বইকি। একে দুই। সে-রকম ভাগ্য হলে একে একশোও হতে পারে। এই দেখুন চার্ট। কোন্ কম্বিনেশনে কত লাভ হবে এটা দেখালেই বুঝতে পারবেন। ঠিক হ্যায়?'

'ঔক্কে!'

আমি দুটো মেশিন পরে আমার মেশিনে চলে গেলাম। আরও সাত-আটটা মেশিনের সামনে দেশি-বিদেশি মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে খেলে যাচ্ছে। ঘরের এক পাশে কাউন্টারে একজন লোক বসে আছে, তার কাছে চাইলেই একটা প্লাসটিকের বাটি পাওয়া যায় টাকা রাখার জন্য। আমি দুটো চেয়ে নিয়ে একটা লালমোহনবাবুকে দিয়ে এলাম।

এমন জমাটি ব্যাপার যে, খেলার সময় অন্য কোনো দিকে চাওয়া যায় না, অন্য কিছু ভাবা যায় না, মনে হয় বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই জ্যাকপট। তাও একবার বাঁদিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম লালমোহনবাবু বাটিতে করে বেশ কিছু টাকা কাউন্টারে নিয়ে গিয়ে সেগুলোর বদলে নোট নিয়ে এলেন।

আমারও জিতই হচ্ছিল, রোখও চেপে গিয়েছিল, এমমন সময় ফেলুদা পাশের ঘর থেকে এসে হাজির, সঙ্গে একজন বছর পঁচিশেকের মহিলা।

'আপাতত কিছুক্ষণের বিরতি,' বলল ফেলুদা।

'হোয়াই স্যার?'

বুঝলাম লালমোহনবাবুর মোটেই ভালো লাগল না ফেলুদার প্রস্তাবটা।

'চারশো তেত্রিশ থেকে ডাক এসেছে।'

'মানে?'

ভদ্রমহিলাই বুঝিয়ে দিলেন পরিষ্কার বাংলায়।

'ফোর থার্টিথ্রীতে আপনাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'হু ইজ দিস ফ্রেন্ড?'

লালমোহনবাবু এখনো পুরো ক্যাসিনোর মেজাজে রয়েছেন।

'নাম বললেন না, তবে বললেন আপনারা তিনজনেই খুব ভালো করে চেনেন?'

'চলুন চট্ করে দেখাটা সেরে আসি,' বলল ফেলুদা, 'কৌতূহলও হচ্ছে, তা ছাড়া মিনিট দশেকের বেশি থাকার তো কোনো প্রয়োজন নেই।'

অগত্যা খেলা থামিয়ে রওনা দিলাম এই অজানা বন্ধুর উদ্দেশে। ভদ্রমহিলা লিফ্‌টের মুখ অবধি এসে নমস্কার করে চলে গেলেন।

চার তলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে কার্পেট মোড়া প্যাসেজ ধরে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ডানদিকে ৪৩৩ নম্বর ঘর। ফেলুদাই বেল টিপল।

'কাম ইন।'

দরজাটা লক্ করা ছিল না; ঠেলতেই খুলে গেল। ফেলুদাকে সামনে নিয়ে ঢুকলাম আমরা।

বিশাল বৈঠকখানায় একটা মাত্র ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা সোফায় যিনি বসে আছেন, তার ঠিক পিছনেই

boiRboi.net

ল্যাম্পটা জ্বলছে বলে ভদ্রলোকের মুখ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল ঘরে আরো লোক, কারণ কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন দেখলাম ভদ্রলোকের উল্টো দিকে একটা টেলিভিশনের পাশে আরেকটা যন্ত্র। রঙিন আমেরিকান ছবি হচ্ছে টিভিতে, দেখে বুঝলাম ভিডিও চলছে। ফিল্মের কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে।

'আসুন মিঃ মিত্রর, আসুন আঙ্কল।'

আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে, গলা শুকিয়ে গেছে, পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

এ গলা যে আমাদের খুব চেনা! ফেলুদা বলেছিল এর মতো ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়েও আনন্দ। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে এর সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল ফেলুদার।

মগনলাল মেঘরাজ।

যার মাইনে করা নাইফ থ্রোয়ার লালমোহনবাবুকে টার্গেট করে খেলা দেখিয়ে ওঁর আয়ু কমিয়ে দিয়েছিল অন্তত তিন বছর।

কাঠমাণ্ডুতে কী করছে এই সাংঘাতিক লোকটা?

৯

'আসেন। বসেন।'

টিভির পাশের যন্ত্রটা থেকে একটা তার চলে গেছে ভদ্রলোকের হাতে, সেটার ডগায় একটা সুইচ। ভদ্রলোক সেটা টিপতেই শব্দ সমেত রঙিন ছবি উবে গেল।

'ওয়েল, মিঃ মিটার?'

আমরা দুটো সোফায় ভাগ করে বসেছি, আমার পাশে লালমোহনবাবু।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা খানিকটা স্পষ্ট। বিশেষ বদল হয়নি চেহারার। ধুতিটা এখনও ছাড়েন নি, তবে শেরওয়ানিটায় জাত কাটারের ছাপ রয়েছে, আর বোতামগুলো হীরের হলেও হতে পারে। সবচেয়ে বদল হয়েছে পরিবেশে; বেনারসের গলির বাড়ির

boiroi.net

গদি, আর ফাইভ-স্টার হোটেলের রয়েল সুইটে আকাশ পাতাল তফাত।

'এবার রিয়েল হলিডে তো ?'

'তার কি আর জো আছে,' একপেশে হাসি হেসে বলল ফেলুদা। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, জানেন তো ?'

'এখানে কী ধান ভানবেন আপনি মিঃ মিত্তির ?'

মগনলালের সামনে রূপোর ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে পাশের টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিলেন।

'টি অর কফি ? বেস্ট দার্জিলিং টি পাবেন এই হোটেলে।'

'চা-ই হোক।'

রুম সার্ভিস ডায়াল করে তিনটে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফোন রেখে আবার ফেলুদার দিকে চাইলেন মগনলাল।

'ইন্ডিয়াতে আপনি হিরো—বিগ ডিটেকটিভ। কাঠমাণ্ডু ইজ ফরেন কান্ট্রি মিঃ মিত্তির। এখানে জান-পেহ্‌চান আছে কি আপনার ?'

'এই তো একজন পুরোন আলাপী বেরিয়ে গেল !'

মগনলাল হালকা হাসি হাসলেন। দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের দিক থেকে সরছে না।

'আপনি কি সারপ্রাইজড্ হলেন আমাকে দেখে ?'

'তা একটু হয়েছি বৈকি !' একটা চারমিনার ধরিয়ে দুটো রিং ছেড়ে জবাব দিল ফেলুদা। 'আপনি হাজতের বাইরে দেখে নয় ; ওটা আপনার কাছে কিছুই না। অবাক হচ্ছি আপনার কর্মক্ষেত্র বদলেছে দেখে।'

'হোয়াই ? বনারস হোলি প্লেস, কাঠমাণ্ডুভী হোলি প্লেস। ওখানে বিশ্বনাথজী, ইখানে পস্‌পতিনাথজী। একই বেপার, মিঃ মিত্তির। যেখানে ধরম, সেখানেই আমার করম। কী বলেন, আঙ্কল ?'

'হেঁঃ হেঁঃ।'

বুঝলাম হাসি ফুটলেও, কথা ফোটার অবস্থা এখনও হয়নি

জটায়ুর।

'করমের কথা যে বলছেন, সেটা কি ওষুধ সংক্রান্ত কোনো কাজ?'

আমার শিরদাঁড়ায় একটা শিহরন খেলে গেল। বাঘের সামনে পড়ে ধরনের বেতোয়াক্কা ব্যবহার একমাত্র ফেলুদার পক্ষেই সম্ভব।

'ওসূদ?' মগনলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'হোয়াট ওসূদ মিঃ মিত্তর? সূদের কারবার আমার একটা আছে ঠিকই, লেকিন ওসূদকা কেয়া মতলব?'

'তা হলে আপনি এখানে কী করছেন সেটা জানতে পারি কি?'

'সার্টেনলি! লেকিন ফেয়ার এক্সচেঞ্জ হোনা চাই।'

'বেশ। আপনি বলুন। আমিও বলব।'

'আমার বেপার ভেরি সিম্পল মিঃ মিত্তর। আমি আর্টের কারবারী সেটা তো আপনি জানেন, আর নেপালে যে আর্টের ডিপো, সেটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

ফেলুদা চুপ। লালমোহনবাবু দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন।

এবার আপনার বেপার বলুন। ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।'

'আপনি সব কথা খুলে বলেছেন বলে মনে হয় না,' বলল ফেলুদা, 'তবে আমার কথা আমি খুলেই বলছি। আমি এসেছি একটা খুনের তদন্ত করতে।'

'খুন?'

'খুন।'

'ইউ মীন দ্য মার্ডার অফ মিঃ সোম?'

আমি থ। ফেলুদাও থ কিনা বোঝার উপায় নেই। লালমোহনবাবু শীত লাগার ভাব করে দাঁতে দাঁত চাপলেন সেটা লক্ষ করলাম। হোটেলের ভিতরের টেমপারেচারটা এমনিতেই একটু কমের দিকে। ক্যাসিনোতে লোকের ভিড়ের জন্য বলে বোধহয় ঠাণ্ডা লাগেনি।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মগনলালজী,' বলল ফেলুদা, 'মিস্টার অনীকেন্দ্র সোম।'

চা এলো। মগনলালের আদেশে নতুন ট্রে থেকে শুধু তিনটে

boiRboi.net

কাপ-ডিশ আর টি-পট রেখে পুরোনটা থেকে টি-পট আর মগনলালের ব্যবহার করা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল বেয়ারা।

'আমার বিশ্বাস,' ফেলুদা বলে চলল, 'সোম ভদ্রলোকটি এখানকার কোনো ব্যক্তির কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। তাই তাকে খতম করে ফেলা হল।'

মগনলাল চা ঢালছেন আমাদের জন্য।

'ওয়ান ? টু ?'

মগনলালের হাতে চিনির পাত্র। কিউব শুগার।

'ওয়ান,' আমি বললাম, কারণ প্রশ্নটা আমাকেই করা হয়েছিল।

'ওয়ান ?'

এবার জটায়ুকে প্রশ্ন। আমি জানি জটায়ুর মাথায় এল এস ডি ঘুরছে, আর ঘুরছে সেই লোকটার কথা, যে সিঁড়ি নামছে ভেবে সাত তলার ছাতের কার্নিশ থেকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'টু ? থ্রী ?'

'নো, নো।'

'নো শুগার ?'

'নো।'

লালমোহনবাবু মিষ্টির ভক্ত, চায়ের দু চামচের কম চিনি হলে চলে না, তাও নো বলছেন।

'ই কেমন কথা হল মোহনবাবু ? আপনার রসগুল্লা খাওয়া চেহারা, শুগারে নো করছেন কেন ?'

আমি নিয়েছি বলেই বোধ হয় ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত সাহস পেলেন।

'ও-কে। ওয়ান।'

ফেলুদারও একটা। উঠে গিয়ে যে যার চা নিয়ে এসে আবার বসলাম।

ফেলুদা চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে রেখে আগের কথার জের টেনে বলল—

'আমার বিশ্বাস মিঃ সোম জানতে পেরেছিলেন যে এখানে একটা

গর্হিত কারবার চলেছে। সে ব্যাপারে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা। তার আগেই তাকে খুন করা হয়। আপনি যখন খুনের ব্যাপারটা জানেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আপনি এ ব্যাপারে জড়িত কিনা।'

মগনলাল ভাসা ভাসা চোখে ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি নিয়ে কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের হাতে ধরা পেয়ালা থেকে ভুরভুর করে হাই ক্লাস চায়ের গন্ধ বেরোচ্ছে ; আমি আর লালমোহনবাবু এই অবস্থাতেই চুমুক না দিয়ে পারলাম না।

'জগদ্দীশ!'

মগনলাল হঠাৎ হাঁকটা দেওয়াতে চমকে উঠেছিলাম। বসবার ঘরের দু দিকেই যে আরো ঘর আছে সেটা এসেই বুঝেছিলাম। এবার মগনলালের পিছনের একটা দরজা খুলে একজন লোক এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে 'কিড়িং' করে যে শব্দটা হল সেটা লালমোহনবাবুর হাতের পেয়ালা কেঁপে গিয়ে পিরিচের সঙ্গে লাগার শব্দ।

জগদীশ নামে যে ভদ্রলোকটি মগনলালের পিছনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি হলেন বাটরা নাম্বার টু। কাছ থেকে দেখে বাটরার সঙ্গে সামান্য তফাতটা বুঝতে পারছি। এনার চোখ একটু কটা, কানের দু পাশের চুলে সামান্য পাক ধরেছে, হয়ত শরীরে মাংসও কিছুটা বেশি। আরেকটা বড় তফাৎ হল, এর চাহনিতে মিশুকে ভাবটা নেই।

'ইনাকে চিনেন?' প্রশ্ন করলেন মগনলাল।

'আলাপ হয়নি। দেখেছি,' বলল ফেলুদা।

'তবে শুনে রাখুন গোয়েন্দা বাহাদুর। ইনাকে হ্যারাস করবেন না। আমি জানি আপনারা ইনার পিছুনে লেগেছেন। উয়ো আমি বরদাস্ত করব না। জগদীশ ইজ মাই রাইট হ্যান্ড ম্যান।'

'যদিও উনি নিজে যা করেন তা বাঁ হাতেই করেন।'

বলিহারি ফেলুদা। এখনো নার্ভ স্টেডি, গলার স্বর একটুও কাঁপছে না।

মগনলাল আর কিছু বলার আগে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'ওনার চেহারার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়, এমন একজন লোক কাঠমাণ্ডুতে আছে সেটা আপনি জানেন কি ?'

মগনলালের মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল।

'ইয়েস মিঃ মিত্তর। আই নো দ্যাট। সে লোক যদি আপনার দোস্ত্ হয় তাহলে টেন হিম টু বি ভেরি কেয়ারফুল। সে যেন বুঝে-সুঝে কাম করে। আপনি তো আজ পস্‌পতিনাথজীর শ্মশান দেখে এসেছেন, মোহনবাবু ?'

লালমোহনবাবু প্রচণ্ড মনের জোরে মগনলালের কথা যেন শুনতে পাননি এমন ভাবে করে বাকি চা-টা ঢক করে খেয়ে পেয়ালাটা ঠং শব্দে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মগনলালের দৃষ্টি আবার ফেলুদার দিকে ঘুরল।

'বাটরা যদি মনে করে সে তার নিজের গলতি কাম জগ্‌দীশের কান্‌ধে ডালবে, তবে তাকে বলে দিবেন, মিঃ মিত্তর, কি ওই শ্মশানে তার ডেডবডির সৎকার হবে উইদিন টু ডেজ।'

'নিশ্চয়ই বলব।'

ফেলুদাও তার চা শেষ করে কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

মগনলালের কথা শেষ হয়নি এখনো।

'আরো একটা কথা বলে দিই মিঃ মিত্তর। আপনি দাওয়াইয়ের কথা বলছিলেন। আপনি জানেন আমাদের দেশের মানুষের সব্‌সে বড়া দুষমন কে ? অ্যালোপ্যাথ ডকটরস্। মাইসিন জানেন তো ? সিন মানে কী ? সিন মানে পাপ। পাকিট ফেঁড়ে পয়সা নেবে, হাথ ফেঁড়ে ব্লাড নেবে, পেট ফেঁড়ে পিঠ ফেঁড়ে বুক ফেঁড়ে এটা নেবে সেটা নেবে। ওয়র্স দ্যান এনি স্মাগলিং র‍্যাকেট। পেনিসিলিনসে পসপতিনাথের চরণামৃত ইজ হান্ড্রেড টাইমস বেটার। দেশের লোক যদি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে দুস্‌রা দাওয়াই খাবে তো আখেরে দেশের মঙ্গল হবে—এ আপনি জেনে রাখবেন।'

'শুনলাম আপনার কথা'—ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে,—'কিন্তু আপনি দেখছি নিজে এখনো অ্যালোপ্যাথি ছাড়তে পারেননি। আপনার টেলিফোনের পাশে রাখা ওই শিশিটা নিশ্চয়ই চরণামৃতের শিশি নয়।'

শিশিটা এমনভাবে আড়ালে রয়েছে যে প্রায় চোখেই পড়ে না।

কথাটা যে মগনলালের মোটেই পছন্দ হল না সেটা তার মুখের উপর ঝোড়ো ভাবটা নেমে আসা থেকেই বুঝেছি।

'আসি, মগনলালজী। চা-টা সত্যিই ভালো ছিল।'

মগনলাল তার জায়গা থেকে নড়লেন না।

যখন চারশো তেত্রিশ নম্বর সুইট থেকে বেরোচ্ছি, তখন একটা সুইচের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম মার্কিন ছবির সংলাপ আবার শুরু হয়েছে।

১০

মগনলালপর্বের পরেও একই রাত্রে যে আরো কিছু ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অথচ লুম্বিনী হোটেলে ফেরার পর আরো দুটো এমন ঘটনা ঘটল, যার ফলে এই বিশেষ দিনটা আমার জীবনে চিরকালের মতো একটা লাল-তারিখ মার্কা দিন হয়ে রইল।

হোটেলে ফিরে রিসেপশনের বেঞ্চিতে হরিনাথ চক্রবর্তীকে বসে থাকতে দেখে রীতিমত অবাক হলাম। এত রাত্রে কী ব্যাপার? বললেন প্রায় এক ঘন্টা, মানে সাড়ে দশটা থেকে, ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য, বিশেষ দরকার।

'আসুন আমাদের ঘরে,' বলল ফেলুদা।

ঠাণ্ডা মানুষটার মধ্যে বেশ একটা চাপা উদ্বেগের ভাব লক্ষ করছিলাম।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' ঘরে এসে ভদ্রলোককে সোফায় বসিয়ে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ সময় নিয়ে যেন তাঁর চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হিমাদ্রি এইভাবে চলে যাওয়াতে সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি বলতে কি, এও মনে হচ্ছিল যে, তাকে যখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তখন এত কথা বলেই বা লাভ কী?'

'কিসের কথা বলছেন আপনি ?'

'বছর তিনেক আগে,' একটু দম নিয়ে বললেন হরিনাথবাবু, 'হিমাদ্রি এখানে একটা চোরা কারবারের ব্যাপার ধরিয়ে দিয়েছিল। গাঁজা চরস ইত্যাদি গোপনে চালান যাচ্ছিল এখান থেকে। হিমাদ্রি ছিল ভয়ানক রেকলেস অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছেলে। নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা করত না। স্মাগলিং যে হচ্ছে সেটা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঘাঁটিটা কোথায় জানা যাচ্ছিল না। আপনাকে আগেই বলেছি যে হিমাদ্রিকে হেলিকপ্টারে নেপালের উত্তর-দক্ষিণ দুদিকেই যেতে হত। একবার উত্তরে গিয়ে সে নিজেই অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে ঘাঁটিটা হচ্ছে হেলাম্বুর কাছে একটা শেরপাদের গ্রামে। সে পুলিসকে খবর দেয়। ফলে দলটা ধরা পড়ে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনার কি ধারণা ইদানীং সে এই ধরনের আরেকটা চোরা কারবারের সন্ধান পেয়েছিল ?'

'আমাকে সে কিছু বলেনি,' বললেন হরিনাথবাবু, 'তবে ও মারা যাবার দিন পাঁচেক আগে থেকে দুই বন্ধুতে উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। তার কিছু কিছু কথা আমার কানেও এসেছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, তুই এসব গোলমালের মধ্যে আর যাস না। এসব গ্যাঙ বড় সাংঘাতিক হয়; এদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। ও আমার কথায় কান দেয়নি।'

ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'ওরা যে নির্মম হয় সেটা তো অনীকেন্দ্র সোমের খুন থেকেই বুঝতে পারছি।'

'আমার বিশ্বাস হিমু টেট্যানাসে না মরলে ওকেও হয়ত এরাই মেরে ফেলত।'

'এটা কেন বলছেন ?'

ভদ্রলোক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজ। তাতে লাল কালি দিয়ে দেবনাগরীতে লেখা এক লাইন কথা।

'এটা ছিল হিমুর একটা প্যান্টের পকেটে। ও মারা যাবার পর আমার চাকর পেয়ে আমাকে দেয়।'

'নেপালি ভাষা বলে মনে হচ্ছে?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাঁ। ওর মোটামুটি বাংলা হচ্ছে—তোমার বাড় বড্ড বেড়েছে।'

ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জাল ওষুধের চোরা কারবার বন্ধ করতে গিয়ে আপনার পুত্রকে সেই জাল ওষুধের ইনজেকশনেই মরতে হল!'

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন যে ইনজেকশনে ভেজাল ছিল?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস। সেটা ঠিক কিনা সেটা কাল জানতে পারব বলে আশা করছি।'

ডাঃ দিবাকরকে যে ওষুধ টেস্ট-করতে বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা হরিনাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

'জানি না এসব তথ্য জেনে আপনার কোনো লাভ হল কিনা,' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী।

'আমার মনের কিছু অস্পষ্ট ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হল।' বলল ফেলুদা। 'তদন্তের ব্যাপারে সেটা একটা মস্ত লাভ।'

হরিনাথবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও গুডনাইট করে চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

আমি শুয়ে পড়লাম, যদিও ফেলুদার হাবভাবে মনে হচ্ছে বেড-সাইড ল্যাম্প এখন জ্বলবে কিছুক্ষণ।

আজকের রাতটা কী অদ্ভুত ভাবে গেল, হিমাদ্রিবাবুর চোরা কারবারিদের ধরিয়ে দেওয়া, মগনলাল কী সাংঘাতিক লোক, কী বেপরোয়াভাবে ফেলুদাকে শাসিয়ে দিল—এইসব ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা দুটো বুজে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ দরজার বেলটা বেজে উঠল।

সোয়া বারো। এই সময় আবার কে এল?

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তাজ্জব ব্যাপার।

লালমোহনবাবু। বাঁ হাতে এক টুকরো কাগজ, ডান হাতে

জপযন্ত্র। মুখের হাসিটাকে লামা-স্মাইল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এরকম অমায়িক, স্নিগ্ধ হাসি আজকের দিনে চট করে কোনো সেয়ানা শহুরে লোকের মুখে দেখা যায় না।

'হুম্ হুম্ হুম্!'

তিনবার হুম্ শব্দটা উচ্চারণ করে জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে ভদ্রলোক ঢুকে এলেন ঘরের ভেতর।

ফেলুদা খাটে উঠে বসেছে। আমি ভদ্রলোকের হাত থেকে

কাগজের টুকরোটা নিয়ে নিয়েছি। তাতে লাল কালি দিয়ে ইংরাজিতে লেখা—'ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্নড।' অর্থাৎ তোমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক এই লাল কালিই দেখেছি একটু আগে একটা নেপালি ভাষায় লেখা হুমকিতে।

'কোথায় ছিল এটা?' ফেলুদার হাতে কাগজটা চালান দিয়ে জিগ্যেস করলাম ভদ্রলোককে। লালমোহনবাবু তাঁর জহরকোটের ডান পকেটে দুটো চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এই কোটটা পরেই বেরিয়েছিলেন সকালে। মনে পড়ল স্বয়ম্ভুনাথে বলেছিলেন বাঁদরে ওর পকেট ধরে টান দিয়েছিল।

'ও—ম্ম্ম্ম্!'

টেনে দম নিয়ে পুরো দমটা ছেড়ে শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে।

'ও-ম্ মণি পদ্মে হুম্—হুম্—হুম্কি।'

হুম্কি তো বটেই, কিন্তু এ কী দশা লালমোহনবাবুর! অথচ মুখে সেই হাসিটা রয়েই গেছে।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম। ও ঠোঁট নেড়ে বুঝিয়ে দিল—'পাউন্ড-শিলিং-পেন্স।'

এল এস ডি।

শুগার কিউব।

মগনলাল নিজের হাতেই চিনি দিয়েছিল আমাদের চায়ে। আমাদের যখন কিছুই হচ্ছে না, তখন শুধু লালমোহনবাবুর চায়েই দিয়েছিল ওই বিশেষ একটি কিউব। আঙ্কলকে নিয়ে রসিকতা করাটা দেখছি মগনলাল চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। কী শয়তান লোকটা!

'ওঁ—ম্ম্ম্ম্মণিপদ্মে হুম্কি!' আবার বললেন ভদ্রলোক। পরমুহূর্তেই হঠাৎ হাসিটা চলে গিয়ে একটা বিরক্তির ভাব দেখা দিল চাহনিতে। দৃষ্টি ফেলুদার দিকে। ফেলুদা একদৃষ্টে লক্ষ করে যাচ্ছে ভদ্রলোককে।

'খুলিটা খুলে ফেলুন!' ধমকের সুরে বললেন ভদ্রলোক—'বলছে খুলি, অথচ খোলার নামটি নেই। হ্যাঃ!'

boiRboi.net

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'স্কাউন্ড্রেল'। বুঝলাম সেটা মগনলালকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

জপযন্ত্র এখন থেমে আছে। আস্তে আস্তে বিরক্ত ভাবটা চলে গিয়ে লালমোহনবাবুর চোখ ফেলুদার উপর থেকে সরে গিয়ে চলে গেছে খাটের পাশে জলভরা গেলাসটার দিকে।

চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে এল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরে পিন ড্রপ সাইলেন্স। লালমোহনবাবু চেয়ে আছেন গেলাসটার দিকে; মনে হচ্ছে গেলাসটা হয়ত বা ওঁর মন্ত্রের জোরে টেবিল থেকে শূন্যে উঠে পড়বে।

'অহোহো!' বললেন লালমোহনবাবু। তীক্ষ্ণতা চলে গিয়ে একটা ঢুলু-ঢুলু ভাব চোখে, সেই সঙ্গে তারিফের হাসি। 'অহোহো ভিবজিওর! অহো! অহো!—তপেশ, দেখেছ রঙ?'

আমি থতমত খেয়ে কিছু বলার খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ লালমোহনবাবু ছাড়বেন না। ভিবজিওর মানে হচ্ছে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রীন, ইয়েলো, অরেঞ্জ রেড। অর্থাৎ গেলাসের জলে রামধনুর রঙ দেখছেন তিনি।

'তপেশ ভাই, দেখেছ রঙ? ভিবজিওর ভাইব্রেট করছে, দেখেছ?'

কথার মাঝে মাঝে যখন ফাঁক পড়ছে আর লালমোহনবাবু শুধু চুপ করে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, সেই সময়টা আমার তন্দ্রার মতো আসছে। আবার কথা শুরু হলেই ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে। একবার তন্দ্রার অবস্থা থেকে 'মাইস'! বলে একটা চিৎকারে লাফিয়ে উঠে দেখি লালমোহনবাবু ভীষণ সোজা হয়ে বসে ওঁর সামনে মেঝের দিকে চেয়ে আছেন।

'মাইস!' আবার বললেন ভদ্রলোক। তারপর বিড়বিড়ানি শুরু হল কিছুক্ষণ—'টেরামাইস, টেট্রামাইস, সুবামাইস, ক্লোরোমাইস, কমপ্রোমাইস...কিল-বিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব।—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?'

শেষের কথাটা বেদম জোরে বলে লালমোহনবাবু হঠাৎ সোফা

ছেড়ে উঠে কার্পেটে মোড়া মেঝেতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘা দিতে শুরু করলেন—যেন প্রত্যেকটা ইঁদুরকে পিষে পিষে মারছেন।—'আবার পেখম ধরা হয়েছে! এদিক নেই ওদিক আছে!'

এইভাবে চলল মিনিট তিনেক। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না—সারা ঘর ঘুরে ঘুরে এই কাণ্ড। আশা করি আমাদের ঠিক নিচের ঘরে কোনো গেস্ট নেই!

'ব্যস্, খতম।'

লালমোহনবাবু বসে পড়লেন।

'ঝ্যাক্' আবার বললেন ভদ্রলোক।—'অল টিকটিকিজ খতম।'

কোন ফাঁকে যে ইঁদুর টিকটিকি হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না।

'খতম্! অ্যান্টিবায়োটিকটিকিজ—খতম্।'

এতটা এনার্জি খরচ করার ফলেই বোধ হয় লালমোহনবাবুর মধ্যে এবার একটা ঝিমধরা ভাব এসে গেল। তার সঙ্গে সেই আলাভোলা হাসি।

'ওম্ম্ম্ মোমোমোমোমো—ওম্ম্ম্!'

এর পরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন উঠলাম, তখন পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘর একেবারে আলোয় আলো। ফেলুদা চানটান করে দাড়িটাড়ি কামিয়ে রেডি, সবেমাত্র কাকে যেন ফোন করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

'উঠে পড় তোপ্সে, কাজ আছে। আজ সকালেই বাটরার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তার অবস্থাটা যে খুব নিরাপদ নয় সেটা তাকে জানানো দরকার।'

'ফোনটা কাকে করলে?'

'পুলিশ স্টেশন। ভেরি গুড নিউজ। দুই সরকারে সমঝোতা হয়ে গেছে।'

'এ তো দারুণ খবর!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমি নিজে একটা ফোন করেছিলাম, সেটার খবরটা খুব ভাল না।'

'কেন ? কাকে করেছিলে ফোন ?'

'ডঃ দিবাকর। উনি নাকি আজ ভোরে একটা জরুরী কল পেয়ে চলে গেছেন, এখনো ফেরেননি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না।'

'কেন ফেলুদা ?'

'মনে হয় উনি আমাদের হয়ে ওষুধ পরীক্ষা করে দেখছিলেন, সেটা চোরাকারবারির দল পছন্দ করেনি। অবিশ্যি এটা আমার অনুমান। দেখি, ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ফোন করে দেখব। তাতেও নাহলে ডিসপেনসারিতে চলে যাব।'

লালমোহনবাবুর ব্যাপারটা কতক্ষণ চলেছিল সেটা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'উনি গেছেন ঘন্টা খানেক হল', বলল ফেলুদা, 'পরের দিকটা একেবারে মহানির্বাণের অবস্থা। কোনো উৎপাত করেন নি। আসলে এল এস ডি-র প্রভাব সাত আট ঘন্টার কমে যায় না।'

'তুমি অল অ্যালং জেগে ছিলে ?'

'উপায় কী ? কখন কী করে বসে তার তো ঠিক নেই। ভাগ্য ভালো ভদ্রলোকের কোনো খারাপ এফেক্ট হয়নি।'

'এখন একদম নরম্যাল ?'

'পুরোপুরি নয়। যাবার সময় বলে গেলেন আমার মগজের নকি তিন ভাগ স্থল, একভাগ জল। সেটা কমপ্লিমেন্ট হল কিনা ঠিক বুঝলাম না। তবে খোশ মেজাজে আছেন। কোনো ডেঞ্জার নেই।'

boiRboi.net

১১

আমি আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা বলেছিল নিচে থাকবে, যাতে টেলিফোন এলে তৎক্ষণাৎ রিসেপশন থেকেই কথা বলতে পারে। গিয়ে দেখি ও পায়চারি করছে। বলল, 'এখনও ফেরেনি ডাঃ দিবাকর। মুশকিল হচ্ছে কি, কোথায় যে গেছেন, সেটাও বাড়ির লোকে জানে না।'

'আর বাটরা ?'

'বাটরার লাইনটা পাচ্ছি না। আরও বার-দুয়েক দেখি। না হলে ব্রেকফাস্টের পর সোজা চলে যাবো ওর আপিসে। এমনিতেও একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই লালমোহনবাবু এসে হাজির। কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। তবে আমার সঙ্গে যে সামান্য কথাবার্তা হল, তাতে বুঝলাম যে চিনি এখনও সম্পূর্ণ হজম হয়নি।

রিসেপশনের দেওয়ালে টাঙানো একটা নেপালি মুখোসের নাকের উপর বার তিনেক হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদের নামটা কী যেন, ভাই তপেশ ?'

'বাকিংহাম প্যালেস ?'

'ইয়েস,' বললেন লালমোহনবাবু, 'তবে এর সঙ্গে বোধহয় কমপ্যারিজন হয় না।'

'কার সঙ্গে ?'

'আমাদের এই হোটেল লুমুম্বা।'

'লুম্বিনী।'

'লুম্বিনী।'

তার পর একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এইখানেই তো জন্মেছিলেন, তাই না ?'

'কে ?'

'গৌতম বুদ্ধ ?'

'এই হোটেলে নয় নিশ্চয়ই।'

'কেন, বিফোর ক্রাইস্ট হোটেল ছিল না বলছ ?'

এই অদ্ভুত আলোচনা আর বেশিক্ষণ চলল না, কারণ ফেলুদা এসে বলল যে, চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে বাটরার আপিস সান ট্র্যাভেলসে যাওয়া দরকার, ওদের টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও শুধু কফিতে ব্রেকফাস্ট সারলাম। মন বলছে, আজ অনেক কিছু ঘটবে। কিন্তু কী ঘটবে সেটা বুঝতে পারছি না।

boiRboi.net

আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ মিঃ বাটরার আপিস। বেশি বড় না হলেও, বেশ ছিমছাম আপিস, দেখেই বোঝা যায় বয়স বছর-তিনেকের বেশি না। এক দেওয়ালে নেপালের রাজা-রানীর ছবি, আর অন্য দেওয়ালে যার ছবি—বুঝলাম সে-ই এই আপিসের মালিক মিঃ রাণা।

আপিসে এসে যে খবরটা পেলাম, সেটাকে একটা বমশেল বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

বাটরার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই, রয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি মিঃ প্রধান। তাঁর কাছেই জানলাম যে মিঃ বাটরাকে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

'এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পারসন আজ সকালে ফোন করলেন মিঃ বাটরাকে,' বললেন মিঃ প্রধান। 'বললেন তেরাইতে আমাদের নতুন বাংলোটা দেখার খুব ইচ্ছা। তাই মিঃ বাটরাকে ওঁর সঙ্গে চলে যেতে হল। অবিশ্যি উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন যে, আপনার গাড়ি লাগলে যেন তার ব্যবস্থা আমরা করে দিই। তার কোনও ডিফিকাল্টি হবে না।'

'এই ইম্পর্ট্যান্ট পারসনটির নাম জানতে পারি কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সার্টেনলি। মিঃ মেঘরাজ। ওবেরয় হোটেলে আছেন। ভেরি বিগ আর্ট ডিলার।'

লালমোহনবাবু আমার হাতটা খপ করে ধরলেন। বুঝলাম মেঘরাজের নামেই ওর নেশা ছুটে গেছে। সত্যিই, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। মিঃ বাটরা যে এত সহজেই মগনলালের ফাঁদে পড়ে যাবেন, সেটা ভাবতে পারিনি।

'এখান থেকে আপনাদের বাংলোয় যেতে কতক্ষণ লাগে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আপনাকে যেতে হবে ত্রিভুবন রোড দিয়ে হেতাওরা—১৫০ কিলোমিটার। হেতাওরা ইজ এ টাউন—ওখানে আপনি লাঞ্চ করে নিতে পারেন। কারণ আমাদের বাংলো নতুন, সেখানে কিচেন চালু হয়নি এখনও। টাউন থেকে ডাইনে ঘুরে রাপ্তি নদীর পাশ দিয়ে

তিন কিলোমিটার গিয়ে আরও ডাইনে দু ফার্লং গিয়েই বাংলো। জঙ্গলের মধ্যে—বিউটিফুল স্পট।'

ফেলুদা আধঘণ্টা পরে হোটেলে গাড়ি পাঠাতে বলে দিল। ওকে একবার নাকি চট করে দরবার স্কোয়ারের দিকে ঘুরে আসতে হবে। বলল, 'তোরা হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমার বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

গাড়ি এল কুড়ি মিনিটের মধ্যে, আর ফেলুদা পঁচিশে। বলল, ওকে নাকি একবার ফ্রিক স্ট্রিট-এ যেতে হয়েছিল। 'সেটা আবার কোথায়?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কাছেই,' বলল ফেলুদা, 'বলা যেতে পারে হিপি-পাড়া।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শহর ছাড়িয়ে ত্রিভুবন রোড ধরল আমাদের ট্যাক্সি। ফেলুদার হাতে খাতা, চোখে ভ্রূকুটি, বাইরের দৃশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। লালমোহনবাবুর নেশা ছুটে গেলেও, একটা আশ্চর্য মোলায়েম ভাব লক্ষ করছি ওঁর মধ্যে, যেটা আগে কখনও দেখিনি। মনে হয় যেন এ সব সাময়িক উত্তেজনার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে শুধু একটা মাত্র মন্তব্য করলেন—

'কাল সব ডবল দেখছিলাম, আজ সিঙ্গল।'

ফেলুদা কথাটা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুর দিকে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'এটাও যেমন ঠিক, তেমন এর উলটোটাও ঠিক।'

কথাটা আমার কাছে ভীষণ রহস্যজনক বলে মনে হল।

কাঠমাণ্ডুর চার হাজার ফুট থেকে আরও অনেক উপরে উঠে এসেছি। তিন পাশ ঘিরে বরফের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। আগেই জানতাম যে, সাড়ে সাত হাজার ফুট অবধি উঠতে হবে। তাই ঝোলাতে করে গরম মাফলার নিয়ে নিয়েছিলাম। ঘন্টা দেড়েক চলার পর সেগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি ছিল, গাড়ি চালু অবস্থাতেই তিনজন খেয়ে নিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নামা শুরু হয়ে গেল। ন্যাড়া মহাভারত পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে আমরা এখন ঘন সবুজে ঢাকা শিবালিক

boiRboi.net

পর্বতশ্রেণীর দিকে চলেছি। অত দূর যেতে হবে না আমাদের, কারণ মাঝপথেই পড়বে রাপ্তি উপত্যকায় নদীর পাশে হেতাওরা শহর। সেইখান থেকে ত্রিভুবন রাজপথ ছেড়ে ডান দিকে ঘুরব আমরা।

'তোপ্‌সে—বাটরার পুরো নামটা জানিস?'

হাতের খাতাটা বন্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'না তো, উনি তো কোনওদিন বলেননি।'

'না বললেও তোর জানা উচিত ছিল,' বলল ফেলুদা, 'ওর আপিসের ঘরে ওর টেবিলের উপর একটা প্লাস্টিকের ফলকে লেখা ছিল পুরো নামটা। অনন্তলাল বাটরা।'

হেতাওরা যখন পৌঁছলাম, তখন দুটো বেজে গেছে। খিদে পাবার কথা, কিন্তু পায়নি। এক-একটা অবস্থায় পড়লে মানুষ খিদে-তেষ্টা ভুলে যায়, এটা সেই অবস্থা। লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করাতে বললেন, 'ফুড ইজ নাথিং।'

ড্রাইভার রাস্তা জানে, সে ত্রিভুবন রোড ছেড়ে ডান দিকে ঘুরল। একটা সাইন বোর্ড দেখে বুঝলাম যে, এই রাস্তা দিয়েই ট্রি-টপস হোটেলে যায়, যেখানে গাছের মাথায় বসানো হোটেলের বারান্দায় বসে তেরাই-এর বন্য জানোয়ার দেখা যায়। আমাদের বাংলো অবিশ্যি পড়বে তার অনেক আগেই।

বাঁ দিক দিয়ে রাপ্তি নদী ছুটে চলেছে পাথর ভেঙে দু' দিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমাদের রাস্তারও ডান দিকে ঘন শালবন। মন বার বার বলছে, এই হল সেই তেরাই—সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া অরণ্যভূমি, হিংস্র জানোয়ারের ডেরা হিসেবে যার আর জুড়ি নেই। সিপাহী বিদ্রোহের পর নানাসাহেব তার দলবল নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসে এই তেরাইয়েরই এক অংশে গা ঢাকা দিয়ে ছিল।

রাস্তা আবার ডাইনে মোড় নিল। এটা কাঁচা, হালে তৈরি হয়েছে।

এই রাস্তা ধরে মিনিট-তিনেক চলেই লাল টালির ছাতওয়ালা কালো কাঠের বাংলোটা চোখে পড়ল। বনের গাছ কেটে বেশ

কিছুটা জায়গা সাফ করে কম্পাউন্ডে ঘেরা বাংলোটা তৈরি হয়েছে।

ডাইনে ঘুরে বাংলোর গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে শব্দ তুলে আমাদের গাড়ি বাংলোর বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁয়ে কিছুটা দূরে কম্পাউন্ডেরই ভেতর দুটো পাশাপাশি গ্যারাজের সামনে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার আশ্চর্য নিস্তব্ধতার একটা আন্দাজ পেয়েছি। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। না, সেটা ঠিক না। একটা সামান্য খুটখাট শব্দ কোত্থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার অন্য গাড়িটার দিকে চলে গেল, আমরা তিনজন তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে জাল দেওয়া দরজাটা খুলে বারান্দায় গিয়ে ঢুকলাম।

'ভিতরে আসুন মিঃ মিত্তর!'

সামনের ঘরটাই বৈঠকখানা, তার ভিতর থেকেই ডাকটা এসেছে। মগনলালের পালিশ করা গম্ভীর গলাটা চিনতে অসুবিধা হয় না।

আমরা তিনজন গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

ঘরের তিন দিকে সোফা, মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, দেওয়ালে বাঁধানো নেপালের দৃশ্য, মেঝেতে তিব্বতী কার্পেট। এ ছাড়া পাশে একটা টেবিলের উপর একটা রেডিও রয়েছে। আর এক কোণে একটা বুক শেলফে কিছু বই আর পত্রিকা।

আমাদের ঠিক সামনের সোফাটায় এক ধারে বসে মগললাল একটা টিফিন ক্যারিয়ার থেকে পুরী আর তরকারি খাচ্ছে। একজন চাকর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জলের জাগ আর গামলা হাতে নিয়ে।

এ ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই।

'আমি জানতাম, আপনি আসবেন,' খাওয়া শেষ করে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বললেন মগনলাল। আমরা তিনজনে ইতিমধ্যে বসে পড়েছি।

'আপনি কী ব্যাপারে এসেছেন, সেটা আমি জানি মিঃ মিত্তর। বাট দিস টাইম ইট ইজ মাই টার্ন। ঘুঘুতে বার বার খাবে না দানা,

খাবে কি ?'

ফেলুদা নির্বাক।

'বেনারসে আপনি যে বেইজ্জত করলেন আমাকে,' বললেন মগনলাল, 'সে তো আমি ভুলিনি মিঃ মিত্তর। বদলা নেবার মওকা যদি আপনি দিয়ে দেন, বদলা আমি নেব না ?'

একটা ধপ ধপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে এই বাংলোরই কোনও অংশ থেকে। মনে হচ্ছে, ডান দিকের কোনও ঘর থেকে আসছে। কিসের শব্দ বোঝা মুশকিল।

'মিঃ বাটরা কোথায়, সেটা জানতে পারি কি ?'

মগনলালের হুমকি অগ্রাহ্য করে শান্তভাবে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

মগনলাল আপসোসের ভঙ্গিতে চুক্ চুক্ করে শব্দ করে বললেন, 'ভেরি স্যাড, মিঃ মিত্তর। আমি তো কাল বললাম আপনাকে—জগদীশ আমার রাইট হ্যান্ড ম্যান। রাইট হ্যান্ড তো একটাই থাকে মানুষের—দোনো কা কেয়া জরুরত ?'

'আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন না। আমি জানতে চাই, সে ভদ্রলোক কোথায় ?'

'বাটরা জিন্দা আছে মিঃ মিত্তর,' শেরওয়ানির পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে দুটো পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন মগনলাল—'ডে টাইমে হি উইল বি সেফ। তেরাই-এর বেপার তো আপনি জানেন। গরমিন্ট ল আছে কি এখানে ওয়াইলড লাইফ মারা চলবে না, লেকিন ওয়াইলড লাইফ যদি মানুষ মারে, দেন হোয়াট ? সেটার এগনেস্টে কোনও ল আছে কি ?'

'আপনি যে এখানে চলে এলেন, কাঠমাণ্ডুতে আজ কী হচ্ছে সেটা আপনি জানেন ?'

'কী হচ্ছে মিঃ মিত্তর ?'

'আপনার পাটনের কারখানা আর কাঠমাণ্ডুর শুয়োর গলির গুদোমে আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে।'

মগনলাল সমস্ত দেহ দুলিয়ে অট্টহাসি করে উঠলেন।

'আপনি কি ভাবেন, আমি এত বুদ্ধু মিঃ মিত্তর ? পোলিস উইল

ফাইন্ড নাথিং, নাথিং। পাটনে দেখবে হ্যান্ডিক্রাফট তৈয়ার হচ্ছে, আউর শুয়ার গলিতে দেখবে গুদাম খালি ! সব মাল লরিতে করে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি মিঃ মিত্তর। হেতাওরা দিয়ে লরিতে মাল যায় ইন্ডিয়া। টিম্বার। সেই লরিতে করে সব দাওয়াই চলে যাবে বিহার, ইউ পি। ওষুধের অনেক কাম তো আমার ইন্ডিয়াতেই হয়। লেবেল, ক্যাপসুল, অ্যামপুল, ক্যাপ, ফায়াল, সবই তো ইন্ডিয়া থেকে আসে। বাকি কাম হয় এখানে, বিকজ এখানের লোক ইন্ডিয়ার লোকের চেয়ে কাম করে বেশি। অ্যান্ড বেটার।'

আমার কানটা খুব ভাল বলেই বোধ হয় ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে আর একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফেলুদার ঘাড়টা এক মুহূর্তের জন্য একবার সামান্য বাঁ দিকে ঘুরতে—বুঝলাম, সেও আওয়াজটা পেয়েছে।

'জগ্‌দীশ !'

বুঝলাম, মগনলাল কথা শেষ করে কাজে চলে এসেছেন।

ডান পাশের ঘর থেকে ফুলকারী করা পর্দা ফাঁক করে যিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন, তার বাঁ হাতে ধরা রিভলভারটা সোজা ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

'উঠুন আপনারা তিনজন !' মগনলাল হাঁকিয়ে হুকুম দিলেন।

আমরা উঠলাম।

'হাত তুলুন মাথার উপরে।'

তুললাম।

'গঙ্গা ! কেস্‌রী !'

আরও দুজন লোক—তাদের ঠিক ভদ্র বলা যায় না—পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা আমাদের তিনজনকে সার্চ করে ফেলুদার পকেট থেকে ওর কোল্ট রিভলভারটা বার করে মগনলালের কাছে দিয়ে দিল।

রিভলভারধারী জগদীশ ভদ্রলোকটিকে দিনের আলোতে দেখেও বাটরার সঙ্গে যে তফাতটুকু পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না।

ডান দিক থেকে আবার সেই ধুপ ধুপ শব্দটা শোনা গেল।

boiRboi.net

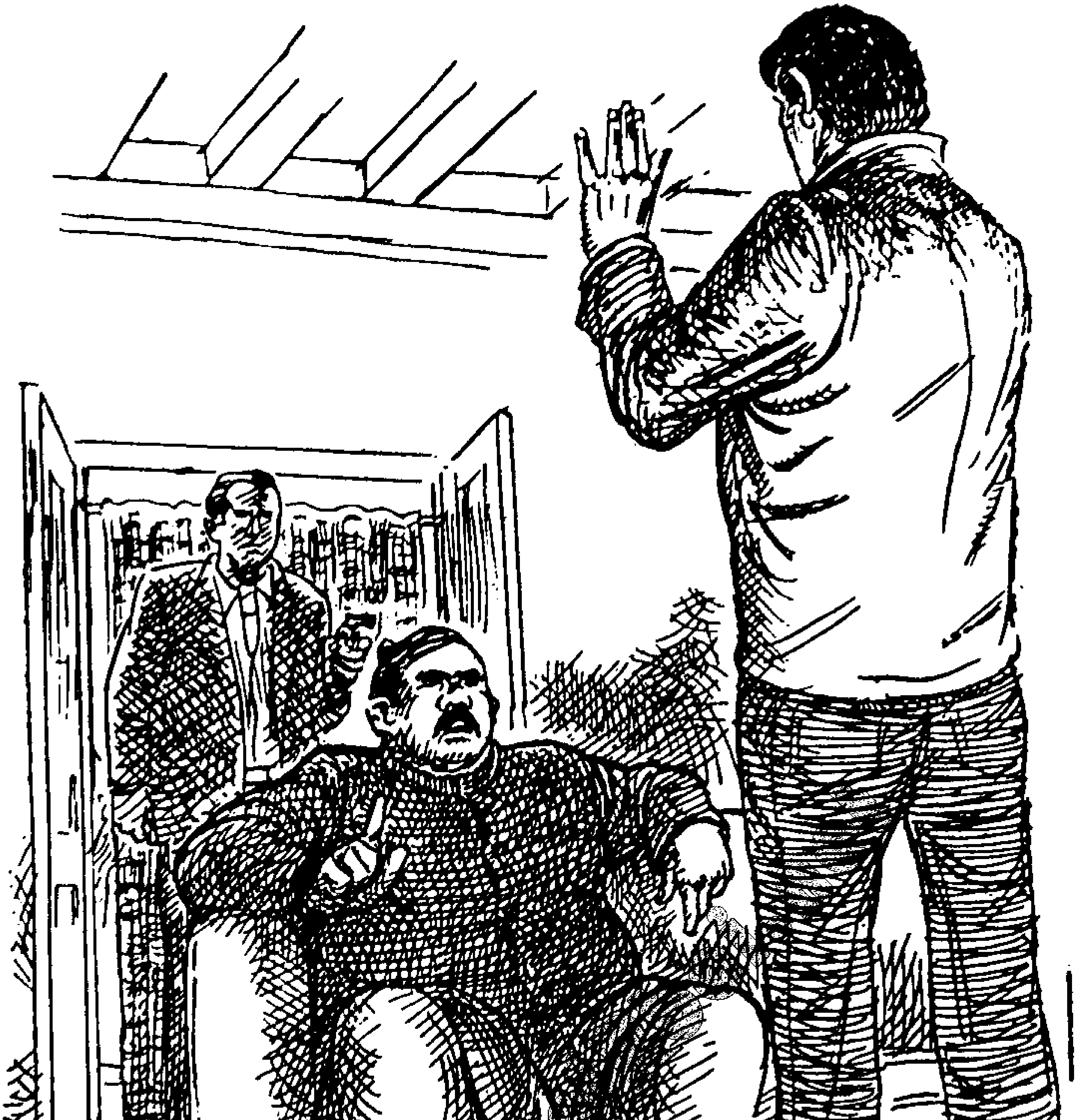

এবার মগনলাল সে দিকে একটা বিরক্ত দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'ভেরি স্যরি মিঃ মিত্তর, আপনার আর একজন ফ্রেন্ডকেও এখানে নিয়ে এসেছি আমি। উনি আমাদের ওষুধ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে ঝামেলা করছিলেন। ন্যাচারেলি ওনাকে রোকে দিতে হল।'

'উনিও কি বাঘের পেটে যাবেন ?'

'নো নো মিঃ মিত্তর,' হেসে বললেন মগনলাল, 'ওনাকে দিয়ে আমার অন্য কাম হবে। একজন ডকটর হাতে রাখলে সুবিধা হবে আমার, মিঃ মিত্তর। আমার নিজের হার্ট খুব ভাল নেই, সেটা আপনি বোধ হয় জানেন না।'

'তা হলে চরণামৃততে কাজ দিল না ?'

মগনলাল এ কথার কোনও উত্তর দেবার আগেই গঙ্গা ও কেশরী নামে দুটো ষণ্ডা মার্কা লোক লম্বা লম্বা দড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই, পর পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে, সেগুলো লিখে বোঝানো খুবই কঠিন। তাও আমি চেষ্টা করছি—

প্রথমে বাইরে একটা গাড়ির শব্দতে জগদ্দীশ ভদ্রলোক খচ্ শব্দে রিভলভারটার সেফ্‌টি ক্যাচ্‌টা খুলে ফেলুদার দিকে টান করে বাড়াতেই কিছু বোঝার আগেই দেখলাম ফেলুদার ডান পা-টা একটা হাই কিক্ করে রিভলভারটাকে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিটকে বার করে দিল, কিন্তু তার আগে ট্রিগারের চাপ পড়ে যাওয়াতে তার থেকে সশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে বন্ধ সিলিং ফ্যানের ব্লেডের কিনারে লেগে সেটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করে দিল।

এরই মধ্যে কখন যে ঘরে এত লোক ঢুকে পড়েছে, জানি না। এদের কাউকেই চিনি না, কিন্তু বুঝতে, পারছি এরা সবাই পুলিসের লোক। আর তার মধ্যে কিছু নেপালের, আর কিছু আমাদের পশ্চিমবাংলার। এদেরই একজন খপ করে ধরে ফেললেন জগদীশকে, যিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে গিয়েছিলেন।

মগনলাল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'খবরদার! আমার গায়ে কেউই হাত দিবেন না! খবরদার!'

'আপনার ব্যাপারে পরে আসছি মগনলালজী,' বলল ফেলুদা, 'আগে এনারটা ফয়সালা হয়ে যাক।'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে পুলিসের হাতে বন্দী জগদীশের দিকে।

'আপনার বাঁ হাতের তর্জনীটা এতক্ষণ রিভলভারের ট্রিগারে ছিল বলে দেখতে পাইনি,' বলল ফেলুদা, 'এখন দেখছি তর্জনীতে বেগুনি কালির দাগ। আপনি কি এখনও সেই লিক-করা কলমটাই ব্যবহার করছেন, মিঃ বাটরা ?'

'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, মিঃ মিত্তর,' ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন মগনলাল, 'জগদীশ ইজ মাই—'

'জগদীশ না, বাটরা—অনন্তলাল বাটরা—ইজ ইওর রাইট হ্যান্ড ম্যান। জগদীশ বলে কেউ নেই, নকল বাটরা নেই, লোক একজনই। একটু চাপ দিলেই উনি চোখের কনট্যাকট লেনস্ দুটো খুলে ফেলবেন, তা হলেই কটা ভাবটা চলে যাবে। আর মিঃ বাটরা বোধ হয় জানেন না যে, তিনি আজ ভোরে চলে আসার পর তার বাড়িতে সার্চ হয়েছিল, এবং একটি চোরা কুঠরি থেকে বেশ কিছু জাল একশো টাকার নোট পাওয়া গেছে—যেগুলো আপনার ওই জাল ওষুধের কারখানাতেই ছাপানো হত।'

নেপাল পুলিসের একজন অফিসার এক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট বার করে ধরলেন আমাদের সামনে। বাটরার মুখ ব্লটিং পেপার। ফেলুদা বলল—

'আপনি একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছিলেন কলকাতায়, মিঃ বাটরা। আপনি যে জাল নোটটা দিয়েছিলেন সেই কুকরির দোকানে, সেটা আর ফেরত নেননি। কারণ একবার যখন বলেছেন সেটা আপনি দেননি, তখন আর সেটা ফেরত নেওয়া যায় না। ফলে সেটা দোকান থেকে পুলিসের হাতে চলে আসে। এখন দেখা যাচ্ছে, সে নোটের নম্বর আর আজ আপনার বাড়িতে পাওয়া নোটের নম্বর এক।'

বাটরার শেষ অবস্থা, কিন্তু মগনলাল এখনও তম্বি করে চলেছে।

'আমি ফের বলছি মিস্টার মিত্তর, আমি—'

'আপনি বড্ড বেশি বকছেন,' বাধা দিয়ে বলল ফেলুদা, 'আপনার বুকনিটা বন্ধ করা দরকার। তোপসে, তোরা দুজনে চেপে ধর তো লোকটাকে।'

আমি তো এ সব পারিই, কিন্তু লালমোহনবাবুর মধ্যেও যে হঠাৎ এতটা এনার্জি এসে যাবে, সেটা ভাবতে পারিনি। দুই রাজ্যের পুলিস হল দর্শক, আর তার মধ্যে আমাদের এই নাটক।

দুজনের কম্বাইন্ড ঠেলা আর চাপে মগনলাল সোফার সঙ্গে সিঁধিয়ে গেলেন। ফেলুদা এর মধ্যে ওর পকেট থেকে দুটো জিনিস বার করেছে, তার একটা ভদ্রলোকের হাঁসফাঁসানির ফাঁকে তার মুখের ভেতর চলে গেল। এটা হল একটা শুগার কিউব। বুঝলাম এটা আজই সকালে ফ্রিক স্ট্রিটের হিপিদের কাছ থেকে জোগাড় করে এনেছে ফেলুদা। দ্বিতীয় জিনিসটা হল একটা স্কচ টেপ, যেটা থেকে চড়াৎ করে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলুদা সেটা দিয়ে মগনলালের ঠোঁট দুটো সিল করে দিল।

সব শেষে একটা সিগারেট কেসের মতো দেখতে জিনিস বার করে নেপাল পুলিস অফিসারের হাতে দিয়ে ফেলুদা বলল, এই মিনি-ক্যাসেট রেকর্ডারটা এই ঘরে ঢুকবার আগেই আমি পকেটে চালু করে দিয়েছিলাম। এতে আপনারা এই ভদ্রলোকের জাল ওষুধের কারবার সম্বন্ধে ওঁর নিজেরই বলা অনেক তথ্য পাবেন।'

১২

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা : তার আপিসের জনসংযোগের কাজের মধ্য দিয়েই মগনলালের সঙ্গে বাটরার পরিচয় হয়।'

আমরা ফিরতি পথে কাঠমাণ্ডুর আশি কিলোমিটার আগে সাড়ে সাত হাজার ফুট হাইটে দামন ভিউ টাওয়ার লজের ছাতে বসে কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছি। আমরা তিনজন ছাড়া আছেন ডঃ দিবাকর, নেপাল পুলিসের সাব-ইনস্‌পেকটর শর্মা, আর কলকাতার হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইনস্‌পেকটর জোয়ারদার। ডাঃ

দিবাকরকে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বাংলোর বৈঠকখানার দুটো ঘর পরে দক্ষিণে একটা বেডরুমে। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই পা দিয়ে মেঝেতে লাথি মেরে উনিই ধপ্ ধপ্ শব্দ করছিলেন। তিনি যে ফেলুদার ফরমাশে তাঁর দোকানের ওষুধ টেস্ট করছেন, সে খবর তার চর মারফৎ পৌঁছায় মগনলালের কাছে। তার রাইট হ্যান্ড ম্যান বাটরা আজই ভোরে একটা রুগী দেখতে নিয়ে যাবার অছিলায় ডঃ দিবাকরকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে, মগনলালকেও তুলে, এখানে চলে আসে। মগনলালের দলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাঠমাণ্ডু। এল এস ডি খেয়ে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কালকের আগে জানা যাবে না। ঘড়িতে বলছে পাঁচটা পাঁচ। বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের চারিদিকে ঘিরে থাকা হিমালয়ের বিখ্যাত চুড়োগুলোতে একটু পরেই সোনার রং ধরতে শুরু করবে।

ফেলুদা বলে চলল—'বাটরা চতুর লোক, শিক্ষিত আর ভদ্র বলে তার ভারতবর্ষেও যাতায়াত আছে, এই সব জেনে মগনলাল বাটরাকে তার চোরা কারবারের মধ্যে জড়ায়।

'অনীকেন্দ্র সোম জাল ওষুধের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে শুনে মগনলাল বাটরাকে দিয়ে তাকে হটাবার মতলব করে। মিঃ সোম কলকাতায় যাচ্ছে জেনে বাটরাকে তার সঙ্গে পাঠায়। হয় এয়ারপোর্টে না হয় প্লেনে, বাটরা সোমের সঙ্গে আলাপ করে, যদিও বাটরা আমার কাছে এটা অস্বীকার করে। সোমের নোটবুকে একটা কথা লেখা ছিল—এ বি-র বিষয় আরও জানা দরকার। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এ বি হল অ্যান্টিবায়োটিকস, কিন্তু যখন জানলাম বাটরার প্রথম নাম অনন্তলাল, তখন বুঝতে পারলাম সোম আসলে বাটরার বিষয়েই আরও জানবার কথা লিখেছিল। হয়তো আলাপ করে বাটরা সম্বন্ধে সোমের মনে কোনওরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

'আমার বিশ্বাস কথাচ্ছলে সোম বাটরাকে বলেছিল, সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাটরা আমাকে নামে জানত। তার তখন বিশ্বাস হয় যে, সে যদি সোমকে খুন করে, তা

হলে সে-খুনের তদন্ত আমিই করব।

'নিউ মার্কেটে দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ফলে একটা নকল বাটরা তৈরি করার আশ্চর্য ফন্দিটা বাটরার মাথায় আসে। মার্কেটে তার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগে নতুন কেনা একটা নীল রংয়ের শার্ট ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পরমুহূর্তেই সে কোনও একটি কাপড়ের দোকানে ঢুকে তাদের ট্রায়াল রুমে গিয়ে পুরনোর জায়গায় নতুন শার্টটা পরে নিয়ে, পুরনোটা আর একটা প্যাকেটে ভরে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়, এবং বুঝিয়ে দেয়, সে আমাদের আদৌ চেনে না।

'পরদিন বিকেলে আমার বাড়িতে এসে সে নকল বাটরার ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে। তার পরদিন সকালে ন'টায় তার কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট। মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে ভোরে হোটেল থেকে বেরোয়, পাঁচটায় সেন্ট্রাল হোটেলে গিয়ে সোমকে খুন করে চলে যায় এয়ারপোর্টে। ছুরিটা সে রেখেই যায়, যেন আমি মনে করি যে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে যে, লোক ছুরিটা কিনেছিল অর্থাৎ নকল বাটরা, সে-ই খুনটা করেছে।'

'কিন্তু আপনার প্রথম সন্দেহটা হয় কখন?' প্রশ্ন করলেন ইনস্‌পেকটর জোয়ারদার।

ফেলুদা বলল, 'নিউ মার্কেটে বাটরার একটা পুরনো ফাউনটেন পেন দিয়ে আমি তার নোটবুকে আমার ঠিকানাটা লিখে দিই। সে আমাকে দিয়ে লেখাল, কারণ নিজে লিখলে লিখতে হত বাঁ হাতে। সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, নকল বাটরাই লেফট-হ্যান্ডেড। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি; যারা ন্যাটা হয়, তারা এক কলম দিয়ে বেশি দিন লিখলে সেই কলমের নিব একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ক্ষয়ে যায়, ফলে রাইট-হ্যান্ডেড লোকেদের সে কলম দিয়ে লিখতে একটু অসুবিধে হয়। এই সামান্য অসুবিধাটা তখন বোধ করেছিলাম। কিন্তু গা করিনি। পরে যখন জানলাম, যিনি খুন করেছেন তিনি লেফট-হ্যান্ডেড, তখনই প্রথম খটকাটা লাগে, আর তখনই স্থির করি যে, কাঠমাণ্ডু গিয়ে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। অবিশ্যি এসে যে দেখব খুন একটা নয়, দুটো—সেটা ভাবতেই পারিনি।'

'ডাবল ?' ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। আমরা সকলেই অবাক, সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখছি ফেলুদার দিকে। দ্বিতীয় কোন্ খুনের কথা বলছে ফেলুদা ?

শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন ডাঃ দিবাকর।

'উনি ঠিকই বলেছেন। টিট্যানাসের ওষুধ আমার টেস্ট করা হয়ে গিয়েছিল। খবরটা মিঃ মিত্রকে দেবার আর সুযোগ হয়নি। ওটা সত্যিই ছিল জাল। কাজেই এই ইনজেকশানের পর টিট্যানাস হয়ে মরাটা এক রকম খুন বইকি। যারা জাল ওষুধ চালু করে, তারা তো এক-রকম খুনিই।'

'আমি কিন্তু জাল ওষুধের কথা বলছি না।'

এবার দিবাকরও অবাক হয়ে চাইলেন ফেলুদার দিকে। পাহাড়ের চুড়োগুলোতে সোনালি রং লেগেছে বলেই বোধ হয় সকলের মুখ এত হলদে দেখাচ্ছে।

'তা হলে কিসের কথা বলছেন ?' ডাঃ দিবাকর প্রশ্ন করলেন।

'সেটা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। হিমাদ্রি চক্রবর্তী বছর তিনেক আগে একটা চোরা-কারবারের ব্যাপার ফাঁস করে দিয়েছিল। এই নতুন চোরা-কারবারটা সম্বন্ধেও তার মনে সন্দেহ জেগে থাকতে পারে, সে খবর হরিনাথবাবু আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং মগনলালের দিক থেকে তাকে হটাবার একটা বড় কারণ পাওয়া যাচ্ছে। মগনলাল সে ব্যাপারে পেছ-পা হবার পাত্র নয়।'

'কিন্তু সে কীভাবে হটাবে ?'

'রাস্তা আছে,' বলল ফেলুদা, 'যদি একজন ডাক্তার তার হাতে থাকে।'

'ডাক্তার ?'

'ডাক্তার।'

'কোন্ ডাক্তারের কথা বলছেন আপনি ?'

'এমন ডাক্তার—যার অবস্থার উন্নতি দেখা গেছে সম্প্রতি—নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি, সোনার ঘড়ি, সোনার কলম—'

'আপনি এ সব কী ননসেন্স—'

boiRboi.net

'—যে ডাক্তার সামন্য একটা স্ক্র্যাচ দেখে টিট্যানাসের কোনও সম্ভাবনা নেই বুঝেও ইনজেকশন দেয়। আজ আপনাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখাটা যে স্রেফ ভাঁওতা, সেটা কি আমি বুঝিনি, ডঃ দিবাকর ? আপনিও যে বাটরার মতোই মগনলালের একজন রাইট হ্যান্ড ম্যান, সেটা কি আমি জানি না ?'

'কিন্তু জল দিয়ে কি খুন করা যায় ?' কাঁপতে কাঁপতে তারস্বরে প্রশ্ন করলেন ডঃ দিবাকর।

'না, জল দিয়ে যায় না, যায় বিষ দিয়ে।' কপালের শিরা ফুলে উঠেছে ফেলুদার—'বিষ, ডঃ দিবাকর, বিষ! স্ট্রিকনিন! যার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে টিট্যানাসের প্রতিক্রিয়ার কোনও পার্থক্য ধরা যায় না। ঠিক কিনা, মিঃ জোয়ারদার ?'

ইনস্পেক্টর জোয়ারদার গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ডঃ দিবাকর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার আবার ধপ করে বসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

আসলে গল্প এখানেই শেষ, তবু লেজুড় হিসেবে তিনটে খবর দেওয়া যেতে পারে।

এক—এল এস ডি খেয়ে মগনলালের প্রতিক্রিয়া নাকি মোটেই ভাল হয়নি, একটানা তিন ঘন্টা ধরে হাজতের দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়ানোর পর ঘরের টেবিল ক্লথটাকে কাশীর কচৌরি গলির রাবড়ি মনে করে চিবিয়ে ফালা ফালা করে দেয়।

দুই—ওষুধের চোরা কারবার, আর সেই সঙ্গে জাল নোটের কারবার—ধরে দেবার জন্য নেপাল সরকার ফেলুদাকে পুরস্কার দেয়, যাতে কাঠমাণ্ডুর পুরো খরচটা উঠে আসার পরেও হাতে বেশ কিছুটা থাকে।

তিন—লালমোহনবাবুর ভীষণ ইচ্ছে ছিল যে, আমাদের কাঠমাণ্ডুর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের নাম হোক 'ওম্ মনি পদ্মে হুমিসাইড'। যখন বললাম সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, ভদ্রলোক শুধু 'হুম্ম্' বলে যেন একটু রাগত ভাবেই আমাদের ঘরের সোফায় বসে জপযন্ত্র ঘোরাতে লাগলেন।

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

boiRboi.net

১

'কী ভাবছেন, ফেলুবাবু ?'

প্রশ্নটা করলেন রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। আমরা তিনজনে রবিবারের সকালে আমাদের বালিগঞ্জের বৈঠকখানায় বসে আছি, লালমোহনবাবু যথারীতি তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন গল্পগুজবের জন্য। কিছুক্ষণ হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন গনগনে রোদ। রবিবার লোডশেডিং নেই বলে আমাদের পাখাটা খুব দাপটের সঙ্গে ঘুরছে।

ফেলুদা বলল, 'ভাবছি আপনার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসটার কথা।'

পয়লা বৈশাখ জটায়ুর 'অতলান্তিক আতঙ্ক' বেরিয়েছে, আর আজ পাঁচই বৈশাখের মধ্যেই নাকি সাড়ে চার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'ও বইতে যে আপনার মতো লোকের ভাবনার খোরাক ছিল, তা তো জানতুম না মশাই।'

'ঠিক সে রকম ভাবনা নয়।'

'তবে ?'

'ভাবছিলাম আপনার গল্প যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, স্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উতরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়।'

লালমোহনবাবু গদগদ ভাব করে কিছু বলার আগেই ফেলুদা বলল, 'তাই ভাবছিলাম আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনও গল্প লিখিয়ে-টিখিয়ে ছিলেন কি না।'

সত্যি বলতে কি, আমরা লালমোহনবাবুর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে

boiRboi.net

প্রায় কিছুই জানি না। উনি বিয়ে করেননি এবং ওঁর বাপ-মা আগেই মারা গেছেন সেটা জানি, কিন্তু তার বেশি উনিও বলেননি, আর আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

লালমোহনবাবু বললেন, 'পাঁচ-সাত পুরুষ আগের কথা তো আর বিশেষ জানা যায় না, তাঁদের মধ্যে হয়তো কোনও কথক ঠাকুর-টাকুর থেকে থাকতে পারেন। তবে গত দু'-তিন জেনারেশনের মধ্যে ছিল না সেটা বলতে পারি।'

'আপনার বাবার আর ভাই ছিল না ?'

'থ্রি ব্রাদার্স। উনি ছিলেন মিড্‌ল। জ্যাঠা মোহিনীমোহন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ছেলেবেলায় আরনিকা রাসটকস বেলাডোনা পালসেটিলা যে কত খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ললিতমোহন ছিলেন পেপার মার্চেন্ট। এল. এম. গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্‌সের দোকান এই সেদিন অবধি ছিল। ভাল ব্যবসা ছিল। গড়পারের বাড়িটা এল. এম-ই তৈরি করেন। ঠাকুরদাদা, বাবা দুজনেই ব্যবসায় যোগ দেন। বাবা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন ব্যবসা চালান। ফিফটি-টু-তে চলে গেলেন। তার পর যা হয় আর কি। এল. এম. গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্‌স-এর নামটা ব্যবহার হয়েছিল কিছু দিন, কিন্তু মালিক বদল হয়ে গেছিল।'

'আপনার ছোটকাকা ? তিনি ব্যবসায় যোগ দেননি ?'

'নো স্যার। ছোটকাকা দুর্গামোহনকে দেখি আমার জন্মের অনেক পরে। আমার জন্ম থার্টি সিক্সে। দুর্গামোহন টোয়েন্টি নাইনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়ে খুলনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টার্নবুল সাহেবকে গুলি মেরে তাঁর থুতনি উড়িয়ে দেন।'

'তার পর ?'

'তার পর হাওয়া। বেপাত্তা। পুলিশ ধরতে পারেনি ছোটকাকাকে। আমরা ধারণা আমার অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতিটা ছোটকাকার কাছ থেকেই পাওয়া।'

'উনি আর আসেননি ?'

'এসেছিলেন। একবার। স্বাধীনতার পর ফর্টি নাইনে। তখন আমি থার্ড ক্লাসে পড়ি। সেই প্রথম আর সেই শেষ দেখা

ছোটকাকার সঙ্গে। তবে যাঁকে দেখলাম, তিনি সেই অগ্নিযুগের ছোটকাকা দুর্গামোহন গাঙ্গুলী নন। কমপ্লিট চেঞ্জ। কোথায় সন্ত্রাস, কোথায় পিস্তল। একেবারে নিরীহ, সাত্ত্বিক পুরুষ। মাসখানেক ছিলেন, তার পর আবার চলে যান।'

'কোথায় ?'

'যদ্দূর মনে পড়ে কোনও জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতে যান।'

'বিয়ে করেননি ?'

'নাঃ।'

'কিন্তু আপনার আপন বা জ্যাঠতুতো ভাই-বোন আছে নিশ্চয়ই।'

'আপন বোন একটি আছেন, দিদি। স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করেন ; ধানবাদে পোস্টেড। জ্যাঠার ছেলে নেই, তিন মেয়ে, তিনজনের স্বামীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিজয়া দশমীতে একটি করে পোস্টকার্ড—ব্যস্। আসলে রক্তের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। এই যে আপনার আর তপেশের সঙ্গে আমার ইয়ে, তার সঙ্গে কি ব্লাড রিলেশনের কোনও— ?'

লালমোহনবাবুর কথা থামাতে হল, কারণ দরজায় টোকা পড়েছে। এটা যাকে বলে প্রত্যাশিত, কারণ টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল্ সাড়ে ন'টার জন্য, এখন বেজেছে ন'টা তেত্রিশ।

ভদ্রলোকের নামটা জানা ছিল টেলিফোনে—উমাশঙ্কর পুরী—এবার চেহারাটা দেখা গেল। মাঝারি হাইট, দোহারা গড়ন, পরনে ঘি রঙের হ্যান্ডলুমের স্যুট। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথার চুল কাঁচা-পাকা মেশানো, ডান দিকে সিঁথি। এই শেষের ব্যাপারটা দেখলেই কেন যেন আমার অসোয়াস্তি হয় ; মনে হয় মুখটা যেন আয়নায় দেখছি। পুরুষদের মধ্যে শতকরা একজনের বেশি ডান দিকে সিঁথি করে কিনা সন্দেহ, যদিও কারণটা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।

'আপনাকে খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে বলে মনে

হচ্ছে ?' ফেলুদা মন্তব্য করল আলাপ পর্বের পর ভদ্রলোক চেয়ারে বসতেই।

'হ্যাঁ, তা—' উমাশঙ্করের ভুরু কপালে উঠে গেল—'কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কী করে ?'

'আপনার বাঁ হাতের সব নখই পরিষ্কার করে ক্লিপ দিয়ে কাটা, তার একটি নখ এখনও কোটের পকেটের ধারে লেগে আছে, অথচ ডান হাতে দুটো নখের পরে আর বাকিগুলো...'

'আর বলবেন না !' বললেন মিঃ পুরী, 'ঠিক সেই সময় একটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল ; কথা শেষ হতে দেখি, আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে গেছে।'

'যাক্ গে—এবার বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।'

'মিঃ পুরী গম্ভীর হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন। তার পর বললেন, 'মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে।

boiRboi.net

আপনার নাম আমি শুনেছি ভগওয়ানগড়ের রাজার কাছ থেকে। শুধু নাম নয়, প্রশংসা। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'আমি তাতে গর্ব বোধ করছি।'

'এখন কথা হচ্ছে কি—' মিঃ পুরী থামলেন। তাঁর মধ্যে এক ইতস্তত ভাব লক্ষ করছিলাম। তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটা হচ্ছে কি—একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ; সেইটে যাতে না ঘটে, তাই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। সেটা পাওয়া যাবে কি ?'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা বলছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত আমি মতামত দিতে পারছি না।'

শ্রীনাথ এই সময় চা-চানাচুর-বিস্কুট এনে রাখাতে কথায় একটু বিরতি পড়ল। তার পর মিঃ পুরী একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনি রূপনারায়ণগড় স্টেটের নাম শুনেছেন ?'

'নামটা চেনা-চেনা লাগছে', বলল ফেলুদা, 'উত্তর প্রদেশে কি ?'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিঃ পুরী। 'আলিগড় থেকে ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে। আমি যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিং। আমি ছিলাম এস্টেটের ম্যানেজার। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলেও তখনও এসব নেটিভ স্টেটের উপর তত চাপ পড়েনি ; রাজারা রাজাই ছিলেন। চন্দ্রদেও-এর বছর চুয়ান্ন বয়স, কিন্তু তখনও সিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, টেনিস খেলেন, পোলো খেলেন, প্রৌঢ়ত্বের কোনও লক্ষণ নেই। একটি ব্যারাম তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, কিন্তু সেটা যে হঠাৎ এমন আকার ধারণ করবে, সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। হাঁপানি। সে যে কী হাঁপানি, সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। একটা জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষকে ছ' মাসের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত হতে এই প্রথম দেখলাম। কোনও ওষুধে কোনও কাজ দিল না। হয়তো দু' দিন দেয়, আবার যেই কে সেই।

'সেই সময় খবর এল, হরিদ্বারে নাকি এক ভদ্রলোক থাকেন, নাম ভবানী উপাধ্যায়, তিনি নাকি হাঁপানির অব্যর্থ ওষুধ জানেন। বহু রুগী তাঁর ওষুধে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছে।

'আমি নিজেই চলে গেলাম হরিদ্বার। ঠিকানা জানা ছিল না ভদ্রলোকের, কিন্তু খোঁজ পেতে অসুবিধা হল না, কারণ ওঁকে অনেকেই চেনে। সাদাসিধা মানুষ, ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন, আমাকে যথেষ্ট খাতির করে তাঁর তক্তপোশে বসালেন। তার পর সব শুনেটুনে বললেন—আমি যাব আপনার সঙ্গে, রাজাকে ওষুধ দেব ; সারবার হলে দশ দিনের মধ্যে সারবে, না হলে নয়। সেই দশ দিন আমি ওখানে থাকব। ওষুধে কাজ না দিলে আমি কোনও পয়সা নেবো না।

'বললে বিশ্বাস করবেন না মিঃ মিটার, দশ দিন নয়, সাত দিন নয়, তিন দিনের মধ্যে রাজার হাঁপানি উধাও। এমন যে ঘটতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উপাধ্যায় বললেন তাঁর ওষুধের দাম পঞ্চাশ টাকা। রাজাকে বলতে তিনি তো কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন—আমি মরতে বসেছিলাম, উনি এসে আমাকে নতুন জীবন দান করলেন, আর তার দাম হল কিনা পঞ্চাশ টাকা ?

'এখানে বলে রাখি যে রাজা চন্দ্রদেও মানুষটা একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর শোক, তাঁর আনন্দ, তাঁর ক্রোধ, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য—সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে মাত্রায় অনেকটা বেশি ছিল। পঞ্চাশ টাকার বদলে উনি উপাধ্যায়কে যেটা দিলেন, সেটা একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার বালগোপাল। জিনিসটা আসলে একটা পেনডেন্ট বা লকেট—লম্বায় ইঞ্চি তিনেক। তখনকার দিনে সেটার দাম পাঁচ-সাত লাখ টাকা।'

একটু ফাঁক পেয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'উপাধ্যায় নিলেন সেই লকেট ?'

'সেই কথাই তো বলছি', বললেন উমাশঙ্কর পুরী। উপাধ্যায় বললেন—আমি সাদাসিধে মানুষ, আমাকে এমন বিপাকে ফেলছেন কেন ? এত দামি একটা জিনিস আমার কাছে থাকবে, সেটা লোকে আমার বলে বিশ্বাস করবে কেন ? সবাই ভাববে আমি চুরি করেছি।

'রাজা বললেন—কারুর তো জানার দরকার নেই। আমরা তো আর খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করতে যাচ্ছি না। আর নেহাতই

যদি কেউ জেনে ফেলে, তার জন্য আমি আমার নিজের সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম। এর পরে তো আর কারুর কিছু বলার নেই।

'উপাধ্যায় বলল—তাই যদি হয়, তা হলে আমি মাথা পেতে নেব আপনার এ পারিতোষিক।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি, রাজা, এবং উপাধ্যায়—এই তিনজন ছাড়া আর কেউ কি ঘটনাটা জানত ?'

'আমি সত্যি কথা বলব', বললেন উমাশঙ্কর পুরী, 'রাজা নিজে যদি খেয়ালবশে কাউকে বলে থাকেন তো সে আমি জানি না ; ব্যাপারটা জানত রাজা, রানি এবং দুই রাজকুমার—সূরয ও পবন। বড় কুমার সূরয অতি চমৎকার ছেলে, রাজপরিবারে এমন দেখা যায় না। তার বয়স তখন বাইশ-তেইশ। ছোট কুমারের বয়স পনের। এ ছাড়া জানতাম আমি, আমার স্ত্রী আর আমার ছেলে দেবীশঙ্কর—তার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। ব্যস্, আর কেউ না। আর এটাও আপনি খেয়াল করে দেখুন মিঃ মিটার—এ খবর কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কোনও কাগজে বেরোয়নি। আপনি তো সাংবাদিকদের জানেন ; তারা এর গন্ধ পেলে কি ছেড়ে দিত ?'

'সে কথা ঠিক', বলল ফেলুদা, 'ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'যাই হোক, এবার আমি এগিয়ে আসছি বর্তমানের দিকে। রাজা চন্দ্রদেও সিং বেঁচেছিলেন আর বছর বারো। তার পর সূরযদেও রাজা হলেন। রাজা মানে, তখন তো আর রাজা কথাটা ব্যবহার করা চলে না ; বলতে পারেন উনিই হলেন কর্তা।'

'আপনি তখনও ম্যানেজার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ; এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি যাতে ব্যবসা ইত্যাদির সাহায্যে রূপনারায়ণগড়ের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, সূরযদেওর এ সব দিকে কোনও উৎসাহ নেই। তার নেশা হচ্ছে বই। সে দিনের মধ্যে ষোল ঘণ্টা তার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। সেখানে আমার একার চেষ্টায় আমি কী করতে পারি ? ফলে আর্থিক দিক দিয়ে স্টেটের অবস্থা ক্রমেই

খারাপ হয়ে আসতে থাকে।'

'আপনার নিজের ছেলেও তো তত দিনে বড় হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দেবীকে অবশ্য আমি আগেই আলিগড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই। সে আর রূপনারায়ণগড়ে ফেরেনি। দিল্লী গিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছে।'

'আপনার কি ওই একই ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যাই হোক্, আমার নিজের অনেকবার মনে হয়েছে যে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে আমার নিজের দেশ মোরাদাবাদে গিয়ে একটা কিছু করি, কিন্তু মায়া কাটাতে পারছিলাম না।'

মিঃ পুরী এবার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এবার আমি আসল ঘটনায় আসছি; আপনার ধৈর্যচ্যুতি হয়ে থাকলে আমায় মাপ করবেন।

'সাত দিন আগে, অর্থাৎ ঊনত্রিশে এপ্রিল, শনিবার রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার পবনদেও সিং হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হয়। তার প্রথম কথাই হল—আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর নাম ও তাঁর হরিদ্বারের ঠিকানাটা আমার চাই।

'স্বভাবতই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর কোনও অসুখ করেছে কি না। পবন বলল, না, তা নয়; সে একটা টেলিভিশনের ছবি করছে, তার জন্য তার এই ভদ্রলোককে দরকার।

'পবন যে ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সেটা আমি জানতাম, কিন্তু সে যে টেলিভিশন নিয়ে মেতে উঠেছে, সে খবর জানতাম না। আমি বললাম—তুমি কি তোমার ছবিতে সে ভদ্রলোককে দেখাতে চাও? সে বললে—অবশ্যই। শুধু তাই নয়। বাবা তাকে যে লকেটটা দিয়েছিলেন সেটাও দেখাব। একটা অসুখ সারিয়ে এ রকম বকশিস আর কেউ কোথাও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

'তখন আমার পবনকে বলতেই হল যে, উপাধ্যায় তাঁর এই পারিতোষিকের ব্যাপারটা একেবারেই প্রচার করতে চাননি। পবন বলল—ত্রিশ বছর আগে একটা লোক যে-কথা বলেছে, আজও যে সে তাই বলবে, এমন কোনও কথা নেই। সমস্ত পৃথিবীর কাছে

নানা রকম তথ্য পরিবেশন করা টেলিভিশনের একটা প্রধান কাজ। আপনি আমাকে নাম ঠিকানা দিন। ওঁকে রাজী করাবার ভার আমার।

'কী আর করি ; বাধ্য হয়ে উপাধ্যায়ের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলাম ; সে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।'

'উপাধ্যায়ের বয়স এখন আন্দাজ কত হবে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'তা সত্তর-বাহাত্তর তো হবেই। রূপনারায়ণগড়ে যখন এসেছিল, তখন তার যৌবন পেরিয়ে গেছে।'

ফেলুদা উমাশঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আপনি কি শুধু এই ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলেই চিন্তিত হচ্ছেন ?'

মিঃ পুরী মাথা নাড়লেন।

'না মিঃ মিটার। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। শুধু যদি তাই হত, তা হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমার ভয় হচ্ছে ওই লকেটটাকে নিয়ে। পবনের নতুন শখ হয়েছে টেলিভিশনের ছবি তোলার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, কাজটা খরচসাপেক্ষ। পবনের নিজের কোনও অর্থ সংগ্রহের রাস্তা আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে ওই একটি লকেট ওর সমস্ত অর্থসমস্যা দূর করে দিতে পারে।'

'কিন্তু ওই লকেটটি হাত করতে হলে তো তাকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হতে পারে।'

'তা তো বটেই।'

'পবনদেও ছেলে কেমন ?'

'সে বাপের কিছু দোষ-গুণ দুটোই পেয়েছে। পবনের মধ্যেও একটা বেপরোয়া দিক আছে। ভাল খেলোয়াড়। ছবি ভাল তোলে। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দরাজ মনের পরিচয় পেয়েছি। ওকে চেনা ভারি শক্ত। যেমন ছিল ওর বাপকে।'

'তা হলে আপনি আমার কাছে কী চাইছেন ?'

'আমি চাইছি, আপনি দেখুন যাতে এই অসদুপায়টি অবলম্বন না করা হয়।'

'পবনদেও কি হরিদ্বার যাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে তাঁর যেতে একটু দেরি হবে—অন্তত পাঁচ-সাত দিন, কারণ এখন উনি প্যালেসের ছবি তুলছেন।'

'আমাদেরও যেতে গেলে সময় লাগবে, কারণ তার আগে তো ট্রেনে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

'তা বটে।'

'কিন্তু ধরুন যদি আমি কেসটা নিই, আমি আপনাদের ছোট কুমারকে চিনছি কি করে?'

'সে ব্যবস্থাও আমি করে এনেছি। দিল্লীর একটি সাপ্তাহিক কাগজে কুমারের এই রঙীন ছবিটা বেরিয়েছিল গত মাসে। একটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিল। এটা আপনি রাখুন। আর ইয়ে, আপনাকে আগাম কিছু... ?'

'আমি হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিই', বলল ফেলুদা। 'কেস সফল না হলেও সেটা ফেরত দিই না, কারণ সফল না হওয়াটা অনেক সময় গোয়েন্দার অক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। সফল হলে আমি আরও এক হাজার টাকা নিই।'

'বেশ। আপনাকে এখনই কিছু বলতে হবে না। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি কী স্থির করেন, বিকেল চারটে নাগাদ ফোন করে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হলে আমি নিজে এসে আপনাকে আগাম টাকা দিয়ে যাবো।'

২

ফেলুদা যে কেসটা নেবে, সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। আজকাল আমরা মক্কেলের কথাবার্তা হংকং থেকে কেনা একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারে তুলে রাখি। মিঃ পুরীর বেলাতে ওঁর অনুমতি নিয়ে তাই করেছিলাম। ফেলুদা দুপুরে সেই সব কথাবার্তা প্লে ব্যাক করে খুব মন দিয়ে শুনে বলল, 'কেসটা নেবার সপক্ষে

দুটো যুক্তি রয়েছে ; একটা হল এর অভিনবত্ব, আর দুই হল—গোয়েন্দগিরির প্রথম যুগে দেখা হরিদ্বার-হৃষীকেশটা আর একবার দেখার লোভ।'

বাদশাহী আংটির ক্লাইম্যাক্স্-টা যে হরিদ্বারেই শুরু হয়েছিল, সেটা আমিও কোনও দিন ভুলব না।

পার্ক হোটেলে টেলিফোন করে কেসটা নিচ্ছে বলে ফেলুদা মিঃ পুরীকে জানিয়ে দিয়েছিল। আর মিঃ পুরীও আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করে ফেলুদা ডুন এক্সপ্রেসে আমাদের বুকিং-এর জন্য জানিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দু' দিন পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। রূপনারায়ণগড় থেকে মিঃ পুরীর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—

'রিকোয়েস্ট ড্রপ কেস। লেটার ফলোজ।'

ড্রপ কেস! এ তো তাজ্জব ব্যাপার! এমন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় কখনও হয়নি।

মিঃ পুরীর চিঠিও এসে গেল দু' দিন পরে। মোদ্দা কথা হচ্ছে—ছোটকুমার মত পালটেছে। সে হরিদ্বার-হৃষীকেশ গিয়ে ছবি তুলবে, তাতে উপাধ্যায় থাকবেন, কিন্তু তাতে শুধু দেখানো হবে তিনি কিভাবে নিজের তৈরি ওষুধ দিয়ে স্থানীয় লোকের চিকিৎসা করেন। রূপনারায়ণগড়ের রাজার চিকিৎসাও যে উপাধ্যায় করেছিলেন, সেটা ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।

ফেলুদা টেলিগ্রামে উত্তর দিল—'ড্রপিং কেস, বাট গোইং অ্যাজ পিলগ্রিমস।' অর্থাৎ কেস বাতিল করছি, কিন্তু তীর্থযাত্রী হিসেবে যাচ্ছি।

আমি জানি, ফেলুদা ও কথা লিখলেও ও নিজের গরজেই চোখ-কান খোলা রাখবে, আর তদন্তের কোনও কারণ দেখলে তদন্ত করবে। সত্যি বলতে কি, ভবানী উপাধ্যায় আর ছোটকুমার পবনদেও সিং—এই দুটি লোককেই আমার খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা তিনজন এখন ডুন এক্সপ্রেসের একটা থ্রি টিয়ার কম্পার্টমেন্টে বসে আছি। ফৈজাবাদ স্টেশনে মিনিট দু'-এক হল গাড়ি থেমেছে, আমরা ভাঁড়ের চা কিনে খাচ্ছি।

'আপনি যে বলছিলেন হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে?' ফেলুদা তার সামনের সিটে বসা লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করল।

'আমার ঠাকুরদা একবার সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যান', বললেন লালমোহনবাবু, 'ইনক্লুডিং হরিদ্বার। তখন আমার বয়স দেড়; কাজেই নো মেমারি।'

এবার অন্য দিক থেকে একটা প্রশ্ন এল।

'আপনারা কি শুধু হরিদ্বারই যাচ্ছেন, না ওখান থেকে এ দিকে ও দিকেও ঘুরবেন?'

এ-প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবুর পাশে বসা এক বৃদ্ধ। মাথায় সামান্য চুল যা আছে তা সবই পাকা, কিন্তু চামড়া টান, দাঁত সব ওরিজিন্যাল, আর চোখের দু' পাশে যে খাঁজগুলো রয়েছে, সেগুলো যেন হাসবার জন্য তৈরিই হয়ে আছে।

'হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল', বলল ফেলুদা। 'সেটা হয়ে গেলে পর...দেখা যাক্—'

'কী বলছেন মশাই!' বৃদ্ধের চোখ কপালে উঠে গেছে—'অ্যাদ্দূর এসে কেদার-বদ্রীটা দেখে যাবেন না? বদ্রীনাথ তো সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। কেদারের শেষের ক'টা মাইল অবিশ্যি এখনও বাস-রুট হয়নি। তবে এও ঠিক যে কেদারের কাছে বদ্রী কিছুই নয়। যদি পারেন তো একবার কেদারটা ঘুরে আসবেন। শেষের হাঁটা পথটুকু আর—' ফেলুদা আর আমার দিকে তাকিয়ে—'আপনাদের বয়স কী! আর—' লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে— 'এনার জন্য তো ডাণ্ডি আর টাট্টু ঘোড়াই আছে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?'

শেষের প্রশ্নটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকেই করা হল। লালমোহনবাবু হাতের ভাঁড়টায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, তবে থর ডেজার্টে একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের

অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আপনার হয়েছে কি ?’

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।—‘তা হয়নি। আমার চরবার ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশ। তেইশবার এসেছি কেদার-বদ্রী। ভক্তি-টক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়, তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিগ্রহের দরকার হয় না।’

ভদ্রলোকের নাম পরে জেনেছিলাম মাখনলাল মজুমদার। শুধু কেদার-বদ্রী নয়, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুকিতাল—এ সবও এঁর দেখা আছে। নেহাত একটা সংসার আছে, না হলে হিমালয়েই থেকে যেতেন। অবিশ্যি এটাও বললেন যে, আজকের বাস-ট্যাক্সিতে করে যাওয়া আর আগেকার দিনের পায়ে হেঁটে যাওয়া এক জিনিস নয়। বললেন, ‘আজকাল তো আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা তৈরি করে তো আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে যা বোঝায়, সে রকম দৃশ্য এখনও অফুরন্ত আছে।’

ভোর ছ’টায় ডুন এক্সপ্রেস পৌঁছাল হরিদ্বার।

সেই বাদশাহী আংটির সময় যেমন দেখেছিলাম, পাণ্ডার উপদ্রবটা যেন তার চেয়ে একটু কম বলে মনে হল। স্টেশনেই একটা রেস্টোরান্টে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। উপাধ্যায়ের নাম এখানে অনেকেই জানে আন্দাজ করেই বোধ হয় ফেলুদা রেস্টোরান্টের ম্যানেজারকে তাঁর হদিস জিগ্যেস করল।

উত্তর শুনে বেশ ভালরকম একটা হোঁচট খেলাম।

ভবানী উপাধ্যায় তিন-চার মাস হল হরিদ্বার ছেড়ে রুদ্রপ্রয়াগ চলে গেছেন।

‘তাঁর বিষয়ে আরও খবর কে দিতে পারে, বলতে পারেন ?’ জিগ্যেস করল ফেলুদা। উত্তর এল—‘এখনকার খবর পেতে হলে রুদ্রপ্রয়াগ যেতে হবে, আর যদি আগেকার খবর চান তো কান্তিভাই পণ্ডিতের কাছে যান। উনি ছিলেন উপাধ্যায়জীর বাড়িওয়ালা। তিনি সব খবর জানবেন।’

‘তিনিও কি লক্ষ্মণ মহল্লাতেই থাকেন ?’

'হ্যাঁ হ্যাঁ। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। সবাই ওঁকে চেনে ওখানে। জিগ্যেস করলেই বলে দেবে।'

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কান্তিভাই পণ্ডিতের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, বেঁটেখাটো চোখাচাখা ফরসা চেহারা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখে বাইফোক্যাল চশমা। আমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজ করছি জেনে উনি রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ? আর একজন তো ওঁর খোঁজ করে গেলেন এই তিন-চার দিন আগে।'

'তাঁর চেহারা মনে আছে আপনার ?'

'তা আছে বইকি।'

'দেখুন তো এই চেহারার সঙ্গে মেলে কিনা।'

ফেলুদা পকেট থেকে ছোটকুমার পবনদেও-এর ছবিটা বার করে দেখাল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই লোক', বললেন কান্তিভাই পণ্ডিত। 'আমি রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা দিয়ে দিলাম তাঁকে।'

'সে ঠিকানা অবিশ্যি আমরাও চাই', বলে ফেলুদা তার একটা কার্ড বার করে দিল মিঃ পণ্ডিতের হাতে।

কার্ডটা পাওয়ামাত্র মিঃ পণ্ডিতের হাবভাব একদম বদলে গেল। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার আমাদের সকলকে চেয়ার, মোড়া আর তক্তপোশে ভাগাভাগি করে বসতে দেওয়া হল।

'কেয়া, কুছ গড়বড় হুয়া মিঃ মিত্তর ?'

'যত দূর জানি, এখনও হয়নি,' বলল ফেলুদা। 'তবে হবার একটা সম্ভাবনা আছে। এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিঃ পণ্ডিত ; আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে খুব উপকার হবে।'

'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

'মিঃ উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান

boiRboi.net

জিনিস ছিল ?'

মিঃ পণ্ডিত একটু হেসে বললেন, 'এ প্রশ্নটাও আমাকে দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। আমি মিঃ সিংকে যা বলেছি, আপনাকেও তাই বলছি। মিঃ উপাধ্যায়ের একটা থলি উনি আমার সিন্দুকে রাখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যে কী ছিল, সেটা আমি কোনও দিন দেখিনি বা জিগ্যেসও করিনি।'

'সেটা উনি রুদ্রপ্রয়াগ নিয়ে গেছেন ?'

'ইয়েস স্যার। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং—আপনি ডিটেকটিভ, তাই এ খবর আমি আপনাকে বলছি, আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে—পাঁচ-ছে মহিনে আগে দুজন লোক—তখনও মিঃ উপাধ্যায় ছিলেন এখানে—একজন সিন্ধী কি মাড়োয়ারি হবে—হি লুকড এ রিচ ম্যান—অ্যান্ড অ্যানাদার ম্যান—দুজন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথা হচ্ছিল সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। এক ঘণ্টার উপর ছিল। তারা যাবার পর উপাধ্যায় একটা কথা আমাকে বলে—পণ্ডিতজী, আজ আমি একটি রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভের মধ্যে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।'

'আপনি উপাধ্যায়ের এই সম্পত্তির কথা আর কাউকে বলেননি ?'

'দেখুন মিঃ মিত্তর, ওঁর যে একটা কিছু লুকোবার জিনিস আছে, সেটা অনেকেই জানত। আর সেই নিয়ে আড়ালে ঠাট্টাও করত। আমার আবার সন্ধ্যাবেলায় একটু নেশা করার অভ্যাস আছে, হয়তো কখনও কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু উপাধ্যায়জীকে সকলে এখানে এত ভক্তি করত যে, সিন্দুকে কী আছে সেই নিয়ে কেউ কোনও দিন মাথা ঘামায়নি।'

'এই যে রুদ্রপ্রয়াগ গেলেন তিনি, এর পিছনে কোনও কারণ আছে ?'

'আমাকে বলেছিলেন, গঙ্গার ঘাটে ওঁর একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে উপাধ্যায়ের মধ্যে এক মানসিক চেঞ্জ আসে। আমার মনে হয়, চেঞ্জটা বেশ সিরিয়াস ছিল। কথা-টথা সব কমিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় চুপচাপ বসে

ভাবতেন।'

'ওঁর ওষুধপত্তর কি উনি সঙ্গেই নিয়েছিলেন?'

'ওষুধ বলতে তো বেশি কিছু ছিল না: কয়েকটা বৈয়াম, কিছু শিকড়-বাকড়, কিছু মলম, কিছু বড়ি—এই আর কি। এগুলো সবই উনি নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আমার নিজের ধারণা: উনি ক্রমে পুরোপুরি সন্ন্যাসের দিকে চলে যাবেন।'

'উনি বিয়ে করেননি?'

'না। সংসারের প্রতি ওঁর কোনও টান ছিল না। যাবার দিন আমাকে বলে গেলেন—ভোগের রাস্তা, ত্যাগের রাস্তা, দুটোই আমার সামনে ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিলাম।'

'ভাল কথা,' বলল ফেলুদা, 'আপনি যে বললেন, ওঁর রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা আপনি দিয়ে দিয়েছেন ওই ভদ্রলোকটিকে—আপনি ঠিকানা পেলেন কি করে?'

'কেন, উপাধ্যায় আমাকে পোস্টকার্ড লিখেছে সেখান থেকে।'

'সে পোস্টকার্ড আছে?'

'আছে বইকি।'

মিঃ পণ্ডিত তাঁর পিছনের একটা তাকে রাখা বাক্সের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা পোস্টকার্ড বার করে ফেলুদাকে দিলেন। হিন্দিতে লেখা আট-দশ লাইনের চিঠি। সেটা ফেলুদা বার বার পড়ল কেন, আর পড়ে বিড়বিড় করে দু' বার 'মোস্ট ইন্টারেস্টিং' বলল কেন, সেটা বলতে পারব না।

মিঃ পণ্ডিত আমাদের একটা ভাল ট্যাক্সির কথা বলে দিলেন। আপাতত রুদ্রপ্রয়াগ, তার পর যেখানেই যাওয়া দরকার—সেখানেই যাবে। গাড়োয়ালি ড্রাইভারের নাম যোগীন্দররাম। লোকটিকে দেখে আমাদের ভাল লাগল। আমরা বললাম, বারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে রওনা দেব হৃষীকেশ থেকে। হৃষীকেশ এখান থেকে মাইল পনের। হরিদ্বারে কিছুই দেখবার নেই, গঙ্গার ঘাটটা পর্যন্ত আগের বার যা দেখেছিলাম, তেমন আর নেই। বিশ্রী দেখতে সব নতুন বাড়ি উঠেছে আর তাদের দেওয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন। হৃষীকেশে যাওয়া দরকার, কারণ আমাদের রুদ্রপ্রয়াগে থাকার

বন্দোবস্ত করতে হবে। ইচ্ছে করলে ধরমশালায় থাকা যায়; এখানে প্রায় সব শহরেই বহু দিনের পুরনো নাম-করা কালীকমলী ধরমশালা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা জানে যে রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার ও সব ধরমশালায় থাকবে না।

আমরা হৃষীকেশে গিয়ে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের রেস্ট হাউসে একটা ডবল-রুম পেয়ে গেলাম। ওরা বলল যে, তিনজন লোক হলে বাড়তি একটা খাটিয়া পেতে দেবে। বারোটা নাগাদ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম রুদ্রপ্রয়াগ। কয়েক মাইল যাবার পর ডাইনে পড়ল লছমনঝুলা। এখানেও দু' দিকে বিশ্রী বিশ্রী নতুন বাড়ি আর হোটেল হয়ে জায়গাটার মজাই নষ্ট করে দিয়েছে। তাও বাদশাহী আংটির শেষ পর্বের ঘটনা মনে করে গা-টা বেশ ছমছম করছিল।

রুদ্রপ্রয়াগ জরুরী দুটো কারণে। এক হল জিম করবেট। 'দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' যে পড়েছে, সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না কী আশ্চর্য ধৈর্য, অধ্যবসায়, আর সাহসের সঙ্গে করবেট মেরেছিল এই মানুষখেকোকে আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে। আমাদের ড্রাইভার যোগীন্দর বলল, সে ছেলেবেলায় তার বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে এই বাঘ মারার গল্প। করবেট যেমন ভালবাসত এই গাড়োয়ালিদের, গাড়োয়ালিরাও ঠিক তেমনই ভক্তি করত করবেটকে।

রুদ্রপ্রয়াগের আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—এখান থেকে বদ্রী ও কেদার দু' জায়গাতেই যাওয়া যায়। দুটো নদী এসে মিশেছে রুদ্রপ্রয়াগে—মন্দাকিনী আর অলকনন্দা। অলকনন্দা ধরে গেলে বদ্রীনাথ আর মন্দাকিনী ধরে গেলে কেদারনাথ। বদ্রীনাথের শেষ পর্যন্ত বাস যায়; কেদারনাথ যেতে বাস থেমে যায় ১৪ কিলোমিটার আগে গৌরীকুণ্ডে। সেখান থেকে হয় হেঁটে, নাহয় ডাণ্ডি বা টাট্টু ঘোড়া ভাড়া করে যাওয়া যায়।

হৃষীকেশ থেকে বেরিয়েই বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পথ আরম্ভ হয়ে গেল। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে—স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে গঙ্গা মাঈ। হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিলোমিটার;

পাহাড়ের রাস্তায় ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার করে গেলেও সেই সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো যাবে না। তা ছাড়া পথে তিনটে জায়গা পড়ে—দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর, আর শ্রীনগর। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী নয়, গাড়ওয়াল জেলার রাজধানী।

পাহাড় ভেদ করে বনের মধ্য দিয়ে কেটে তৈরি-করা রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠছে, আবার ঘুরে ঘুরে নামছে। মাঝে মাঝে গাছপালা সরে গিয়ে খোলা সবুজ পাহাড় বেরিয়ে পড়ছে, তারই কোলে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

দৃশ্য সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার মন কেবলই বলছে ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে একটা মহামূল্য লকেট রয়েছে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে এমন একটা জিনিস থাকবে, আর তাই নিয়ে কোনও গোলমাল হবে না, এটা যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া মিঃ পুরীর একবার ফেলুদাকে কাজের ভার দিয়ে, তার পরই টেলিগ্রাম করে বারণ করাটাও কেমন যেন গণ্ডগোল লাগছে। অবশ্য তিনি চিঠিতে কারণ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ জিনিস এর আগে কক্ষনো হয়নি বলেই বোধহয় একটা খট্‌কা মন থেকে যাচ্ছে না।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্‌ করছিলেন, এবার বললেন, 'আমি ভূ-গণ্ডগোল আর ইতিহাস-ফাঁসে চিরকালই কাঁচা ছিলাম ফেলুবাবু—সেটা তো আপনি আমার লেখা পড়েও অনেক বার বলেছেন। তাই, মানে, আমরা ভারতবর্ষের এখন ঠিক কোনখানে আছি, সেটা একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত বোধ করব।'

ফেলুদা তার বার্থোলোমিউ কোম্পানির বড় ম্যাপটা খুলে বুঝিয়ে দিল—'এই যে দেখুন হরিদ্বার। আমরা এখন যাচ্ছি এই দিকে। এই যে রুদ্রপ্রয়াগ। অর্থাৎ পুবে নেপাল, পশ্চিমে কাশ্মীর, আমরা তার মধ্যিখানে, বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ। এই বারে ক্লিয়ার।'

পথে শ্রীনগরে থেমে চা খেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় পাঁচটা। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল পোস্টাপিস থানা সব মিলিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বেশ বড় শহর। করবেট যেখানে লেপার্ডটা মেরেছিল, সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত নাকি সাইনবোর্ড ছিল, কিন্তু যোগীন্দর বলল, সেটা নাকি কয়েক বছর হল ভেঙে গেছে।

আমরা সোজা চলে গেলাম গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসে। শহরের একটু বাইরে সুন্দর নিরিবিলি জায়গায় তৈরি রেস্ট হাউসে গিয়ে যে খবরটা প্রথমেই শুনলাম, সেটা হল : কেদারনাথের রাস্তায় এক জায়গায় ধস নামাতে নাকি বাস চলাচল বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল, আজই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এতে যে আমাদের একটা বড় রকম সুবিধে হয়েছিল, সেটা পরে বুঝেছিলাম।

ম্যানেজার মিঃ গিরিধারী ফেলুদাকে না চিনলেও আমাদের খুব খাতির করলেন। উনি নাকি হিন্দি অনুবাদে বহু বাংলা উপন্যাস পড়ে খুব বাঙালি-ভক্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর ফেভারিট অথরস হচ্ছেন বিমল মিত্র আর শংকর।

মিঃ গিরিধারী ছাড়াও আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন রেস্ট হাউসে, তিনি কেদারের পথ বন্ধ বলে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। ইনি কিন্তু ফেলুদাকে দেখে চিনে ফেললেন। বললেন, 'আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার অনেক কেসের খবর জানি ; সেভেনটি নাইনে এলাহাবাদে সুখতঙ্কর মার্ডার কেসে আপনার ছবি বেরিয়েছিল নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকায়। সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি। আমার নাম কৃষ্ণকান্ত ভার্গব। আই অ্যাম ভেরি প্রাউড টু মিট ইউ, স্যার।'

ভদ্রলোকের বছর চল্লিশেক বয়স, চাপ-দাড়ি, মাঝারি গড়ন। মিঃ গিরিধারী স্বভাবতই ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন—'দেয়ার ইজ নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ ?'

'ট্রাব্‌ল সর্বত্রই হতে পারে, মিঃ গিরিধারী। তবে আমরা এসেছি একটা অন্য ব্যাপারে। আপনাদের এখানে ভবানী উপাধ্যায় নামে

একজন ভদ্রলোক—'

'উপাধ্যায় তো এখানে নেই', বলে উঠলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। 'আমি তো ওঁকে নিয়েই একটা স্টোরি করব বলে এখানে এসেছি। হরিদ্বারে গিয়ে শুনলাম, উনি রুদ্রপ্রয়াগ গেছেন ; এখন এখানে এসে শুনছি তিনি খুব সম্ভবত কেদারনাথ গেছেন। আমি তাই কাল সকালে কেদার যাচ্ছি ওঁর খোঁজে। হি ইজ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার, মিঃ মিটার।'

'আমি অবিশ্যি ওঁর অসুখ সারানোর কথা শুনেছি', বলল ফেলুদা। তার পর লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আমার এই বন্ধুটির মাঝে মাঝে একটা মস্তিষ্কের ব্যারামের মতো হয়। ভুল বকেন, সামান্য ভায়োলেন্সও প্রকাশ পায়। তাই একবার ওঁকে দেখাব ভাবছিলাম। কলকাতার অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথিতে কোনও কাজ দেয়নি।'

লালমোহনবাবু প্রথমে কেমন থতমত খেয়ে, তার পর ফেলুদার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্য মুখে একটা হিংস্র ভাব আনার চেষ্টা করলেন, যেটা আমাদের একটা নেপালি মুখোশ আছে, সেটার মতো দেখাল।

'তা হলে আপনাদের এই কেদার-বদ্রী যাওয়া ছাড়া গতি নেই', বললেন মিঃ ভার্গব। 'আমি বদ্রী গিয়ে ওঁকে পাইনি। অবিশ্যি উনি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, তাই নামও হয়তো বদলে নিয়েছেন।'

এই সময় রেস্ট হাউসের গেটের বাইরে একটা আমেরিকান গাড়ি থামল, আর তার থেকে তিনজন ভদ্রলোক নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এদের যিনি দলপতি, তাঁকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না, কারণ তাঁরই রঙিন ছবি রয়েছে ফেলুদার কাছে। ইনি হলেন রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন পবনদেও সিং। অন্য দু'জন নির্ঘাত এঁর চামচা।

আমরা পাঁচজন এতক্ষণ বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এবার আরও তিনজন লোক বাড়ল। পবনদেও একটা বেতের চেয়ার দখল করে বললেন, 'আমরা বদ্রীনাথ থেকে আসছি। নো লাক্‌। উপাধ্যায় ওখানে নেই।'

মিঃ গিরিধারী বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমার এখানে যতজন অতিথি এসেছেন, সকলেই উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন, এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন কারণে। আপনি ওঁর ছবি তুলবেন, মিঃ ভার্গব ওঁকে ইন্টারভিউ করবেন, আর মিঃ মিটার তাঁর বন্ধুর চিকিৎসা করাবেন।'

পবনদেওর দলের সঙ্গে টেলিভিশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। ক্যামেরাটা পবনদেওর নিজের হাতে, আর তাতে লাগানো একটা পেল্লায় লেন্স।

'ওটা তো আপনার টেলি-লেন্স দেখছি', ফেলুদা মন্তব্য করল।

পবনদেও ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'হ্যাঁ। সকালের রোদে বদ্রীনাথের চুড়ো থেকে বরফ গলে গলে পড়তে দেখা যায়। অ্যাকচুয়েলি আমার পুরো সরঞ্জাম একজনেই হ্যান্ডল করতে পারে। ক্যামেরা, সাউন্ড, সব কিছু। আমার এই দুই বন্ধু থাকবেন গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। বাকিটা আমি একাই তুলব।'

'তার মানে আপনিও কেদারনাথ যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ছি।'

'আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্‌ম তুলছেন?'

'হ্যাঁ। অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য। উপাধ্যায়—মানে, তার সঙ্গে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-কেদার-বদ্রীও কিছু থাকবে। তবে সেন্ট্রাল ক্যারেকটার হবেন ভবানী উপাধ্যায়। আশ্চর্য চরিত্র। উনি আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা একটা মিরাক্‌ল।'

আমি আড়চোখে পবনদেওকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম। মিঃ উমাশঙ্কর পুরী যে চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন, তার সঙ্গে কোনও মিল পাচ্ছিলাম না। ফেলুদা দেখলাম উমাশঙ্কর পুরীর কোনও উল্লেখ করল না।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছানোর সময় একটা হোটেল দেখে রেখেছিলাম, সেইখানেই আমরা তিনজন গিয়ে ডিনার সারলাম। বয় যখন অর্ডার নিতে এল, তখন লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ তেজের সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ঘুঁষি মেরে একটা গোলমরিচদান উল্টে দিয়ে বললেন, তিনি আরমাডিলোর ডিমের ডালনা খাবেন। তখন

ফেলুদার তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, যাদের কাছে ওঁর অসুখের কথাটা বলা হয়েছে, শুধু তাদের সামনেই এই ধরনের ব্যবহার চলতে পারে, অন্য সময় নয়। বিশেষ করে ভায়োলেন্সটা যার-তার সামনে দেখাতে গেলে হয়তো লালমোনবাবুকেই প্যাদানি খেতে হবে।

'তা বটে' ; বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে অপরচুনিটি পেলে কিন্তু ছাড়ব না।'

পরদিন ভোরে উঠতে হবে বলে আমরা খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রেস্ট হাউসে চলে এলাম। কেউ কোনও হুমকি চিঠি দিয়ে যায়নি তো এই ফাঁকে ? আমাদের আবার এই জিনিসটার একটা ট্র্যাডিশন আছে। কিন্তু না ; এদিক ওদিক দেখেও তেমন কিছু পেলাম না।

আমাদের দুটো ঘর পরেই যে পবনদেও তার দুই বন্ধু আর মিঃ গিরিধারীকে নিয়ে পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছেন, সেটা গেলাসের টুং টাং আর দমকে দমকে হাসি থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

লালমোহনবাবু তাঁর বালিশে মাথা দিয়ে বললেন, 'একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে ফেলুবাবু—সে দিন আপনার ঘরে বসে পুরী সাহেব ছোটকুমার সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ মাই ডিয়ার বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা বলল, 'প্রকৃতি কিন্তু অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে। বাংলার বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি ? ময়ূরের ঠোকরানিতে যে কী তেজ আছে, তা তো আপনি জানেন। জানেন না ?'

লালমোহনবাবু তাঁর অ্যালার্ম ক্লকের চাবিটায় একটা মোচড় দিয়ে, চোখে একটা হিংস্র উন্মাদ ভাব এনে বললেন—'পোপোক্যাটাপেটাপোটোপুলটিশ !'

৪

আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ট্যাক্সির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। যোগীন্দররাম তার আগেই রেডি। আমাদের গাড়ির কাছেই পবনদেওর আমেরিকান গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছে। ও

গাড়ি আধ ঘণ্টার আগে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এও ঠিক যে, মাঝপথে ও আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।

ট্যাক্সিতে যখন উঠতে যাব, তখন ছোটকুমার হঠাৎ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বোঝাই যাচ্ছে কিছু বলার আছে।

ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাল রাত্রে মিঃ গিরিধারী নেশার ঝোঁকে আপনার আসল পরিচয়টা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বলুন।'

'উমাশঙ্কর কাকা কি আমার উপর চোখ রাখার জন্য আপনাকে এ কাজে বহাল করেছেন?'

'তিনি যদি সেটা করেও থাকতেন,' বলল ফেলুদা, 'সেটা আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না, কারণ সেটা নীতিবিরুদ্ধ এবং বোকামি হত। তবে আমি আপনাকে বলেই দিচ্ছি—আসলে আমি মিঃ পুরীর হয়ে কিছু করছি না। আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রমণ। তবে যদি কোনও গণ্ডগোল দেখি, তা হলে গোয়েন্দা হয়ে আমার নিজেকে সংযত রাখা খুবই মুশকিল হবে। ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা প্রবল কৌতূহল জেগে উঠেছে। তার একটা বিশেষ কারণ আছে, যদিও এখনও সেটা প্রকাশ করতে পারছি না।'

'আই সি।'

'এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন।'

'আপনি কি আপনার ফিল্মে সেই বিখ্যাত লকেটটি দেখাতে চান?'

'নিশ্চয়ই। অবিশ্যি সেটা যদি এখনও উপাধ্যায়ের কাছে থেকে থাকে।'

'কিন্তু উপাধ্যায়ের কাছে যে ও-রকম একটা জিনিস আছে, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে তো ওঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। এত দিন যে-ব্যাপারটা গোপন ছিল, সেটা আপনি প্রচার করে দেবেন?'

'মিঃ মিত্তির, তিনি যদি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তা হলে

boirboi.net

তো তাঁর আর ও জিনিসের কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। আমি ওঁকে বলব, একটা কোনও বড় মিউজিয়ামে ওটা দান করে দিতে। জিনিসটা চারশো বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার ছিল। কারিগরির দিক দিয়ে অতুলনীয়। উনি ওটা ডোনেট করলে চিরকাল ওঁর নাম ওই লকেটের সঙ্গে জড়িত থাকবে। মোট-কথা, ওই লকেট আমি ছবিতে দেখাচ্ছি, এবং সেখানে আপনি আশা করি কোনও বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না।'

শেষের কথাটা বেশ দাপটের সঙ্গেই বলে ছোটকুমার তাঁর গাড়িতে ফিরে গেলেন। এবার তাঁর জায়গায় সাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে বললেন, 'আপনারা তিনজন আছেন জানলে তো আপনাদের সঙ্গেই যাওয়া যেত। উপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছি, সেগুলো আপনাকে বলতে পারতাম।'

'আপনার এই তথ্যের সোর্স কী ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কিছু দিয়েছেন রূপনারায়ণগড়ের বড় কুমার সূরযদেও, কিন্তু আসল তথ্য দিয়েছে রাজবাড়ির এক আশি বছরের বুড়ো বেয়ারা। আপনি কি জানেন যে, রূপনারায়ণগড়ের রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর হাঁপানি উপাধ্যায় সারিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'তাই বুঝি ?'

'আর তার জন্য রাজা তাঁকে ইনাম দিয়েছিলেন ওয়ান অফ হিজ মোস্ট প্রেশাস অর্নামেন্টস। এ খবর এত দিন ওদের ফ্যামিলির বাইরে কেউ জানত না। আপনি ভাবতে পারেন, খবরের কাগজের কাছে এই ঘটনার কী দাম !'

'আপনি তো তা হলে রাজা হয়ে যাবেন, মিঃ ভার্গব !'

'অমি আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তর, এই লকেট উপাধ্যায়ের কাছে বেশি দিন থাকবে না। আপনি কি ছোটকুমারের কথায় বিশ্বাস করেন যে, ও শুধু টি. ভি-র ছবি তুলতে এসেছে ? আমি বলছি আপনাকে, এখানে শিগগিরই আপনার নিজের পেশার আশ্রয় নিতে হবে।'

'তার জন্য আমি সদা প্রস্তুত', বলল ফেলুদা।

মিঃ ভার্গব চলে গেলেন।

'লোকটা তো ঘোড়েল আছে, মশাই', বললেন লালমোহনবাবু।

'সাংবাদিক মাত্রেই ঘোড়েল', বলল ফেলুদা। 'গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। রাজবাড়ির পুরনো বেয়ারাকে জেরা করায় ও খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। পরিচারকেরা অনেক সময় এমন খবর রাখে, যা মনিবেরা জানতেই পারে না। কিন্তু তাও—'

'তাও কী ?' আমি জিগ্যেস করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, ফেলুদার মনটা খচখচ করছে।

'তাও যে কেন লোকটাকে দেখে অসোয়াস্তি লাগছে, তা বুঝতে পারছি না।'

আমাদের গাড়ি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়ে অলকানন্দার পাশ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ একটা টানেলে ঢুকে পড়ল। সেই টানেল থেকে যখন আবার আলোয় বেরোলাম, তখন নদী পালটে গিয়ে হয়ে গেছে 'মন্দাকিনী'। এটাই এখন চলবে আমাদের সঙ্গে কেদার পর্যন্ত। কেদার থেকেই নাকি মন্দাকিনীর উৎপত্তি।

ফেলুদার ভ্রূকুটি থেকেই বুঝতে পারছিলাম, কোনও একটা কারণে ওর বিরক্ত লাগছে। এবারে ওর কথায় সেটা বুঝতে পারলাম—

'আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে ওই গিরিধারী লোকটার উপর। ও যে এত ইরেসপনসিব্‌ল তা ভাবতে পারিনি। ছোটকুমার এখন যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো অবিশ্যি ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আশ্চর্য লাগছে জেনে যে, মিঃ পুরীর সঙ্গে ওঁর আর দ্বিতীয়বার কোনও কথাই হয়নি। সেক্ষেত্রে মিঃ পুরীর চিঠি, টেলিগ্রাম দুটোই রহস্যজনক হয়ে উঠছে। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে, কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে তার উপর। মোট-কথা, কেস ড্রপ করলেও, এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি, সেটা খুব ভাগ্যের কথা।'

গৌরীকুণ্ড রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আশি কিলোমিটার হলেও এত চড়াই-উৎরাই আর এত ঘোরপ্যাঁচের রাস্তা, যেতে বেশ সময় লাগে। পথে তিনটে শহর পড়ে। ৩০ কিলোমিটারের মাথায় অগস্ত্যমুনি, হাইট আন্দাজ ৯০০ মিটার; সেখান থেকে ৯

কিলোমিটার দূরে গুপ্তকাশী—যদিও হাইট এইটুকুর মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে ডবল। গুপ্তকাশী থেকে শোনপ্রয়াগ, যেখানে শোনগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গে এসে মিশেছে। এই শোনপ্রয়াগ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হল গৌরীকুণ্ড—যদিও সেখানে গিয়ে হাইট হয়ে যাচ্ছে সোয়া দু' হাজার মিটার।

আমাদের গরম জামা যাতে প্রয়োজন হলে সহজেই বার করে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছিলাম। বড় সুটকেস জাতীয় মাল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তা সবই গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসের লকারে রেখে দিয়ে এসেছি, ফেরার সময় আবার নিয়ে যাব। লালমোহনবাবুর টাকের জন্য উনি এর মধ্যেই টুপি পরে নিয়েছেন, যদিও আমাদের বাঙালি মাঙ্কি ক্যাপ না ; রাজস্থান থেকে কেনা কান-ঢাকা পশমের লাইনিং দেওয়া স্মার্ট চামড়ার টুপি।

অগস্ত্যমুনি পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে যখন আমরা গরম জামা পরছি, তখন আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পবনদেওর আমেরিকান ট্র্যাবার। ছোটকুমার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওয়েভ করাতে ফেলুদাকে হাত নাড়াতে হল।

আমরা শীতের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়ে আবার রওনা দিলাম। বাঁয়ে মন্দাকিনী একবার আমাদের পাশে চলে আসছে, আবার পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে সেই খাদের একেবারে নীচে। নদীর শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লালমোহনবাবুর সুর করে বলা, 'ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি পুরো কবিতাটার কেবলমাত্র ওই দুটো লাইনই জানেন।

শেষে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে লাইন যোগ করতে শুরু করে দিল—ওরে তোরা কি জানিস কেউ, কেন বাঘ এলে ডাকে ফেউ...ওরে তোরা কি শুনিস কেউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, খোকা কাঁদে ভেউ ভেউ...

গুপ্তকাশী যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে দশটা। এখানে একটা চায়ের দোকান দেখে থামতে হল। যাকে ব্রেকফাস্ট বলে

সেটা সকালে হয়নি, কাজেই খিদেটা ভালই হয়েছিল। গরম জিলিপি, কচুরি আর চা দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল।

যোগীন্দরের এক ভাই কাছেই থাকে, সে বলল তার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করে আসছে। সেই ফাঁকে লালমোহনবাবু চন্দ্রশেখর মহাদেব আর অর্ধনারীশ্বরের মন্দিরগুলো দেখতে গেলেন।

গুপ্তকাশী থেকে পাহাড়ের উপর দেখা যায় উখীমঠ। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেদারের পথ যখন বরফের জন্য বন্ধ থাকে, তখন কেদারেশ্বরের পুজো এই উখীমঠেই হয়ে থাকে।

লালমোহনবাবু মন্দির দেখে ফিরে এলেন, কিন্তু যোগীন্দরের ফেরার নাম নেই। ফেলুদা আর আমি ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক দেখছি। এমন সময় দেখি, ছোটকুমারের গাড়ি আসছে। ওরা আমাদের পেরিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল কেন ?

আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে কুমার নেমে এলেন। বললেন, গুপ্তকাশী থেকে নাকি কেদার ও বদ্রী দুটো চুড়োরই ভিউ পাওয়া যায়, তাই ওঁরা এখানে কিছুটা সময় দিলেন। তবে আর দেরি করলে চলবে না, কারণ তা হলে যাত্রীদের রওনা দেবার দৃশ্য তোলার জন্য আর আলো থাকবে না।

কিন্তু তাও যোগীন্দরের দেখা নেই। তার বদলে দেখা দিলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। তাঁর গাড়িটা আগে দেখেছিলাম, আর ভাবছিলাম তিনি এখানে এতক্ষণ কী করছেন। ভদ্রলোক বললেন যে, কেদারনাথের সেবায়েতের একজন নাকি এখানে রয়েছেন। এরা সকলেই রাওয়াল পরিবারের লোক ; এই বিশেষ রাওয়ালটির সঙ্গে নাকি একটা ইন্টারভি্উ নিতে গিয়েছিলেন মিঃ ভার্গব। এখনই আবার তাঁকে ছুটতে হবে শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড।

মিঃ ভার্গব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর পনেরোর ছেলে এসে হঠাৎ 'ফোর-থার্টি-ফোর ট্যাক্সি কি কোই পাসিঞ্জর হ্যায় ইঁহা ?' বলে হাঁক দিতেই ফেলুদা ব্যস্তভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল।

'ফোর-থ্রি-জিরো-ফোর কি পাসিঞ্জর ?'

'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে ?'

ব্যাপার আর কিছুই না, আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জখম হয়ে পড়ে আছে কিছু দূরে। ছেলেটি তাকে চেনে বলে সে খবর দিতে এসেছে।

লালমোহনবাবুকে আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দেবার জন্য রেখে, আমরা দুজন ছেলেটাকে অনুসরণ করে গেলাম।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে একটা নিরিবিলি পাড়ায় একটা কলাগাছের ধারে যোগীন্দররাম মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার মাথার পিছন দিকের ঘন কালো চুলে রক্তের ছোপ। শরীরের ওঠা-নামা থেকে বোঝা যাচ্ছে সে মরেনি, কিন্তু ফেলুদা তাও দৌড়ে গিয়ে তার নাড়ি পরীক্ষা করল।

কে এই কুকীর্তি করেছে, এ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই ; এখন দরকার ওর চিকিৎসা। ছোকরাটি বলল, এখানে হাসপাতাল দাওয়াখানা দুই-ই আছে। সে আবার গাড়িও চালাতে জানে। শেষ পর্যন্ত সে-ই নিজে ট্যাক্সি চালিয়ে যোগীন্দরকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে গেল। যোগীন্দরের মাথায় ব্যান্ডেজ, ব্যথাও আছে ; তাকে বলা হল যে এখান থেকে অন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলে, আমরা তাতেই যাব। কিন্তু সে রাজী হল না। সে নিজেই যাবে আমাদের নিয়ে।

'কে মেরেছিল, কিছু বুঝতে পেরেছিলে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নেহি', বলল যোগীন্দর, 'পিছে সে আ কর মারা।'

'এখানে তোমার কোনও দুশমন আছে ?'

'কোই ভি নেহী।'

ফেলুদা কী ভাবছে সেটা আমি জানি। দুশমন যদি থাকে তো সে আমাদের দুশমন। আমাদের দেরি করিয়ে দেবার জন্য ব্যাপারটা করা হয়েছে। শত্রু কে আমরা বুঝতে না পারলেও, শত্রু যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা রওনা হবার পর আমি ফেলুদাকে বললাম, 'আচ্ছা, মিঃ পুরী যে তোমার কাছে এসেছিলেন, সেটা জানতে পেরে ছোটকুমার

boiRboi.net

তাঁকে দিয়ে টেলিগ্রামটা করিয়ে চিঠিটা লেখায়নি তো ?—যাতে তার কাজে ফেলু মিত্তির কোনও বাধার সৃষ্টি না করতে পারে ?'

'এটা তুই খুব ভাল ভেবেছিস তোপ্‌সে। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। অবিশ্যি তার মানে এটাও বোঝা যায় যে, মিঃ পুরীর উপর এতটা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছোটকুমারের আছে।'

'তা থাকবে না কেন', বললেন লালমোহনবাবু, 'ছোটকুমার ইজ এ প্রিন্স, অ্যান্ড পুরী ইজ ওনলি এ কর্মচারী।'

'ঠিক বলেছেন আপনি', বলল ফেলুদা, 'এখানে বয়সের তফাতটা কিছু ম্যাটার করে না। তবে হ্যাঁ—এটাও ঠিক যে টেলিগ্রাম আর চিঠি সত্ত্বেও আমি যে চলে আসব, সেটা বোধহয় ছোটকুমার ভাবতেই পারেনি।'

'তার মানে যোগীন্দরকে জখম ওরাই করিয়েছে ?'

'যোগীন্দর যখন বলছে এখানে ওর কোনও শত্রু নেই, তখন আর কী হতে পারে ?'

'এক্সকিউজ মি স্যার', বললেন লালমোহনবাবু, 'আমার কিন্তু ওই সাংবাদিক লোকটিকেও বিশেষ সুবিধের লাগছে না।'

'কেন বলুন তো ? আমার নিজেরও যে ভদ্রলোককে একেবারে আদর্শ চরিত্র বলে মনে হচ্ছে তা নয়। কিন্তু আপনার ভাল না-লাগার কারণটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

'সাংবাদিক হলে পকেটে কলম থাকবে না ?' বললেন লালমোহনবাবু। 'বাইরের পকেটে তো নেই-ই, কাল যখন কোট পরছিল তখন দেখলাম বুক পকেটেও নেই, শার্টের পকেটেও নেই।'

'আমার মতো যদি একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার থাকে ?'

'লালমোহনবাবু যেন কথাটা শুনে একটু দমে গেলেন। বললেন, 'তা যদি হয়, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আসলে আমার চাপ-দাড়ি দেখলেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়।'

'যাক্‌গে—এবার একটু কাজের কথায় আসা যাক।'

'কী ?'

আপনি কোনটা প্রেফার করবেন—ঘোড়া না ডাণ্ডি ?'

'ন্যাচারেলি আপনারা যেটা প্রেফার করবেন, সেটাই। এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হতে পারে না।'

'কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, আশা করি?'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!'

'হাসছেন কেন?'

'আমার ধারণাটা বোধ হয় আপনার চেয়েও ভিভিড, কারণ কেদার-যাত্রা সম্বন্ধে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক যা লিখে গেছেন, তার তুলনা লিটারেচরে বেশি পাবেন না। তপেশ, জানো পোয়েমটা?'

'না তো!'

'শুনুন ফেলুবাবু।'

'দাঁড়ান, সামনে দুটো ইউ-টার্ন আসছে, সেগুলো পেরিয়ে যাক। সোজা রাস্তা না পেলে আবৃত্তি করাও যায় না, শোনাও যায় না।'

মিনিট দশেক পরে একটা সোজা রাস্তা পেয়ে লালমোহনবাবু তাঁর আবৃত্তি আরম্ভ করলেন—

"শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভক্তজন
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয়, সেই পুরাকাল হতে—
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী"—

এইবার হচ্ছে আসল ব্যাপার। শুনুন, যাত্রীদের কিভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন ভদ্রলোক—

"তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী—
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি'
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগণন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন,
তাও চলে অশ্বারোহী, চলে ডাণ্ডিবাহী,

boiRboi.net

যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি হবে দূর, পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুণ সর্বশক্তিধর
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বল সবে—কেদারের জয় !”

‘হুঁ,’ বলল ফেলুদা, ‘বোঝাই যাচ্ছে, মল্লিক মশাই এ কবিতা লিখেছিলেন বাস-ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।’

‘সার্টেনলি,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘তাঁকে তীর্থযাত্রীর পুরো ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।’

‘কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি কি অশ্বারোহী হতে চান, না ডাণ্ডির দ্বারা বাহিত হতে চান, না পয়দল যেতে চান।’

‘সেটা সব ডিপেন্ড করছে আপনাদের উপর। দলচ্যুত হবার প্রশ্ন তো আর উঠতে পারে না।’

‘আমি আর তোপ্‌সে তো হেঁটেই যাব স্থির করেছি। আপনার পক্ষে ডাণ্ডিটা সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ ঘোড়াগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে পথের যে দিকটায় খাদ, তার কানা ধরে চলা। সে টেনশন আপনার সহ্য হবে না।’

লালমোহনবাবু ভয়ঙ্কর রকম গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘শুনুন ফেলুবাবু, আপনি কিন্তু আমার ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে আন্ডার এস্টিমেট করে চলেছেন। আমি গেলে হেঁটে যাব, আর নয়তো যাব না। এই আমার সোজা কথা।’

‘যাক্, তা হলে এটা সেট্‌লড’, বলল ফেলুদা।

‘একটা প্রশ্ন আমি করতে পারি কি?’ বললেন লালমোহনবাবু—‘অবিশ্যি এটা জার্নি সম্বন্ধে নয়।’

‘নিশ্চয় পারেন।’

‘এরা তো মশাই আমাদের চিনে ফেলেছে; এখন কেদার গিয়ে আমরা করছিটা কী?’

'সেটা সব নির্ভর করছে—কে আগে উপাধ্যায়ের সন্ধান পায় তার উপর।'

'ধরুন যদি আমরাই পাই।'

'তা হলে তাঁকে সবিস্তারে ব্যাপারটা বলতে হবে। সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর মনোভাব যদি বদলে গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো লকেটটা উনি আর নিজের কাছে রাখতে চাইবেন না। আমাদের কর্তব্য হবে—তিনি সেটা কাকে দিয়ে যেতে চান, তাঁর অনুসন্ধান করা—অবশ্য সে রকম লোক যদি কেউ থেকে থাকে। এর মধ্যে যদি ছোটকুমারও উপাধ্যায়ের সন্ধান পেয়ে যান, তা হলে তিনি হয়তো লকেটটার ছবি তুলতে চাইবেন। চন্দ্রদেওর ছেলে বলে উপাধ্যায় হয়তো স্নেহবশত তাতে রাজিও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাধ্যায়ের অমতে পবনদেওকে কোনও মতেই লকেটটা হস্তগত করতে দেওয়া যায় না। অবিশ্যি সে যে সেটা হাত করতে চাইছে, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। আমরা শুধু অনুমান করছি যে, সে-ই হুমকি দিয়ে মিঃ পুরীকে চিঠি ও টেলিগ্রামটা পাঠাতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তারও এখনও কোনও প্রমাণ নেই। টেলিভিশনের ছবি তোলা ছাড়া তার আর কোনও উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সাংবাদিক মিঃ ভার্গবও যে উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন।'

ফেলুদা বলল, 'আমার বিশ্বাস : ভার্গব যখন আসল ঘটনা জেনে গেছে, তখন তার শুধু দুটো ছবি পেলেই কাজ হয়ে যাবে—একটি উপাধ্যায়ের, একটি লকেটের। কারণ এই কাহিনী খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে ভার্গবের অন্তত কিছু দিন আর অন্নচিন্তা থাকবে না।'

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়িটা কিন্তু অত্যন্ত বেয়াড়া রকম চড়াই উঠে দশ হাজার ফুট বা সাড়ে তিন হাজার মিটারের উপরে পৌঁছে গেল। অন্তত যোগীন্দর তাই বলল, আর সেই সঙ্গে বাইরের কনকনে শীতেও তার প্রমাণ পেলাম। এখন মাঝে মাঝে বরফের পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা যে কোন শৃঙ্গ তা বুঝতে

পারছি না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গৌরীকুণ্ড পৌঁছে যাওয়া উচিত। ঘড়ি বলছে পাঁচটা পনেরো। দূরে পাহাড়ের চূড়োয় উজ্জ্বল রোদ থাকলেও আশেপাশের পাহাড়ে পাইন আর রডোডেনড্রনের বনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একটা মোড় ঘুরে সামনে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি দেখে বুঝলাম যে, আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে গেছি। এটাও বুঝলাম যে, আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে। আমদের কেদার-যাত্রা শুরু হবে কাল ভোরে। আর ভোরে রওনা হলেও চোদ্দ কিলোমিটার চড়াই পথ যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। অর্থাৎ আসল ঘটনা যা ঘটবার, তা পরশুর আগে নয়।

বাস টারমিনাস হবার ফলে ছোট জায়গা হওয়া সত্ত্বেও গৌরীকুণ্ডে ব্যস্ততার শেষ নেই। ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কুলি—এদের সঙ্গে দর-দস্তুরি চলছে। কাণ্ডি জিনিসটা ঝুড়ি টাইপের। এতে করেও মানুষ যায়, যদিও দেখে মোটেই ভরসা হয় না।

এখানে রাতে থাকতে হবে জেনেও আগে কোনও বন্দোবস্ত করিনি। কারণ, জানি অন্তত একটা ধরমশালা কি চটি পেয়ে যাব। সত্যিই দেখা গেল, জায়গার কোনও অভাব নেই। এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়। বিছানা বালিশ লেপ কম্বল সবই দেয়। পাণ্ডারা বাঙালি না হলেও বাঙালি যাত্রী এত আসে যে, এরা দিব্যি বাংলা শিখে গেছে। এদের থাকার ঘরগুলো হয় দোতলায়। বেঁটে বেঁটে ঘর, যার সিলিং-এ ফেলুদার প্রায় মাথা ঠেকে যায়। এই ঘরের নীচে সেই রকমই বেঁটে বেঁটে সার বাঁধা দোকান। সস্তার ব্যাপার, তবে আমাদের কথা হচ্ছে, রাত্তিরে ঘুমোনো। সেই কাজটায় কোনও ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না।

আমরা এখানে এসেই ছোটকুমারের হলদে আমেরিকান গাড়িটা দেখেছিলাম। ওরা আমাদের চেয়ে ঘণ্টা চারেক আগে পৌঁছেছে নিশ্চয়। অর্থাৎ দুপুরে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তার মানে কেদারে একটা পুরো দিনেরও বেশি সময় পাচ্ছে ছোটকুমার।

আমার ধারণা, মিঃ ভার্গবও আজ রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

আশ্চর্য এই যে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—উপাধ্যায় মশাইয়ের সন্ধান করা।

৫

পাণ্ডাদের ঘরে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যে অ্যালার্ম বাজিয়ে উঠে আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এত ভোরে বিভিন্ন দেশীয় এত যাত্রীর ভিড় এখানে জমায়েত হয়েছে, সেটা ভাবতেই পারিনি। এদের মধ্যে বাঙালি আছে প্রচুর, আর তাদের প্রায় সবাই দলে এসেছে। দল বলতে অবিশ্যি পরিবারও বোঝায়। সত্তর বছরের দাদু থেকে নিয়ে পাঁচ বছরের নাতনি পর্যন্ত, তার মধ্যে মাসি-পিসিও যে নেই, তা নয়।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ক্যামেরা হাতে পবনদেওকে দেখে বেশ অবাক হলাম। তিনি ঘোড়া ভাড়া করেছেন দুটো—একটা নিজের জন্য, আর একটার পিঠে থাকবে সরঞ্জাম। আমাদের দেখে বললেন, শোনপ্রয়াগে নাকি অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি তোলার ছিল, তাই কাল এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়েছে। আমাদের সঙ্গেই অবিশ্যি রওনা হচ্ছেন, তবে উনি থেমে থেমে ছবি তুলতে তুলতে যাবেন ; ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম থাকবে নিজের সঙ্গে—ফিল্‌ম, অর্থাৎ কাঁচামাল থাকবে অন্য ঘোড়ার পিঠে।

ফেলুদা ছোটকুমারের কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'রহস্যের শেষ নেই। উনি কি তা হলে কেদারে লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খুঁজে বার করার জন্য ?'

যাই হোক, এ সব ভাববার সময় এখন নয়, কারণ আমাদের রওনা দেবার সময় এসে গেছে।

'আপনি তা হলে দৃঢ়সংকল্প যে হেঁটেই যাবেন ?' ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করল।

'ইয়েস স্যার', বললেন জটায়ু, 'তবে হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে তাল

রেখে হাঁটতে পারব কিনা সে বিষয়ে—'

'সে বিষয়ে আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না। আপনি আপনার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তার কারণ কিছু নেই। এই নিন, এইটে হাতে নিন।'

আমরা তিনজনের জন্য তিনটে লাঠি কিনে নিয়েছি, যার নিচের অংশটা ছুঁচোলো লোহা লাগানো। এ লাঠি এখন প্রত্যেক পদযাত্রীর হাতে। এর দাম দু' টাকা, ফিরে এসে আবার ফেরত দিলে এক টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তারই একটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

আমরা ঘড়ি ধরে ছ'টায় রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু যে রকম হাঁক দিয়ে 'জয় কেদার' বলে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নিলেন—আমার তো মনে হল, তাতেই তাঁর অর্ধেক এনার্জি চলে গেল।

পাহাড়ের গা দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তা। শুধু যে শীর্ণ তা নয়, এক-এক জায়গায় একজনের বেশি একসঙ্গে পাশাপাশি যেতে পারে না। এক দিকে পাহাড়, এক দিকে খাদ, খাদের নিচ দিয়ে বেগে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। দু' দিকেই মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাকার ফলে যাত্রীদের মাথার উপর একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশির ভাগ অংশেই গাছপালা নেই, খালি শুক্‌নো ঘাস আর পাথর। যারা পায়ে হাঁটছে, তাদের মুশকিল হচ্ছে, অশ্বারোহী আর ডাণ্ডিবাহীদের জন্য প্রায়ই তাদের পাশ দিতে হচ্ছে। এখানে নিয়মটা হচ্ছে কি, সব সময়ই পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাশ দেওয়া। খাদের দিকটায় গিয়ে পাশ দিতে গেলে পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা।

যোগব্যায়াম করি বলে বোধ হয় আমাদের দুজনের খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। লালমোহনবাবুর পক্ষে ব্যাপারটা খুব শ্রমসাপেক্ষ হলেও উনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন সেটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। চড়াই ওঠার সময় তো কথা বলা যায় না ; এর পর খানিকটা সমতল রাস্তায় আমাদের কাছাকাছি পেয়ে বললেন, 'তেনজিং নোরকের মাহাত্ম্যটা কোথায়, সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাদের কেদার পৌঁছানোটা আরও আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিল।

একটা বেশ বড় পাথরের খণ্ড পাহাড়ের গা দিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে এল সোজা ফেলুদার দিকে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হতে যে কয়েকটা মুহূর্ত গেল, তাতেই কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেল। পাথরের ঘষা খেয়ে ফেলুদার হাতের এইচ এম টি ঘড়িটা চুরমার হয়ে গেল, আর আমাদের পাশের এক প্রৌঢ় যাত্রীর লাঠিটা হস্তচ্যুত হয়ে পাশের খাদ দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঝড়ের বেগে গড়িয়ে নেমে গেল মন্দাকিনী লক্ষ্য করে।

ফেলুদা একটু হকচকিয়ে গেলেও সেটা মুহূর্তের জন্য। ওর শরীর যে কত মজবুত আর স্ট্যামিনা যে কী সাংঘাতিক, সেটা বুঝলাম এই এতখানি খাড়াই পথ হাঁটার পর সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও ওর পিছন পিছন গিয়েছিলাম, কিন্তু যতক্ষণে ওর কাছে পৌঁছালাম, তার মধ্যেই ও একটা লোকের কলার চেপে তাকে একটা গাছে ঠেসে ধরেছে। লোকটার বয়স বছর পঁচিশের বেশি না। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং সে স্বীকার করেছে যে, পাথর ফেলার ব্যাপারে সে আর একজনের আদেশ পালন করছিল। পকেট থেকে দশখানা কড়কড়ে দশ টাকার নোট বার করে সে দেখিয়ে দিল, কেন তাকে এমন একটা কাজ করতে রাজী হতে হয়েছে।

কে তাকে এই টাকা দিয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, তারই এক অচেনা জাতভাই। বোঝা গেল আসল লোক সে নয়, সে শুধু দালালের কাজ করেছে।

আপাতত ফেলুদা লোকটার গা থেকে একটা পশমের চাদর খুলে, সেটা দিয়ে তাকে দু' হাত সমেত পিছমোড়া করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। বলল, যাত্রীদের ফাঁকে ফাঁকে কনস্টেবল থাকে, তাদের একজনকে পেলে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

লালমোহনবাবুর ভাষায় পাথর ফেলার অন্তর্নিহিত মানেটা সত্যি করে ভাবিয়ে তোলে। ভদ্রলোক বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে, কেউ বা কাহারা কেদারে আপনার উপস্থিতিটা প্রিভেন্ট করার জন্য উঠে-পড়ে

boirboi.net

লেগেছে।'

গৌরীকুণ্ড আর কেদারের মাঝামাঝি একটা জায়গা আছে, যেটার নাম রামওয়াড়া। সকলেই এখানে থামে বিশ্রামের জন্য। চটি আছে, ধরমশালা আছে, চায়ের দোকান আছে। লালমোহনবাবুকে আমরা এখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া স্থির করলাম। এখানকার এলিভেশনে আড়াই হাজার মিটার, অর্থাৎ প্রায় আট হাজার ফুট। চারিদিকের দৃশ্য ক্রমেই ফ্যানট্যাস্টিক হয়ে আসছে। লালমোহনবাবু একেবারে মহাভারতের মুডে চলে গেছেন ; এমন কি এও বলছেন যে যাত্রাপথে যদি তাঁর পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই, কারণ এমন গ্লোরিয়াস ডেথ নাকি হয় না।

ফেলুদা বলল, 'আপনি কিন্তু পাবলিকের উপর যে পরিমাণে গাঁজাখুরি মাল চাপিয়েছেন, আপনার নরকভোগ না হয়ে যায় না।'

'হেঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'যুধিষ্ঠির পার পাননি মশাই নরকভোগের হাত থেকে, আর লালমোহন গাঙ্গুলী !'

বাকি সাড়ে তিন মাইলের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। একটা জায়গা থেকে হঠাৎ কেদারের মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেয়ে সব যাত্রীরা 'জয় কেদার !' বলে কেউ মাথা নত করে, কেউ হাত জোড় করে, কেউ বা সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাদের ভক্তি জানালেন। কিন্তু আবার হাঁটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের চুড়ো লুকিয়ে গেল পাহাড়ের পিছনে, আর বেরোল একেবারে কেদার পৌঁছানোর পর। পরে জানলাম যে, এই বিশেষ জায়গা থেকেই এই বিশেষ দর্শনটাকে এরা বলে 'দেও-দেখ্‌নী'।

৬

কেদার পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের হয়ে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, চার দিকের পাহাড়ের চুড়োগুলোয় রোদ ঝলমল করছে।

এতক্ষণ চড়াই-এর পর হঠাৎ সামনে সমতল জমি দেখতে পেলে যে কেমন লাগে, তা লিখে বোঝাতে পারব না। এটুকু বলতে পারি

যে, অবিশ্বাস আশ্বাস আনন্দ—সব যেন এক সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, আর তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা মেশানো একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব। সেটাই বোধ হয় যাত্রীদের মনে আরও বেশি ভক্তি জাগিয়ে তোলে।

চারিদিকে সবাই পাথর-বাঁধানো জমিতে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে 'জয় কেদার' 'জয় কেদার' করছে, মন্দিরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন দিকে ঘেরা বরফের পাহাড়ের মধ্যে, আমরা তিনজন তারই মধ্যে এগিয়ে গেলাম একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে।

এখানে হোটেল আছে—হোটেল হিমলোক—কিন্তু তাতে জায়গা নেই, বিড়লা রেস্ট হাউসেও জায়গা নেই। এক রাত্রের ব্যাপার যখন, মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হলেই হল। তাই শেষ পর্যন্ত কালীকমলীওয়ালির ধরমশালায় উঠলাম আমরা। সামান্য ভাড়ায় গরম লেপ তোশক কম্বল সবই পাওয়া যায়।

কেদারনাথের মন্দির এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা ছ'টায় বন্ধ হয়ে গেছে, আবার খুলবে সেই কাল সকাল আটটায়। তাই লালমোহনবাবুর পুজো দেবার কাজটা আজ স্থগিত থাকবে। আপাতত ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা হল গরম চা। আমাদের থাকার ঘর থেকে নীচে নেমেই চায়ের দোকান পেয়ে গেলাম। এটা হল কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতোই কেদারনাথের গলি। দোকানগুলো সবই অস্থায়ী, কারণ নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বরফের জন্য কেদারনাথে জনপ্রাণী থাকবে না।

আমি ভেবেছিলাম, এই ধকলের পর লালমোহনবাবু হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাকি নতুন এনার্জি পাচ্ছেন—'তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা!'

বিশ্বনাথের মতোই এখানেও কেদারের গলির দোকানগুলোতে বেশির ভাগই পুজোর সামগ্রী বিক্রি হয়। এমন কি, বেনারসের সেই অতি-চেনা গন্ধটাও যেন এখানে পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে এলাচ-দেওয়া গরম চা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ চেনা গলায় প্রশ্ন এল—'উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন?'

ছোটকুমার পবনদেও সিং। এখনও তার হাতে ক্যামেরা আর বেল্টের সঙ্গে লাগানো সাউন্ড রেকর্ডিং যন্ত্র।

'আমরা তো এই মিনিট কুড়ি হল এলাম', বলল ফেলুদা।

'আমি এসেছি আড়াইটেয়,' বলল পবনদেও। 'যেটুকু জেনেছি, তিনি এখন পুরোপুরি সাধুই হয়ে গেছেন। চেহারাও সাধুরই মতো। বুঝে দেখুন, এখানে এত সাধুর মধ্যে তাকে খুঁজে বার করা কত কঠিন। একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমি শিওর। তিনি নাম বদলেছেন। উপাধ্যায় বলে কাউকে এখানে কেউ চেনে না।'

'দেখুন চেষ্টা করে', বলল ফেলুদা, 'আমরাও খুঁজছি।'

পবনদেও চলে গেলেন। লোকটা আমার কাছে এখনও রহস্য রয়ে গেল।

আমরা চা শেষ করে উঠে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় আর-একটা চেনা কণ্ঠে বাংলায় একটা প্রশ্ন এল।

'এই যে—এসে পড়েছেন ? কেমন, আসা সার্থক কিনা বলুন।'

আমাদের ট্রেনের আলাপী মাখনলাল মজুমদার।

'ষোল আনা সার্থক', বলল ফেলুদা, 'আমাদের ঘোর এখনও কাটেনি।'

'হরিদ্বারের কাজ হল ?'

'হয়নি বলেই তো এখানে এলাম। একজনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। আগে ছিলেন হরিদ্বারে। সেখানে গিয়ে শুনি, তিনি চলে গেছেন রুদ্রপ্রয়াগ। আবার রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে শুনি কেদারনাথ।'

'কার কথা বলছেন, বলুন তো ?'

'ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।'

মাখনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

'ভবানী ? ভবানীর খোঁজ করছেন আপনারা ? আর সে কথা অ্যাদ্দিন আমাকে বলেননি ?'

'আপনি তাঁকে চেনেন নাকি ?'

'চিনি মানে ? সাত বচ্ছর থেকে চিনি। আমার পেটের আলসার সারিয়ে দিয়েছিল এক বড়িতে। তার পর হরিদ্বার ছাড়ার কিছু দিন

আগেও আমার সঙ্গে দেখা করেছে। একটা বৈরাগ্য লক্ষ করেছিলাম ওর মধ্যে। বললে, রুদ্রপ্রয়াগে যাবে। আমি বললাম, বাসরুট হয়ে প্রয়াগ আর এখন সে জিনিস নেই। তুমি জপতপ করতে চাও তো সোজা কেদার চলে যাও। বোধ হয় একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিল, তাই কিছু দিন রুদ্রপ্রয়াগে থেকে যায়। কিন্তু এখন সে এখানেই।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায় ?'

'শহরের মধ্যে তাকে পাবেন না ভাই। সে এখন গুহাবাসী। চোরাবালিতাল নাম শুনেছেন ? যাকে এখন গান্ধী সরোবর বলা হয় ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে।'

'ওই চোরাবালিতাল থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। কেদারনাথের পিছন দিয়ে পাথর আর বরফের উপর দিয়ে মাইল তিনেক যেতে হবে। হ্রদের ধারে একটা গুহায় বাস করে ভবানী। উপাধ্যায় অংশটা তার নাম থেকে উবে গেছে; এখন সে ভবানীবাবা। একা থাকে, কাছেপিঠে আর কেউ থাকে না। কাল সকালে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'আপনার সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে ?'

'না, তবে স্থানীয় লোকের কাছে খবর পেয়েছি। ফলমূলের জন্য তাকে বাজারে আসতে হয় মাঝে মাঝে।'

'আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন, মিঃ মজুমদার। কিন্তু তাঁর অতীতের ইতিহাস কি এখানে কেউ জানে ?'

'তা তো জানতেই পারে,' বললেন মাখনবাবু, 'কারণ সে তো চিকিৎসা এখনও সম্পূর্ণ ছাড়েনি। এই কেদারনাথের মোহান্তই তো বলছিলেন যে, ভবানী সম্প্রতি নাকি একটি ছেলের পোলিও সারিয়ে দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সে কিছু দিনের মধ্যে আর চিকিৎসা করবে না—পুরোপুরি সন্ন্যাসী বনে যাবে।'

'একটা শেষ প্রশ্ন', বলল ফেলুদা, 'ভদ্রলোক কোন্ দেশী তা আপনি জানেন ?'

'এ বিষয় তো তাকে কোনও দিন জিগ্যেস করিনি। তবে সে

আমার সঙ্গে সব সময় হিন্দিতেই কথা বলেছে। ভাল হিন্দি। তাতে অন্য কোনও প্রদেশের ছাপ পাইনি কখনও।'

মাখনবাবু চলে গেলেন।

লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে আমাদের দল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'বিড়লা গেস্ট হাউস থেকে আমাদের তলব পড়েছে।'

'কে ডাকছে?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

একজন বেঁটে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'মিঃ সিংঘানিয়া।'

ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল। আমাদের দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে এই সিংঘানিয়াই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমার মনে হয়, এঁকে খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে—চলিয়ে।'

যদিও চারিদিকে অনেকগুলো বরফের পাহাড়ের চুড়োতে এখনও রোদ রয়েছে—তার কোনওটা সোনালি, কোনওটা লাল, কোনওটা গোলাপি—কেদার শহরের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে।

বিড়লা গেস্ট হাউস কেদারনাথের মন্দিরের পাশেই, কাজেই আমরা তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। দেখে মনে হল, এখানে হয়তো এটাই থাকবার সবচেয়ে ভাল জায়গা। অন্তত পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তো বটেই; খাবারের কথা জানি না। খাবারের ব্যাপারে এমনিতেও শুনছি, এখানে আলু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

বেঁটে লোকটা আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে বিড়লা গেস্ট হাউসের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। বেশ বড় ঘর, চারিদিকে চারটে গদি পাতা। মাথার উপর একটা ঝুলন্ত লোহার ডাণ্ডা থেকে বেরোনো তিনটি হুকে টিমটিম করে তিনটে বাল্‌ব জ্বলছে। কেদারনাথে ইলেকট্রিসিটি আছে বটে, কিন্তু আলোর কোনও তেজ নেই।

আমরা মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই, যিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হল।

যা ভাবা যায়, সেটা যখন না হয়—তখন মনের অবস্থাটা আবার স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সিংঘানিয়ার নামটার সঙ্গে সিংহের মিল আছে বলে বোধ হয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে আশা করেছিলাম। যিনি এলেন তাঁর মাঝারি গড়ন, মেজাজে মাঝারি গাম্ভীর্য, গলার স্বর সরুও নয় মোটাও নয়। শুধু একটা মোটা পাকানো গোঁফে বলা যায় কিছুটা ভারিক্কি ভাব এসেছে।

'মাই নেম ইজ সিংঘানিয়া' বললেন ভদ্রলোক—'প্লিজ সিট ডাউন।'

'আমরা তিনজনে দুটো গদিতে ভাগাভাগি করে বসলাম, সিংঘানিয়া বসলেন তৃতীয় গদিতে সোজা আমাদের দিকে মুখ করে। কথা হল ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে।

সিংঘানিয়া বললেন, 'আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত মিঃ মিটার, কিন্তু আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়নি।'

ফেলুদা বলল, 'বিপদে না পড়লে তো আর আমার ডাক পড়ে না, তাই আলাপ হবার সুযোগও হয় না।'

'আমি অবিশ্যি আপনাকে বিপদে পড়ে ডাকিনি।'

'তা জানি', বলল ফেলুদা। 'আপনার নামও কিন্তু আমি শুনেছি। অবিশ্যি সিংঘানিয়া তো অনেক আছে, কাজেই যাঁর নাম শুনেছি, তিনিই আপনি কিনা বলতে পারব না।'

'আই অ্যাম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, আপনি কী ভাবে আমার নাম শুনলেন।'

'আপনি হরিদ্বার গিয়েছিলেন কখনও?'

'সার্টেনলি।'

'সেখানে ভবানী উপাধ্যায় বলে একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

'করেছিলাম বইকি ; কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কী করে?'

'উপাধ্যায়ের বাড়িওয়ালা আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ সিংঘানিয়া এবং আর একজন ভদ্রলোক উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা

boiRboi.net

করতে এসেছিলেন।'

'আর কিছু বলেননি?'

'বলেছিলেন যে উপাধ্যায়কে নাকি আপনি লোভে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু উপাধ্যায় সেটা কাটিয়ে ওঠে।'

'হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান, দিস উপাধ্যায়! আমি এমন লোক আর দ্বিতীয় দেখিনি। ভেবে দেখুন মিঃ মিটার—লোকটার রোজগার মাসে পাঁচশো টাকার বেশি নয়, কারণ গরীবদের সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। সেই লোককে আমি পাঁচ লাখ টাকা অফার করলাম। আপনি জানেন বোধ হয় যে, ওঁর কাছে একটা অত্যন্ত ভ্যালুয়েব্‌ল লকেট আছে—খুব সম্ভবত এককালে সেটা ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজার ছিল।

'সে তো জানি, কিন্তু আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে, আপনি এই লকেটের খবরটা জানলেন কি করে। ওটা তো রাজার পাঁচ-ছ' জন খুব কাছের লোক ছাড়া আর কারও কাছে প্রচার হয়নি।'

'আমি খবরটা জেনেছিলাম সেই কাছের লোকেদের একজনের কাছ থেকেই। আমার জুয়েলারির ব্যবসা আছে দিল্লীতে। আমার কাছে এই লকেটের খবর আনে রূপনারায়ণগড়ের ম্যানেজার মিঃ পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী। সে আমাকে লকেটা কিনতে বলে। ন্যাচারেলি হি এক্সপেক্টেড এ পারসেনটেজ। আমরা গেলাম হরিদ্বার। উপাধ্যায় রিফিউজ করলেন। পুরীর উৎসাহ চলে গেল। কিন্তু আমি ওটা কেনার লোভ ছাড়তে পারছি না। আমার মনে হয়, এখনও চেষ্টা করলে হয়তো পাওয়া যাবে। তখন তিনি ডাক্তারি করছিলেন, লোকের সেবা করছিলেন, এখন হি ইজ এ সন্ন্যাসী। একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ওই রকম একটা পার্থিব সম্পদের উপর কোনও আসক্তি থাকবে, এটা ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগছে না? আমি চাই, ওঁকে আর একবার অ্যাপ্রোচ করতে।'

'বেশ তো, করুন না।'

'দ্যাট ইজ ইমপসিব্‌ল, মিঃ মিটার।'

'কেন?'

'উনি এমন জায়গায় থাকেন, সেখানে আমার পক্ষে যাওয়া

অসম্ভব। আমি আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?'

'করুন।'

'হোয়াই আর ইউ হিয়ার?'

'প্রধানত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। তবে উপাধ্যায় লোকটার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা রয়েছে। তার যদি কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখি, তা হলে কিন্তু আমি বাধা দেব।'

'ইউ আর অ্যাকটিং অ্যাজ এ ফ্রি এজেন্ট? আপনাকে কেউ এমপ্লয় করেনি?'

'না।'

'আপনি আমার হয়ে কাজ করবেন?'

'কী কাজ?'

'আপনি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলে লকেটটা এনে দিন। আমি আপনাকে পাঁচ লাখের টেন পার্সেন্ট দেব। উনি যদি নিজে টাকা না নেন, তা হলে ওঁর যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকে, তাকে আমি টাকাটা দেব।'

'কিন্তু এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড আরও কয়েকজন এখানে রয়েছে, আপনি জানেন সেটা?'

'রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার তো?'

'আপনি জানেন?'

'জানতাম না। আজ বিকেলেই ভার্গব বলে এক সাংবাদিক এসেছিল। কেদারে এসেও যে সাংবাদিকদের উৎপাত সহ্য করতে হবে, সেটা ভাবিনি। যাই হোক, সে-ই খবরটা দিল। কিন্তু ছোটকুমার তো ফিল্ম তুলতে এসেছে।'

'জানি। কিন্তু তাতে উপাধ্যায় আর লকেটের একটা বড় ভূমিকা আছে।'

সিংঘানিয়ার চেহারাটা এবার একটা ইঁদুরের মতো হয়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল—

'দোহাই মিঃ মিটার—প্লিজ হেল্প মি!'

'আপনি ভার্গবকে এ সব নিয়ে কিছু বলেননি তো?'

'পাগল! আমি বলেছি তীর্থ করতে এসেছি। কেদারে আসার

boiRboi.net

আর কোনও কারণ থাকার দরকার আছে কি ?'

'ভার্গব লোকটাও উপাধ্যায় সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড। তবে খবরের কাগজের খোরাক হিসেবে।'

'আপনি কিন্তু এখনও আমার কথার উত্তর দেননি।'

'মিঃ সিংঘানিয়া—আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আপনার প্রস্তাব আমি উপাধ্যায়কে জানাব। তবে আমার ধারণা : তিনি যদি লকেটটা নিজে না রাখেন, তবে সেটা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চাইবেন। কাজেই এখন কোনও পাকাপাকি কথা বলার দরকার নেই—তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে, কেমন ?'

'ভেরি গুড।'

বাইরে রাত। কেদার শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। বাড়ির বাতি, রাস্তার বাতি, দোকানের বাতি—সবই যেন ধুঁকছে। তারই মধ্যে এক জায়গায় বেশ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, ছোটকুমার পবনদেও একটা ব্যাটারির আলো জ্বালিয়ে কেদারের গলির ফিল্ম তুলছে। আমাদের দেখে শুটিং থামিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'উপাধ্যায়ের কোনও খবর পেলেন ?'

ফেলুদা উত্তর না দিয়ে একটা পাল্টা প্রশ্ন করল—

'আপনি উঠেছেন কোথায় ?'

'এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়, জানেন তো ? তারই একটাতে রয়েছি—এই বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে দুটো বাড়ির পরে ডান দিকের বাড়ি।'

'ঠিক আছে—আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি', বলল ফেলুদা। আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের ধরমশালার দিকে।

লালমোহনবাবু হঠাৎ মন্তব্য করলেন, 'ছোটকুমার কেমন লোক জানি না মশাই, কিন্তু সিংঘানিয়া লোকটা ধড়িবাজ আছে।'

'কী করে জানলেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বোধ হয় দেখতে পাননি, কিন্তু আমি দেখলাম, লোকটার কোটের বাঁ পকেটে একটা

boiRboi.net

ক্যাসেট রেকর্ডার। কথা শুরু হবার আগে সেটা টুক করে চালু করে দিল।'

'ধড়িবাজের উপর আবার ধড়িবাজতর হয় জানেন তো?'

ফেলুদাও তার পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে দেখিয়ে দিল।

'আপনি কি ভাবছেন যে, এটা আমি—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না, কারণ কাঁধে একটা ঘা খেয়ে ততক্ষণে সে মাটিতে পড়ে গেছে। গলির এই অংশটা নিরিবিলি, সেই সুযোগে পাশের কোনও গলি থেকে একটা লোক আচমকা বেরিয়ে এসে ওই কাণ্ডটি করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল।

লোকটা মেরেই পালাচ্ছিল ; আমি তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার কোমরটা দু' হাতে জাপটে ধরে তাকে দেয়ালে চেপে ধরলাম। সেও পালটা চাপ দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু তার হাতের অস্ত্রটা দিয়ে তাকে এক ঘায়ে ধরাশায়ী করে দিলেন।

অস্ত্রটা আর কিছুই না, গৌরীকুণ্ডে দু' টাকা দিয়ে কেনা সেই লোহা-লাগানো লাঠি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোকটার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে আবার উঠে, এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে ফেলুদা উঠে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ কাবু। আমরা দু' জন দু' দিক থেকে তাকে ধরে তুললাম। আমাদের ধরমশালায় প্রায় পৌঁছে গেছি। শেষ পথটুকু ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কেদারেও তাহলে গুণ্ডা এসে পৌঁছে গেছে!'

কপাল-জোরে আমাদের পাশের ঘরেই একজন বাঙালি ডাক্তার পাওয়া গেল, নাম অধীর সেন। অধীরবাবু আবার ফেলুদাকে চিনে ফেললেন, কাজেই যত না জখম, তার তুলনায় শুশ্রূষাটা একটু বেশিই হল। ডান কাঁধে একটা জায়গায় কেটে গিয়েছিল, সেখানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ড-এড দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফ্র্যাকচার হয়েছে কি না, সেটা তো এক্স-রে না করলে বোঝা যাবে না।'

ফেলুদা বলল, 'ফ্র্যাকচারই হোক আর যাই হোক, আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারবেন না, এটা আগে থেকেই বলে দিলাম।'

ফি-এর কথা জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক জিভ-টিভ কেটে একাক্কার—'তবে ব্যাপারটা কী জানেন, মিঃ মিত্তির। এই নিয়ে আমার তিনবার হল কেদার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু ক্রমে অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টস ঢুকে পড়ছে শহরে। এর জন্য দায়ী কী জানেন তো? আমাদের যানবাহনের সুব্যবস্থা। এক দিকে ভাল করেন তো অন্য দিক দিয়ে খারাপ ঢুকে পড়ে—এই তো দেখে আসছি জগতের নিয়ম।'

কালীকমলীর ম্যানেজার নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই এখানকার পুলিশকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ফেলুদা তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলল। বুঝতে পারলাম যে, নানা রকম নির্দেশ দেওয়া হল, এবং সবই দারোগা সাহেব অতি মনোযোগের সঙ্গে শুনে নিলেন।

পুলিশ চলে যাবার পর সাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে হাজির—'শুনলাম আপনার লাইফের উপর একটা অ্যাটেম্‌প্‌ট হয়ে গেছে?'

'গোয়েন্দার জীবনে এ তো দৈনন্দিন ঘটনা, মিঃ ভার্গব। এখানকারই কোনও গুণ্ডা হয়তো পকেট মারতে চেয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।'

'আপনি বলতে চান, আপনার কোনও তদন্তের সঙ্গে এর কোনও কানেকশন নেই?'

'তদন্ত আবার কোথায়? আমি তো এখানে এসেছি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

'ভাল কথা, তিনি কোথায় থাকেন সে খবর পেয়েছেন?

'আপনি পেয়েছেন?'

'উপাধ্যায় বলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না।'

'তা হলে ভদ্রলোক হয়তো নাম বদলেছেন।'

'তাই হবে।'

ফেলুদা আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেল। ভার্গব কিছুটা নিরাশ হয়েই যেন চলে গেলেন।

কাল সকাল সকাল উঠতে হবে বলে আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে পুরি-তরকারি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সময় ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল, সেটা কিন্তু আমি আর লালমোহনবাবু মোটেই অ্যাপ্রুভ করতে পারলাম না। ও বলল, 'তোরা দুজনে শুয়ে পড়, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'ঘুরে আসছ মানে?' আমি অবাক এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম। আমি জানি, ওর কাঁধে এখনও বেশ ব্যথা। 'কোত্থেকে ঘুরে আসছ?'

'একবার ছোটকুমারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

'সে কি, তুমি সোজা এনিমি ক্যাম্পে চলে যাবে?'

'আমার এ রকম অনেক বার হয়েছে রে তোপ্‌সে। একটা চোট খেলেই বুদ্ধি খুলে যায়। এবারও তাই। পবনদেও আমাদের শত্রু না।'

'তবে?'

'আসল শত্রু কে, সেটা জানতে পারবি খুব শিগ্‌গিরই।'

'কিন্তু তুমি বেরোবে, আর শত্রু যদি এখন ওঁত পেতে থাকে?'

'আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে। তোরা শুয়ে পড়। আমি যখনই ফিরি না কেন, কালকের প্রোগ্রামে কোনও চেঞ্জ নেই। গান্ধী সরোবর। ভোর সাড়ে চারটায় রওনা হচ্ছি।'

সঙ্গে রিভলভার আর একটা বড় টর্চ নিয়ে ফেলুদা চলে গেল।

'তোমার দাদার সাহসের জবাব নেই', বললেন জটায়ু।

৮

ফেলুদা কাল রাত্তিরে কখন ফিরেছে, জানি না। সেটা ওকে আর জিগ্যেস করলাম না, কারণ ও দেখলাম, সাড়ে চারটার মধ্যে রেডি হয়ে আছে।

আমরা দুজনও দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়ার পর

তিনজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এখন ফিকে ভোরের আলো, রাস্তার বাতিগুলো এখনও টিমটিম করে জ্বলছে।

কেদারনাথের মন্দির ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পড়ে ফেলুদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'তুই যে জিভ আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে খুব জোরে শিস দিতিস, সেটা এখনও পারিস ?'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'হ্যাঁ, তা পারি বইকি।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন বলব, তখন দিবি।'

আমরা তিনজনেই সঙ্গে লোহার স্পাইক-দেওয়া লাঠি এনেছিলাম, তা না হলে মাঝে মাঝে বরফে ঢাকা এই পাথুরে পথ দিয়ে হাঁটা অসম্ভব হত। গোড়াতেই মন্দাকিনীর উপর দিয়ে একটা তক্তা-ফেলা সেতু পার হতে হয়েছে আমাদের। নদী এখানে সরু নালার মতো। তিন দিকে ঘিরে যে সব তুষার-শৃঙ্গ রয়েছে, তার কোনওটার নাম এখনও জানা হয়নি। তাদের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উঁচু, সেগুলোর চুড়োয় গোলাপি আভা লক্ষ করা যাচ্ছে। শীত প্রচণ্ড, তারই মধ্যে কাঁপা গলায় লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তো-হো-হোপ্‌সে তো শি-হিস দেবে; আমার ভূ-হূ-হূমিকাটা— ?'

ফেলুদা বলল, 'আপনি আপনার ওই হাতের লাঠিটা প্রয়োজনে পাগ্‌লা জগাই-এর মতো মাথার ওপর ঘোরাবেন, তাতে আপনার বীরত্ব আর ব্যারাম দুটোই একসঙ্গে প্রমাণ হবে।'

বু-হু-ঝেছি।'

আরও আধঘণ্টা চলার পরে দেখতে পেলাম, দূরে একটা ছাই রঙের মসৃণ সমতল প্রান্তর রয়েছে। চারিদিকের পাথরের মধ্যে সেটাই যে চোরাবালিতাল বা গান্ধী সরোবর, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু আমি ফেলুদার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওটাই কি— ?' ফেলুদা ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, হ্যাঁ।

হ্রদের পশ্চিম ধারে একটা পাথরের ঢিবি রয়েছে, সেটার মধ্যে অনায়াসে একটা গুহা থাকতে পারে। পুরো ব্যাপারটা এখনও আমাদের থেকে অন্তত আড়াইশো গজ দূরে।

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জমিতে আলগা পাথর

ছাড়াও বেশ বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। তা ছাড়া বরফ জমে রয়েছে চতুর্দিকে।

কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি যে ফেলুদার দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ঘুরছে, ও যেন কিছু একটা খুঁজছে। এবারে দৃষ্টিটা এক জায়গায় স্থির হল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আমাদের ডান দিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে ক্যামেরার তেপায়ার একটা ঠ্যাং।

ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে সেই দিকে এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে।

পাথরটা পেরোতেই দেখা গেল ছোটকুমার পবনদেও ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লেন্সটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেটা টেলি-ফোটো, অর্থাৎ—টেলিস্কোপের কাজ করবে।

ছোটকুমারের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহাটা, কিন্তু এখনও উনি বেরোননি।'

এবার পর পর ফেলুদা আর আমি দুজনেই চোখ লাগালাম।

লেকের জলটা স্থির, তাতে আকাশের আবছা গোলাপি রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। তার পর বাঁ দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখা গেল গুহাটা। পাথরের ফাঁকে গোঁজা একটা গৈরিক পতাকা রয়েছে গুহাটার ঠিক পাশে।

আমাদের চারপাশের যে শৃঙ্গগুলো সবচেয়ে উঁচু, তাতে এখনই গোলাপি রোদ লেগেছে। পুবে একটা উঁচু শৃঙ্গ, তার পিছনে আকাশের লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে সূর্যটা ওখান দিয়েই উঠবে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুবের পাহাড়ের চুড়োর পিছন দিয়ে চোখ-ঝলসানো সূর্যটা উঁকি দিতেই গান্ধী সরোবরটা রোদে ধুয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম, গুহার গায়ে রোদ পড়েছে আর এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আশ্চর্য নাটক হচ্ছে এইভাবে এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। তাঁর দৃষ্টি সোজা পুব দিকে। যেন নতুন-ওঠা সূর্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

'তোপ্‌সে, এগিয়ে চল !' ফিস্‌ফিসিয়ে আদেশ এল ফেলুদার কাছ থেকে।

'আমি ক্যামেরায় আছি', বললেন ছোটকুমার।

আমরা তিনজন দ্রুত এগিয়ে গেলাম গুহার দিকে এ-পাথর ও-পাথরের আড়াল দিয়ে।

আলো পড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে কোনও একটা বিশেষ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবার গুহা, সন্ন্যাসী, পতাকা সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলেছি। সন্ন্যাসী আমাদের দিকে পাশ করে পুব দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর গেরুয়া বসনের উপর একটা খয়েরি রঙের পট্টুর চাদর।

এবার একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। গুহার পুব দিকের পাথরের ঢিবির গায়ে একটা আলো নড়া চড়া করছে। সেটা যে কোনও ধাতব জিনিস থেকে প্রতিফলিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার গুহার ঢিবির পিছন দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। তার ওভারকোটের কলার তোলা, তাই মুখটা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মাথায় একটা পশমের টুপি, আর হাতে যে জিনিসটা রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে, সেটা রিভলভার ছাড়া আর কিছুই না।

সন্ন্যাসী সেই একই ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে, সূর্যের আলো পড়ছে তার মুখে।

ফেলুদা এবার চাপা গলায় বলল, 'আমি এগোচ্ছি। তোরা এই পাথরের আড়াল থেকে দ্যাখ। রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই তোর সেই শিসটা দিবি।'

ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল গুহাটার দিকে। খানিক দূর গিয়ে সে একটা পাথরের পাশে এমনভাবে দাঁড়াল যে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পায়। আমরা আছি তার বিশ গজ পিছনে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের সব চরিত্রকে।

ফেলুদার পকেট থেকেও এবার রিভলভার বেরিয়ে এল।

এবার সন্ন্যাসী তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন বাঁ দিকে, অর্থাৎ ওভারকোটে

মুখ-ঢাকা লোকটার দিকে।

পরমুহূর্তেই এই অপার্থিব নৈঃশব্দ্য চুরমার করে একটা রিভলভারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওভারকোট পরা লোকটা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি টিপে বরফের উপর বসে পড়ল, আর তার হাতের রিভলভারটাও ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল বরফের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ফেলুদার নির্দেশ।

শিসের শব্দ হওয়া মাত্র এ-পাথর সে-পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ।

'তোপ্‌সে, তোরা আয়!'

আমরা দুজনে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলের দিকে।

এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাধুর গুহার সামনে।

সৌম্যমূর্তি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এখনও যেন পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেননি। আমাদের সকলের দিকেই ঘুরে ঘুরে অবাক হয়ে দেখছেন।

আর যিনি মাটিতে বসে আছেন তাঁর কবজি টিপে? এবারে তো তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে।

সে কি, ইনি যে সাংবাদিক মিঃ ভার্গব!

একজন কনস্টেবল যেন ফেলুদারই কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, 'আগে ওঁর দাড়িটা টেনে খুলুন তো!'

ভার্গবের দাড়িটা টেনে খুলতে যে মুখটা বেরোল, সেই মুখটাই ম্যাজিকের মতো আশ্চর্য রকম চেনা চেনা হয়ে গেল—যখন ফেলুদা নিজেই গিয়ে এক টানে মাথার টুপিটা খুলে ফেলল।

'আশ্চর্য জিনিস রে হেরেডিটি', বলল ফেলুদা—'শুধু যে এর কানের লতি এর বাপের মতো, তা নয়, ইনি সিঁথিও করেন ডান দিকে—আর তাই এঁকে দেখে আমার এত অসোয়াস্তি হত।'

তার মানে কী দাঁড়াল?

ইনি উমাশঙ্কর পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী।

এবার আমাদের সকলের দৃষ্টি গেল সন্ন্যাসীর দিকে। তাঁর এখনও কেমন যেন মুহ্যমান ভাব। হিন্দিতে বললেন, 'পিস্তলের শব্দ শুনে মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল—কিছু মনে করবেন না।'

ফেলুদাও হিন্দিতে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছে যে থলিটি আছে, সেটি একবার বার করা দরকার। আমরা আপনার বন্ধু, সেটা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। ওটা আপনার গুহার মধ্যেই আছে তো ?'

'আর কোথায় থাকবে ? ওই তো আমার একমাত্র সম্পত্তি !'

একজন কনস্টেবল গিয়ে গুহার ভিতর থেকে একটা লাল থলি বার করে নিয়ে এল। সেটা খুলতে প্রথমে বেরোল একটা পাকানো কাগজ। এটা রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর সিলমোহর সমেত ভবানী উপাধ্যায়কে লকেট-দানের স্বীকৃতি।

তার পর বেরোল আর একটা ছোট থলি থেকে সেই বিখ্যাত সোনার লকেট—বালগোপাল—যার অপরূপ সৌন্দর্য এই পরিবেশে, এই সকালের রোদে আরও শতগুণ বেড়ে গেছে।

এইবার ফেলুদা মুখ খুলল। তার বেস্ট হিন্দিতে সে বলল, 'এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে কিন্তু আমাদের সকলের খুব সুবিধে হত।'

'আমার আসল পরিচয় ?'

'আপনার নিজের নামটা বাংলাতেই বলুন না। অ্যাদ্দিন পরে বাংলা বলতে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

উপাধ্যায় ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে গিয়ে বাংলায় বললেন, 'আপনি বুঝে ফেলেছেন আমি বাঙালি ?'

'কেন বুঝব না ?' বলল ফেলুদা, 'আপনি দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিতে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু আপনার "ল" আর বর্গীয় "জ" বাংলার মতো। তা ছাড়া আপনার হরিদ্বারের ঘরের তাকে একটা বইয়ের পাতার টুকরো পেয়েছি, সেটাও বাংলা।'

boiRboi.net

'আপনার বুদ্ধি তো আশ্চর্য তীক্ষ্ণ !'

'এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি ?'

'কী ?'

'উপাধ্যায় কি সত্যিই আপনার পদবি, আর ভবানী কি সত্যিই আপনার নাম ?'

'আপনি কী বলছেন আমি—'

'উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়ের অংশ নয়, আর ভবানী কি দুর্গার আর-একটা নাম নয় ? আমি যদি বলি, আপনার আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায়—তা হলে কি খুব মিথ্যে বলা হবে ?'

'ছো—ছো—ছো—ছো—'

'আপনি কাকে ধিক্কার দিচ্ছেন লালমোহনবাব ?' ফেলুদা বলে উঠল।

'ছো-ছোটকাকা !'

দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে চাইলেন লালমোহনবাবুর দিকে।

'আমি যে লালু !' বললেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু গিয়ে দুর্গামোহনকে টিপ করে প্রণাম করায় সাধুবাবা তাঁর ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তা হলে তো আমার সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। ওই লকেট তো তোরই প্রাপ্য ! ও জিনিস আমার কাছে রাখা এক বিরাট বিড়ম্বনা।'

'তা তো বটেই। তা, আমাকে দিলে আমি একটা ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতে পারি। আপনি তো জানেন না ছোটকাকা, আজকাল আমি ছোটদের উপন্যাস লিখে বেশ টু পাইস করছি ; তবে রুজির তো কিছু বলা যায় না, একদিন দেখব ঝপ্ করে সেল পড়ে গেছে ! তখন লকেটটা থাকলে তবু একটা...'

নিজের ছেলে লকেটটা হাত করার তাল করছে জেনে উমাশঙ্করকে বাধ্য হয়ে ফেলুদাকে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাতে হয়েছিল। বাপকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার ক্ষমতা দেবীশঙ্করের নিশ্চয়ই আছে। দুর্গামোহন খুন হলে লকেট বেহাত হয়ে যেত

এটাও ঠিক, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওই ধস্। দেবীশঙ্কর আটকা পড়ে গিয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগে। সিংঘানিয়া যে এসেছিল কেদারে, সে একেবারে নিজের গরজে, লকেটটাকে কেনার জন্য।

দেবীশঙ্করই লোক লাগিয়ে ফেলুদার দিকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার কেদারে রাত্তিরবেলা গুণ্ডা লাগিয়ে ফেলুদাকে জখম করার চেষ্টা করেছিল।

ছোটকুমার পবনদেও সিং অবিশ্যি তার ক্যামেরা দিয়ে পুরো ঘটনাই টেলি-ফোটো লেন্স-এর জোরে বেশ কাছ থেকেই তুলে রেখেছিল। দেবীশঙ্কর যে রিভলভার বার করে দুর্গামোহনের দিকে তাগ করেছিল, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবার কথা। আপাতত ছোটকুমারের আর ফিল্ম নেই, কিন্তু দিল্লী থেকে স্টক এলে পরে দুর্গামোহনের একটা সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দুর্গামোহন আপত্তি করলেন না; বরং বললেন, 'একজন রাজার আশ্চর্য দরাজ মনের কথাটা বিশ্বের লোকের কাছে গোপন থাকে কেন? আমি টেলিভিশন ক্যামেরায় নিশ্চয়ই বলব আমার সোনার বালগোপাল পাবার কথা।'

পবনদেও বললেন, 'কিন্তু বালগোপাল তো আর আপনার কাছে থাকছে না।'

'না', বললেন দুর্গামোহন। 'সেটার ছবি যদি তুলতে চাও তো আমার ভাইপোকে বলো।'

পবনদেও লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বাড়ি গিয়ে আমি লকেটটার ছবি তুলে আনতে পারি কি?'

জটায়ু তাঁর সবচেয়ে বেশি সাহেবি উচ্চারণে বললেন, 'ইউ আর মোউস্ট ওয়েলখাম!'

boiRboi.net

দার্জিলিং জমজমাট

boiRboi.net

১

'সুখবর বলে মনে হচ্ছে ?'

লালমোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই ফেলুদা তাঁকে প্রশ্নটা করল। আমি নিজে অবিশ্যি সুখবরের কোনও লক্ষণ দেখতে পাইনি। ফেলুদা বলে চলল, 'দু' বার পর পর বেল টেপা শুনেই বুঝেছিলাম, আপনি কোনও সংবাদ দিতে ব্যগ্র, তবে সেটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বুঝতে পারিনি। এখন স্পষ্ট বুঝছি সুসংবাদ।'

'কী করে বুঝলেন ?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি তো হাসিনি।'

'এক নম্বর, আপনার মাঞ্জা দেওয়া চেহারা। হলদে পাঞ্জাবিটা নতুন, দাড়ি কামিয়েছেন নতুন ব্লেড দিয়ে, আফটার-শেভ লোশনের গন্ধে ঘর মাতোয়ারা, তারপর আপনি সচরাচর নটার আগে আসেন না ; এখন নটা বাজতে সতেরো।'

লালমোহনবাবু হেসে ফেললেন। 'ঠিকই ধরেছেন মশাই ! আপনাকে ব্যাপারটা না বলা অবধি সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। সেই পুলক ঘোষালকে মনে আছে তো ?'

'চিত্র পরিচালক ? যিনি আপনার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে হিন্দি ছবি করেছিলেন ?'

'শুধু ছবি নয়, হিট ছবি। তখন থেকেই বলে রেখেছিল ভবিষ্যতে আবার আমার গল্প থেকে ছবি করবে। অ্যাদ্দিনে সেটা ফলেছে।'

'এটা কোন্‌টা ?'

'সেই কারাকোরামের গল্পটা। অবিশ্যি কারাকোরাম আর নেই ; সেখানে হয়ে গেছে দার্জিলিং।'

boiRboi.net

'কোথায় কারাকোরাম, আর কোথায় দার্জিলিং !'

'তবু নেই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো মশাই। আর আমার রেটও তো বেড়ে গেছে অনেক। ফর্টি থাউজ্যান্ড !'

'বলেন কি ? আমার দু' বছরের রোজগার।'

'তা, যেখানে ছাপ্পান্ন লাখ টাকা বাজেট—সেখানে রাইটারকে ফর্টি থাউজ্যান্ড দেবে না ? ওখানে টপ অভিনেতারা কত পায় জানেন ?'

'তা মোটামুটি জানি বইকি !'

'তবে ? আমার এ ছবিতে হিরো করছে রাজেন রায়না। সে নিচ্ছে বারো লাখ। আর ভিলেন করছে মহাদেব ভার্মা। এর রেট আরও বেশি। সবে পাঁচখানা ছবি করেছে, কিন্তু পাঁচখানাই সিলভার জুবিলি হিট।'

'তা, পুলক ঘোষাল আপনার এত পেয়ারের, আপনাকে দার্জিলিং-এ ডাকল না ?'

'সেইটে বলতেই তো আসা ! ডাকবে না মানে ? ওর গ্র্যান্ডফাদার ডাকবে। আর আমাকে একা নয়, আমাদের তিনজনকেই ডেকেছে। অবিশ্যি আমি বলিচি ইনভিটেশনের দরকার নেই—আমরা এমনিই যাব। কী—ঠিক বলিনি ?'

শেষ কবে গেছি দার্জিলিং ? মনেই নেই ; শুধু এইটুকু মনে আছে যে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির শুরু দার্জিলিং-এ। আমি ছিলাম খুব ছোট, আর ওর নরম-গরম ধমক প্রায়ই শুনতে হত। এখন ফেলুদা আমাকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে পরিচয় দেয়। তখন সেটা করতে গেলে লোকে হাসত। বেশ কিছু দিন থেকেই মনে হয়েছে যে আবার দার্জিলিং গেলে বেশ হয়, কিন্তু গত পাঁচ-ছ' বছরে ফেলুদার পসার বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে অবিশ্যি রেটও বেড়েছে। আজকাল ওর দিব্যি চলে যায়। গত ছ' মাসে পাঁচটা তদন্ত করতে হয়েছে ওকে। তার মধ্যে চন্দননগরের একটা জোড়া খুনের কেস ছাড়া সব কটাতেই ও সফল হয়েছে, তারিফ পেয়েছে, পয়সা কামিয়েছে। তিন মাস আগে একটা কালার টি ভি কিনেছে ও। তা ছাড়া ওর পুরনো বইয়ের শখ, সেই সব বই বিস্তর কিনে ও

তাক ভরিয়েছে। এটা আমি বুঝেছি যে ফেলুদা খরুচে লোক। টাকা জমানোর দিকে ততটা আগ্রহ নেই। যা ঘরে আসে তার বেশির ভাগই খরচ হয়ে যায়, আর সেটা যে শুধু নিজের পিছনে, তা নয়। লালমোহনবাবু আমাদের জন্য এত করেন বলে ফেলুদা সুযোগ পেলেই তাঁকে কিছু না কিছু দেয়। আফটার-শেভ লোশনটা ওরই দেওয়া। সেটা 'স্পেশাল অকেশনে' লালমোহনবাবু ব্যবহার করেন। বোঝাই যাচ্ছে আজকে সে রকমই একটা দিন।

সামনে পুজো, ফেলুদা ঠিকই করেছিল মাস কয়েক আর কোনও কাজ নেবে না। কাজেই দার্জিলিং যাওয়ায় তার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। এমনিতেই দার্জিলিং ওর খুব প্রিয় জায়গা। ও বলে, বাংলা দেশটা ভারতবর্ষের কটিদেশে হওয়াতে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে—বাংলার উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটা ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে নেই। এটা নাকি একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট অফ জিয়োগ্রাফি'। 'এত বৈচিত্র্য আর কোনও একটা প্রদেশে পাবি না', বলে ফেলুদা। 'শস্য-শ্যামলাও পাবি, রুক্ষতাও পাবি, সুন্দরবনের মতো জঙ্গল পাবি, গঙ্গা পদ্মা মেঘনার মতো নদী পাবি, সমুদ্র পাবি, আবার উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও পাবি।'

'বলুন মশাই, যাবেন কি না', শ্রীনাথের আনা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে বললেন লালমোহনবাবু।

'দাঁড়ান, আর একটা ডিটেল জেনে নিই।'

'বলুন কী জানতে চান।'

'গেলে কবে যাওয়া?'

'ওদের একটা দল অলরেডি দার্জিলিং পৌঁছে গেছে। তবে আগামী শুক্রবারের আগে কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। আজ হল রবি।'

'শুটিং দেখার ব্যাপারে আমার তেমন কোনও উৎসাহ নেই। কাজটা কি মাঠে-ঘাটে হচ্ছে, না বাড়ির ভিতর?'

'বিরূপাক্ষ মজুমদারের নাম শুনেছেন?'

'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?'

'ছিলেন, এখন আর নেই। একটা মাইল্ড সেরিব্রাল স্ট্রোকের

পর বাহান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করেন।'

'তা ছাড়া ওঁর তো আরও অনেক গুণপনা আছে না? ভদ্রলোক স্পোর্টসম্যান ছিলেন তো?'

'এককালে ভারতবর্ষের বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। শিকারও বোধহয় করতেন।'

'ওঁর একটা শিকারকাহিনী একটা পত্রিকায় পড়েছি।'

'খুব বড় ফ্যামিলির ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে নয়নপুরের জমিদার ছিলেন। দার্জিলিং-এ ওঁদের একটা পুরনো বাড়ি আছে। একতলা বাংলো টাইপের ছড়ানো বাড়ি, ষোলটা ঘর। বিরূপাক্ষ মজুমদার রিটায়ার করার পর সেখানে গিয়েই থাকেন। ওঁদের বাড়ির দু'খানা ঘরে কিছু শুটিং হবে। পারমিশন হয়ে গেছে। বাকি শুটিং বাইরে নানান জায়গায় ছড়িয়ে। এরা মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে রয়েছে। আমরা অন্য কোনও হোটেলে থাকতে পারি।'

'সেই ভালো। ফিল্ম পার্টির সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখিটা আমার পছন্দ হয় না। দার্জিলিং-এ ইদানীং অনেক নতুন হোটেল হয়েছে। তার একটাতে থাকলেই হল।'

আমি বললাম, 'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি কাগজে।'

'ঠিক বলেছিস', বলল ফেলুদা। 'আমিও দেখেছি।'

'তা হলে আর কী', বললেন লালমোহনবাবু, 'ব্যবস্থা করে ফেললেই হয়।'

ব্যবস্থা তিন দিনের মধ্যেই হয়ে গেল। বিষ্যুদবার ত্রিশে সেপ্টেম্বর দুপুরে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, আমাদের সঙ্গে পুলক ঘোষালও চলেছেন। আর সে-সঙ্গে চলেছে ছবির হিরো, হিরোইন আর ভিলেন। লালমোহনবাবুর গল্পে কোনও হিরোইন ছিল না; সেটা বুঝলাম এঁরা ঢুকিয়েছেন। পুলক ঘোষাল ফেলুদাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, 'লালুদার গল্প হওয়াতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভেরি লাকি। তবে আশা করি, আগের বারের মতো এবারও আপনাকে তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হবে না।'

হিরো রাজেন্দ্র রায়না, হিরোইন সুচন্দ্রা আর ভিলেন মহাদেব ভার্মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন পুলক ঘোষাল। সুচন্দ্রাকে দেখতে ভালো, তবে রং একটু বেশি মেখেছেন, রাজেন রায়নার ছবি আমি আগেই দেখেছি—বেশ স্মার্ট, হাসিখুশি ভদ্রলোক, একটু দাড়ি আছে বেশ ছোট করে আর যত্ন করে ছাঁটা, লম্বায় ফেলুদারই মতো, আর শরীরটাকেও বেশ ফিট বলেই মনে হল। ইনি নবাগত হলেও বয়স অন্তত চল্লিশ তো হবেই; তবে সেটা মেক-আপ নিলে ক্যামেরায় আর ধরা পড়বে বলে মনে হয় না। লালমোহনবাবু ওঁর হিরো প্রখর রুদ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন—লম্বায় সাড়ে ছ' ফুট, পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতি, খাঁড়ার মতো নাক, আর চোখ দেখলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে—সে-রকম চেহারার কোনও অভিনেতা কোনও দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।

আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগল মহাদেব ভার্মাকে। ইনি হলেন যাকে ইংরিজিতে বলে পালিশ করা ভিলেন। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, নাকের নীচে সরু চাড়া-দেওয়া গোঁফ, দেখে মনে হয় প্রয়োজনে খুন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। তার উপর দেখলাম ভদ্রলোক পারফিউম ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায় ইনি শৌখিনও বটে। পারফিউম অবিশ্যি রাজেন্দ্র রায়নাও মেখেছেন, তবে তার গন্ধ অন্য। ফেলুদা পরে বলেছিল যে মহাদেব ভার্মার সেন্টটা হচ্ছে ডেনিম, আর রায়নারটা হল ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার।

এয়ারপোর্টেই লাউড স্পিকারে বলল যে বাগডোগরার প্লেন এক ঘণ্টা লেট আছে। তাই আমরা সকলেই রেস্টোরান্টে চা-কফি খেতে চলে গেলাম। এ ব্যবস্থাটা অবিশ্যি পুলক ঘোষালই করলেন, আর আমরা তাঁর অতিথি হয়েই গেলাম।

রেস্টোরান্টে মহাদেব ভার্মার সঙ্গে ফেলুদার কথা হল। আমি ফেলুদার পাশেই বসেছিলাম, তাই সব কথাই শুনতে পেলাম।

ফেলুদাই প্রথম শুরু করল, বলল, 'আপনি তো বোধহয় কয়েক বছর হল এ লাইনে এসেছেন?'

ভার্মা বললেন, 'হ্যাঁ, সবে তিন বছর হয়েছে। তার আগে আমার

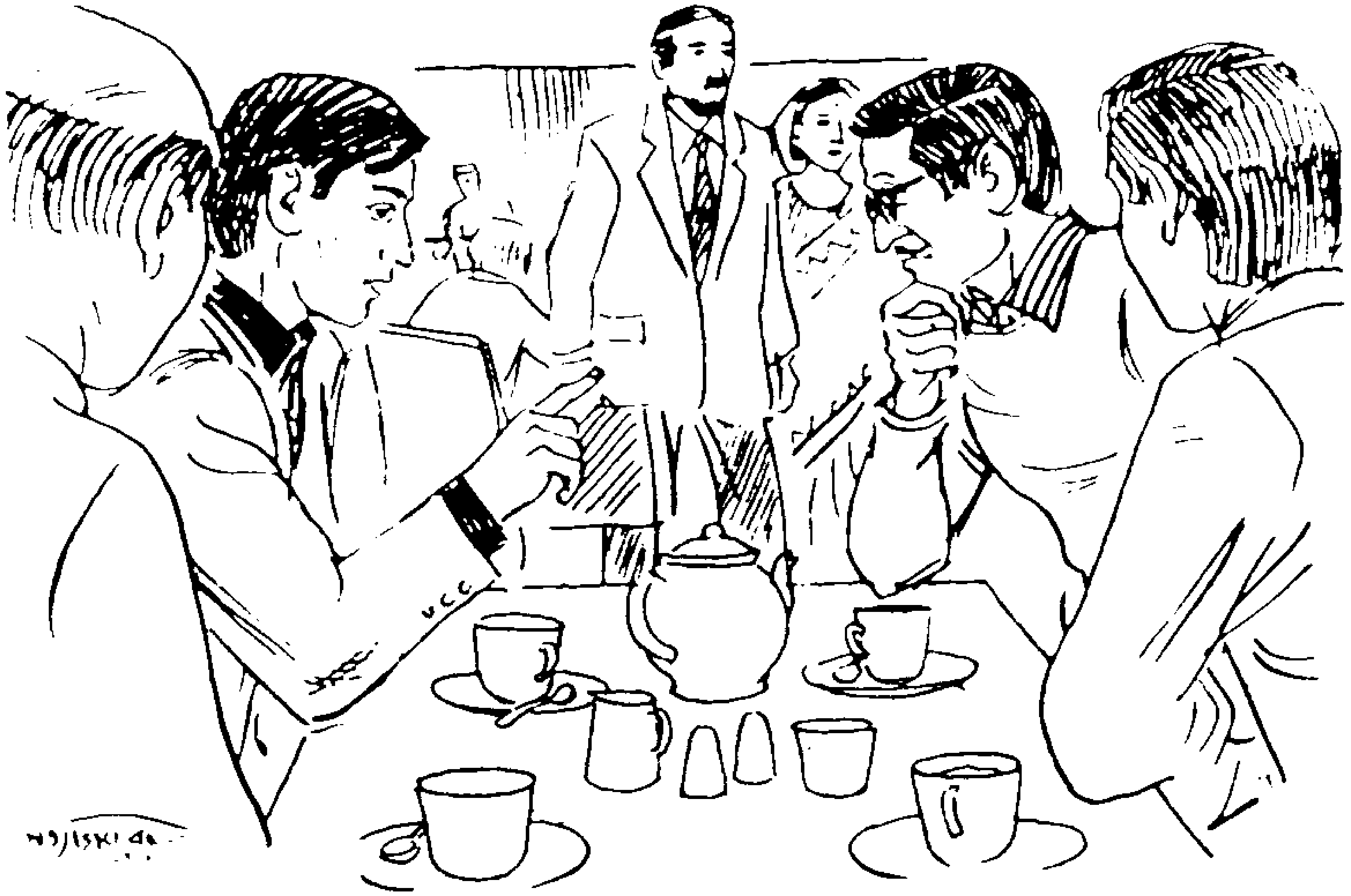

ছিল ভ্রমণের নেশা। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি ; এমন কি বছর পাঁচেক আগে লে-লাদাক পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। সেখান থেকে যাই কাশ্মীর। শ্রীনগরে একটা শুটিং হচ্ছিল, সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয় ; তিনিই আমাকে ছবিতে অফার দেন। এখন অবিশ্যি আর ফিল্ম ছাড়ার কথা ভাবাই যায় না।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্ করছিলেন, এবার তাঁর প্রশ্নটা করে ফেললেন। 'আপনি যে চরিত্রটা করছেন, সেটা আপনার কেমন লাগল ?'

'খুব জোরদার চরিত্র', বললেন মহাদেব ভার্মা। 'বিশেষ করে আমি যেখানে হিরোইনকে আমার সামনে ধরে হিরোর প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছি, আর হিরো হাতে রিভলভার নিয়েও কিছু করতে পারছে না, সে দৃশ্যটা সত্যি নাটকীয়।'

অবিশ্যি এমন কোনও দৃশ্য বইয়ে নেই। লালমোহনবাবুর মুখের হাসিটা তাই কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

এবার মহাদেব ভার্মা ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি তো গোয়েন্দা বলে শুনলাম। তা গোয়েন্দারা তো

শুনেছি, একজন মানুষকে দেখেই তার বিষয়ে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। আপনি আমাকে দেখে কিছু বলুন তো দেখি।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'গোয়েন্দারা অবশ্যই জাদুকর নন। তাঁরা যেটুকু বোঝেন তার কিছুটা পর্যবেক্ষণের জোরে, আর কিছুটা মনস্তত্ত্বের সাহায্যে। এ দুটোর ভিত্তিতে এটুকু বলতে পারি যে আপনি কিছুটা নিরাশ বোধ করছেন।'

'কেন ?'

'কারণ আপনি প্রায়ই কথা বলতে বলতে এদিক-ওদিক দেখছেন আর বেশ বুঝতে পারছেন যে, এই লোক-ভর্তি রেস্টোরান্টে আপনাকে অনেকেই চিনতে পারছে না। একটু আগেই লক্ষ করলাম যে, আপনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অথচ হিরো রাজেন্দ্র রায়নাকে অনেকেই চিনেছে, অনেকেই এগিয়ে এসে তার অটোগ্রাফ নিয়েছে। শেষে দেখলাম, আপনি আপনার কালো চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন, যদি তার ফলে কেউ চেনে ; কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না দেখে আপনি আবার চশমাটা পরে নিলেন।'

মহাদেব ভার্মা এবার আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক বলেছেন। বম্বেতে আমাকে পাবলিক প্লেসে দেখলে রীতিমতো হই-চই পড়ে যায়। আপনাদের বাঙালিরা বোধহয় বেশি হিন্দি ছবি দেখেন না।'

'যথেষ্ট দেখেন', বললেন লালমোহনবাবু, 'কিন্তু আপনার তিনখানা ছবি এখনও এখানে রিলিজ হয়নি। অবিশ্যি আমি যে সিনেমার খুব খবর রাখি তা নয়, তবে আমার গল্পে যিনি ভিলেনের পার্ট করছেন, তাঁর বিষয়ে গত ক'দিনে কিছু খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম ফিল্ম পত্রিকাগুলো থেকে।'

'আই সি', খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন মিঃ ভার্মা। 'যাই হোক, মিঃ মিত্তিরের অবজারভেশন যে দারুণ শার্প, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

ফেলুদার পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা অবিশ্যি দার্জিলিং-এ খুব ভালোভাবেই হয়েছিল, কিন্তু সে কথা, যাকে বলে, 'যথাস্থানে'

বলব। আপাতত প্লেন এসে গেছে, আমাদের ডাক পড়ে গেছে, তাই উঠে পড়তে হল। এখন সিকিউরিটি খুব কড়া, আমি জানি ফেলুদা তাই তার কোল্ট রিভলভারটা সুটকেসে চালান দিয়েছে, সেটা ইতিমধ্যে আমাদের অন্য মালের সঙ্গে প্লেনে উঠে গেছে। আজকাল ফেলুদা আর কোনও রিস্‌ক নেয় না ; স্রেফ ছুটি ভোগ করতে গিয়েও তাকে এত বার তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে, ও রিভলভার ছাড়া কোথাও যায় না।

সিকিওরিটি থেকে লাউঞ্জে গিয়ে বসার দশ মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল—'দ্য ফ্লাইট টু বাগডোগরা ইজ রেডি ফর ডিপারচার'। আমরা তিনজন আর সেই সঙ্গে শুটিং-এর দল, প্লেনে গিয়ে উঠলাম। এখন আমরা সমতল ভূমিতে, কিন্তু আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উঠে যাব ৬০০০ ফুট উঁচুতে। অক্টোবরে দার্জিলিং-এ বেশ ঠাণ্ডা, ভাবতেই মনটা নেচে উঠছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সামনে অ্যাডভেঞ্চার আছে, যদিও সেটা ফেলুদাকে বলায় ও দাবড়ানি দিয়ে বলে দিল, 'তার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কাজেই তোর আশা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

এর পরে আর আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে যাইনি।

২

কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলটা দিব্যি ছিমছাম। ঘরে ঘরে টেলিফোন, হিটার, স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা-গরম জলের ব্যবস্থা, বিছানার চাদর, বালিশ পরিষ্কার—মোট কথা সব কিছু দেখে মনটা যাকে বলে বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। দিন দশেকের জন্য এসেছি, তাই থাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি ভালো না হলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

পথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। সোনাদা এলে পর লালমোহনবাবু তাঁর রাজস্থান থেকে কেনা কান-ঢাকা চামড়া আর পশমের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নিলেন। পথের দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য দেখে উনি কতবার যে 'বাঃ' বলেছেন, তার হিসেব নেই। শেষটায় কার্সিয়াং রেলওয়ে রেস্টোরান্টে চা খাবার সময় ভদ্রলোক

boiRboi.net

সত্যি কথাটা বলে ফেললেন। সেটা হল এই যে, তিনি এই প্রথম দার্জিলিং-এ চলেছেন।

ফেলুদার চোখ কপালে উঠে গেল।

'সে কি, আপনি এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘাই দেখেননি?'

'নো স্যার।' একগাল হেসে জিভ কেটে বললেন লালমোহনবাবু।

'ইস্—আপনাকে প্রচণ্ড হিংসে হচ্ছে।'

'কেন?'

'প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার যে কী অদ্ভুত অনুভূতি, সেটা তো আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই বুঝবেন! ইউ আর ভেরি লাকি, মিস্টার গাঙ্গুলি।'

আকাশ পরিষ্কার থাকলে কার্সিয়ং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, কিন্তু আজ মেঘলা। ঘুম যখন পৌঁছলাম তখন আলো পড়ে আসছে, আর তখনও মেঘ কাটেনি। মোট কথা লালমোহনবাবুর ভাগ্যে ব্যাপারটা এখনও ঘটেনি। এটা অবিশ্যি দার্জিলিং-এর বিখ্যাত ঘটনা। এমনও হতে পারে যে এই দশ দিনের এক দিনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না। তা হলে অবিশ্যি খুবই খারাপ হবে। আমি নিজে এর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে থাকলেও আবার নতুন করে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এই একটা দৃশ্য, যা কোনও দিনও পুরনো হবার নয়।

হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেক খাড়াই উঠেই ম্যাল। যখন পৌঁছলাম, তখন দোকানের আর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার মশাই, গাড়িটাড়ি দেখছি না কেন?' ফেলুদাকে বুঝিয়ে দিতে হল, দার্জিলিং-এর বেশ খানিকটা অংশে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ। ম্যালটা হল সে রকম একটা জায়গা। এখানে শুধু হাঁটা চলে আর ঘোড়ায় চড়া চলে। 'আপনি ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'নাঃ', বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে উটেই যখন চড়া আছে,

তখন ঘোড়া তো তার কাছে নস্যি।'

আগেই বলেছি যে বিরূপাক্ষ মজুমদার বলে একজনের বাড়িতে শুটিং হবার কথা আছে। আশ্চর্য এই যে, প্রথম দিনই ম্যালে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সেটা হল পুলক ঘোষালের মারফত। শুটিং পার্টি ম্যালে বেড়াতে বেরিয়েছে, পুলক ঘোষাল একবার আগেই দার্জিলিং এসে বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়ি দেখে পছন্দ করে গেছেন, ভদ্রলোকও কোনও আপত্তি করেননি। ফেলুদাকে দেখেই পুলকবাবু এগিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে একজন ফেল্ট হ্যাট আর স্যুট পরা ভদ্রলোক।

'এঁর বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি', বললেন পুলকবাবু, 'ইনি হলেন মিস্টার বিরূপাক্ষ মজুমদার।'

তার পর পুলকবাবু আমাদের তিন জনের পরিচয় দিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে।

'আপনার সঙ্গে শুটিং-এর কী সম্পর্ক?' ফেলুদাকে জিগ্যেস করলেন মিঃ মজুমদার।

ফেলুদা বলল, 'আমার কোনও সম্পর্ক নেই, তবে আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক। এঁরই একটি গল্প থেকে ছবিটা হচ্ছে।'

'বাঃ, ভেরি গুড! ইনি ক্রাইম রাইটার, আর আপনি গোয়েন্দা—ভেরি গুড! প্রদোষ মিত্র নামটা তো জানা বলে মনে হচ্ছে। আপনার নাম তো কাগজে বেরিয়েছে কয়েকবার, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলল ফেলুদা। 'গত বছর বোসপুকুরে একটা খুনের ব্যাপারে আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলাম।'

'দ্যাট্‌স রাইট', বলে উঠলেন ভদ্রলোক, 'তাই চেনা চেনা লাগছিল। আমার আবার একটা বাতিক আছে; আমি খবরের কাগজের খবর সংগ্রহ করি। আমার সতের বছর বয়স থেকে এই হবি। সব খবর নয়, যাকে বলা যায় একটু গরম খবর। একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে সেই খবরের খাতার। এখন তো রিটায়ার করেছি; মাঝে মাঝে সেই সমস্ত পুরনো খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখি। লোকে গল্পের বই পড়ে, আর আমি পুরনো খবর পড়ি। এখন অবিশ্যি আমার একজন হেল্‌পার হয়েছে। রজত—আমার সেক্রেটারি—আমার কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয়। আপনার কাটিংও আছে তার মধ্যে।'

আমরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম ম্যালের মুখে ফোয়ারাটা ছাড়িয়ে মেন রোডের দিকে। মিঃ মজুমদার বললেন, 'আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, কেনা দরকার। চলুন না ওই কেমিস্টের দোকানে।'

আমরা গিয়ে দোকানে ঢুকলাম। ভদ্রলোক টফ্রানিল নামে রাংতায় মোড়া একত্রিশটা বড়ি কিনলেন। বললেন, 'এ হল অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিলস্—আমার এক মাসের স্টক। রোজ একটি করে না খেলে আমার ঘুম হয় না।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'একদিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো একটু দেখব।'

'একশোবার!' বললেন ভদ্রলোক। 'ইউ আর মোস্ট

ওয়েলকাম। এও আপনাকে দেখিয়ে দেব যে, এখনও কিনারা হয়নি এমন পুরনো তদন্তের খবরও আমার খাতায় সাঁটা আছে। আমি বলছি প্রায় বিশ বছর আগের কথা।'

'খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।' বলল ফেলুদা।

'অবিশ্যি আমার নিজের জীবনটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়,' বললেন ভদ্রলোক। 'এক এক সময় ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি, কিন্তু তার পরেই মনে হয়—সবগুলো সত্যি কথা তো লিখতে পারব না। আত্মজীবনী লিখতে গিলে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। যাক্ গে—একদিন আসবেন।'

'কোন্ সময় গেলে আপনার ব্যাঘাত হবে না?'

'দ্য বেস্ট টাইম ইজ ইন দ্য মর্নিং। আমি বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোই। মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল ছাড়িয়ে একটু গেলে বাঁয়ে একটা রাস্তা পাবেন যেটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। সেটা দিয়ে কিছু দূর গেলেই দেখবেন, গেটে "নয়নপুর ভিলা" লেখা একটা বাগানে ঘেরা বাংলো। সেটাই আমার বাড়ি।'

ভদ্রলোক হাত তুলে গুড বাই করে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চাপলেন, সঙ্গে একজন সহিস। ফেলুদা বলল, 'রুগী মানুষ, খাড়াই ওঠা বারণ, তাই নিশ্চয়ই ঘোড়া ব্যবহার করেন। তবে বেশ লোক, তাতে সন্দেহ নেই।'

শুটিং পার্টির সকলে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে দেখছে, পুলকবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'মজুমদার মশাইকে কেমন লাগল?'

'খুব ভালো', বলল ফেলুদা। 'অসুখ হলে কী হবে, এখনও বেশ তাজা আছেন।'

'আর সব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট। শুটিং-এর বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করছিলেন।'

'উনি ছাড়া আর কে থাকেন ওঁর বাড়িতে?'

'ওর সেক্রেটারি আছেন, রজত বোস। এ ছাড়া জনা তিনেক চাকর, মালি আর সহিস আছে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ওঁর ছেলে আসছেন কলকাতা থেকে। অন্তত আসার তো কথা। একটিই

boiRboi.net

ছেলে। মেয়ে আছে দুটি, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কলকাতায় থাকে না।'

'ভদ্রলোকের হবিটা কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক।'

'কাটিং জমানোর কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ। অনেকটা আমাদের সিধু জ্যাঠার কথা মনে পড়ছে।'

আমারও যে তা মনে হয়নি তা নয়, তবে সিধু জ্যাঠা শুধু খুনখারাপির খবরই জমান না ; ইন্টারেস্টিং খবর হলেই সেটা সেঁটে রাখেন।

কথা আর বেশি দূর এগলো না। পুলকবাবু বললেন শুটিং-এর অনেক তোড়জোড় আছে, এবার হোটেলে ফিরতে হবে। আগামীকাল নাকি খুব হাল্‌কা আউটডোরের কাজ রাখা হয়েছে ; তার পরদিন থেকে আর্টিস্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে, আর প্রথমেই বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে কাজ।

পুলক ঘোষাল সমেত ফিল্‌মের দল চলে যাবার পর আমরা ম্যালের কাছেই কেভেনটারের দোকানের খোলা ছাতে বসে হট চকোলেট খেলাম। লালমোহনবাবু খুব তৃপ্তি সহকারে চকোলেটে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মশাই, আমার মন কিন্তু একটা কথা বলছে।'

'কী বলছে ?'

'বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না।'

'বৃথা কেন যাবে ? দার্জিলিং-এ এসেছি চেঞ্জে, এমন চমৎকার ক্লাইমেট, বৃথা কখনও যেতে পারে ? পলিউশন-ফ্রি আবহাওয়া—শরীর সারতে বাধ্য।'

'আমি সেদিক দিয়ে বলছি না,' একটা বিজ্ঞ হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

'তবে কোন দিকে দিয়ে বলছেন ?'

'আমি আপনার পেশার কথা ভাবছি।'

'আমার পেশা ?'

'আমার মন কেন যেন বলছে যে, আপনাকে কাজে লেগে পড়তে হবে।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'আসলে মুশকিলটা

boiRboi.net

করাটা আমার পেশা নয়, আপনার পেশা। আপনার স্বভাবই হল অলিতে গলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া। অবিশ্যি যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে, গড ফরবিড, তা হলে ফেলু মিত্তির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'এই তো চাই! এই তো এ. বি. সি. ডি.-র পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব!'

এইখানে বলে রাখি, এ. বি. সি. ডি. হল ফেলুদাকে দেওয়া লালমোহনবাবুর খেতাব। এর মানে হল এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর। কাজেই উনি ফেলুদাকে মাঝে মাঝে এ. বি. সি. ডি. বলে সম্বোধনও করে বসেন।

আমি জানি না, কিন্তু বিরূপাক্ষ মজুমদারের সঙ্গে যেটুকু আলাপ হল, তাতে আমারও ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক চরিত্র বলে মনে হল। বছরের পর বছর প্রায় একাই দার্জিলিং-এ পড়ে আছেন, খাতায় গরম গরম খবর সাঁটছেন, আর পুরনো খবর পড়ে দেখছেন। অবিশ্যি তার মানেই যে তাঁকে ঘিরে কোনও ক্রাইম ঘটবে, সেটা ভাবার কোনও যুক্তি নেই। আসল কথাটা হচ্ছে কি—ফেলুদা চেঞ্জে গেলেও সেখানে শেষ পর্যন্ত তাঁকে গোয়েন্দার ভূমিকা নিতেই হয়। এটা এতবার দেখেছি যে, মন বলছে এবারও সেটা না হয়ে যায় না।

দেখা যাক, কপালে কী আছে!

৩

'সাব্লাইম' কথাটা লালমোহনবাবুকে এই প্রথম ব্যবহার করতে শুনলাম। অবিশ্যি শুধু সাব্লাইম নয়, তার সঙ্গে স্বর্গীয়, হেভেনলি, অপার্থিব অনির্বচনীয় ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে এথিনিয়াম ইস্কুলের কবি মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা একটি ছ' লাইনের কবিতা আবৃত্তি করে ফেললেন ভদ্রলোক। ঘটনা আর কিছুই না, দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে ভদ্রলোক তাঁর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেন যে সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, আর তাতে সবে সূর্যের

boiRboi.net

গোলাপি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে তাঁর পাশে দাঁড় করালেন। বললেন, 'এ জিনিস কারুর সঙ্গে শেয়ার না করলে মজাই নেই।' আর তার পরেই বিশেষণের তোড়, আর সব শেষে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করা কবিতা—

'অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে !
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে—
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।'

আবৃত্তি শেষ করে দম নিয়ে বললেন, 'সম্বোধনে আ-কারটা এ-কার হয়ে যায়—সেটাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবি, দেখছ তপেশ ?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'দেখেছি', যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণটা ভালো জানা নেই বলে ভদ্রলোক ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

'এটাই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ', বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদাও অবিশ্যি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিল, তবে সেটা হোটেলের বাইরে থেকে। ও ভোরে উঠে যোগব্যায়াম সেরে আমি ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। তার পর ম্যাল থেকে অবজারভেটারি হিলের চারিদিকে চক্কর মেরে চায়ের ঠিক আগে ফিরে এসেছিল। বলল, 'যতবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি, ততবার বয়সটা যেন কিছুটা কমে যায়। আর সবচেয়ে ভাল কথা—যেখানে-সেখানে বাড়ি উঠে শহরটার অনেক ক্ষতি করলেও অবজারভেটারি হিলের রাস্তাটার কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

'আমারও আজ প্রথম মনে হল যেন জন্ম সার্থক', বললেন লালমোহনবাবু।

'যাক !' বলল ফেলুদা। 'এত গাঁজাখুরি গল্প লিখেও যে

আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টিকে আছে, সেটা জেনে খুব ভালো লাগল।'

'আজ তা হলে আমরা কী করছি?'

আমরা হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছিলাম; ফেলুদা কাঁটা দিয়ে ওমলেটের খানিকটা অংশ মুখে পুরে বলল, 'আজ সকালে একবার মজুমদার মশাইয়ের ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে। কাল থেকে ওঁর বাড়িতে শুটিং আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন বড্ড ভিড়। আজ মনে হয় নিরিবিলি বসে একটু কথা বলা যাবে। এমন লোককে কালটিভেট করাটা আমি কর্তব্যের মধ্যে ধরি।'

'তথাস্তু', বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাল থেকে নেমে দাশ স্টুডিও আর কেভেনটারের পাশ দিয়ে নেহরু রোড ধরে সোজা তিন কোয়ার্টার মাইল গেলে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল। সেটা ছাড়িয়ে গেলেই পাব আমরা মিঃ মজুমদারের বাড়ির রাস্তা।

সেই রাস্তা ধরে কিছু দূর উঠতেই একজন বাঙালি ভদ্রলোককে জিগ্যেস করতে উনি বলে দিলেন যে, আর মিনিট খানেক হাঁটলেই আমরা নয়নপুর ভিলাতে পৌঁছে যাব।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনই অসুবিধা হল না। লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলো বাড়ি, বেশ ছড়ানো, তিন দিক ঘিরে রয়েছে সুন্দর বাগান, আর পিছনে পুব দিকে বন ঝাউবনের পরেই উঠেছে খাড়াই পাহাড়।

বাগানে একটা মালি কাজ করছিল, সে আমাদের দেখেই এগিয়ে এল।

'মিঃ মজুমদার আছেন?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'কী নাম বলব?'

'বল যে, কাল যাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল, সেই মিত্তিরবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

মালি খবর দিতে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে বাড়িটার শোভা দেখছিলাম। উত্তরে চাইলেই সোজা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এখন ঝলমলে রুপোলি। যিনিই বাড়িটা বানিয়ে থাকুন, তাঁর রুচির

boiRboi.net

তারিফ করতে হয়।

মালির পিছন পিছন দেখি, মিঃ মজুমদার নিজে বেরিয়ে এসেছেন।

'গুড মর্নিং! আসুন আসুন, ভিতরে আসুন!'

আমরা তিনজন বাড়ির নাম লেখা সাদা কাঠের গেট খুলে ভিতরে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন, সেটা দিনের আলোতে দেখে বুঝতে পারছি। দেখে অসুস্থ বলে মনেই হয় না। মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন, জানলাম তিনিই হলেই সেক্রেটারি রজত বসু। খয়েরি ট্রাউজারের উপর গাঢ় নীল পোলো-নেক পুলোভার পরেছেন, মাঝারি হাইট, রং বেশ পরিষ্কার।

আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন মিঃ মজুমদার। আমরা ভাগাভাগি করে দুটো সোফায় বসলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাচের আলামারিতে গুচ্ছের ছোট-বড় রুপোর কাপ সাজানো রয়েছে। বোঝা যায় সেগুলো মিঃ মজুমদার নানান সময়ে নানান স্পোর্টস প্রতিযোগিতাতে পেয়েছেন। মাটিতে একটা লেপার্ডের ছাল, আর দেওয়ালে দুটো হরিণ আর একটা বাইসনের মাথাও দেখলাম।

'আজ সন্ধ্যায় আমার ছেলে সমীরণ আসবে', বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। 'বাপ-ছেলের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। সে ব্যবসাদার, শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে।'

'তিনি কি ছুটিতে আসছেন, না কোনও কাজে?'

'সাতদিনের ছুটিতে। অন্তত বলছে তো তাই, তবে ও চুপচাপ বসে ছুটি ভোগ করার ছেলে নয়। ভয়ানক ছটফটে। ত্রিশ হতে চলল, এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে জানি না। যাকগে—এখন আপনাদের কথা বলুন।'

'আমরা বরং আপনার কথা শুনতে এসেছি', বলল ফেলুদা।

'আমার কথার তো শেষ নেই,' বললেন মিঃ মজুমদার। 'আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ। অবিশ্যি পরের দিকে সেটল করে গিয়েছিলাম। একটা ব্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে

আমার ঘাড়ে। স্বভাবতই তখন অনেকটা সামলে নিতে হয়। তরুণ বয়সটা—শুধু তরুণ কেন, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত—খুব হই-হুল্লোড় করেছি। খেলাধুলো, আউটডোর-ইনডোর, শিকার, কিছুই বাদ দিইনি।'

'আর তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর হবি।'

'হ্যাঁ, সেটা কখনও বাদ পড়েনি। রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে।'

ভদ্রলোক সেক্রেটারির দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি উঠে গিয়ে ভিতরের ঘর থেকে একটা মোটা বড় খাতা এনে ফেলুদার হাতে দিলেন। আমি আর লালমোহনবাবু উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

boiRboi.net

বিচিত্র খাতা, তাতে সন্দেহ নেই।

'আপনি দেখছি লন্ডনের কাগজ থেকেও কাটিং রেখেছেন,' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। 'লন্ডনে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে। তাকে বলাই আছে—কোনও সেনসেশন্যাল খবর পেলেই যেন আমাকে কেটে পাঠিয়ে দেয়।'

'খুন রাহাজানি অ্যাক্সিডেন্ট অগ্নিকাণ্ড আত্মহত্যা—কিছুই বাদ নেই দেখছি।'

'তা নেই', বললেন মিঃ মজুমদার।

'কিন্তু আপনি কী একটা ক্রাইমের কথা বলেছিলেন, যেটার কোনও কিনারা হয়নি?'

'হ্যাঁ—তেমন একটা ক্রাইম আছে বটে। সেটার খবর আপনি খাতায় পাবেন; আর-একটি আছে যেটা খাতায় পাওয়া যাবে না, কারণ সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছায়নি।'

'সেটা কী ব্যাপার?'

'সেটা আমায় জিগ্যেস করবেন না, কারণ তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমায় মাপ করবেন। যাই হোক, রজত—একবার যাও তো সিক্সটি নাইনের ভলুমটা নিয়ে এস।'

রজতবাবু এবার আর একটা খাতা নিয়ে এসে ফেলুদাকে দিলেন।

'খাতার মাঝামাঝি পাবেন খবরটা', বললেন মিঃ মজুমদার। 'জুন মাসে ঘটে ঘটনাটা। স্টেটসম্যানের খবর, হেডিং হচ্ছে, যত দূর মনে পড়ে—"এমবেজ্‌লার আনট্রেসড"।'

'পেয়েছি' বলল ফেলুদা। তার পর কিছুটা পড়েই বলল, 'এ যে দেখছি আপনাদেরই ব্যাঙ্কের ঘটনা!'

'সেই জন্যেই তো ওটা ভুলতে পারি না', বললেন মিঃ মজুমদার। 'পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমাদেরই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে, নাম ডি বালাপোরিয়া—প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে হাতিয়ে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ বিস্তর চেষ্টা করেও তার আর সন্ধান পায়নি।

boiRboi.net

আমি তখন ছিলাম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।'

ফেলুদা বলল, 'যদিও অনেক দিনের ঘটনা, তাও আমার ব্যাপারটা আবছা আবছা মনে আছে। গোয়েন্দা হবার আগে এই ধরনের ক্রাইমের খবর আমিও খুঁটিয়ে পড়তাম।'

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু আর আমিও খবরটা পড়ে ফেলেছি।

বিরূপাক্ষবাবু বললেন, 'তখনই আমার একবার মনে হয়েছিল যে, শার্লক হোম্‌স বা এরক্যুল পোয়ারোর মতো একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে হয়তো ব্যাপারটার একটা সুরাহা হত। পুলিশের উপর আমার নিজের যে খুব একটা আস্থা আছে, তা নয়।'

ফেলুদা কিছুক্ষণ খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ফেরত দিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। বেয়ারাটির বেশ ভদ্র চেহারা, হঠাৎ দেখলে চাকর বলে মনে হয় না। আমরা ট্রে থেকে কফি তুলে নিলাম।

ফেলুদা বলল, 'বাইরে আপনার ঘোড়াটা দেখলাম ; আপনি বুঝি ওটাতেই চলা-ফেরা করেন ?'

মিঃ মজুমদার বললেন, 'চলা-ফেরা মানে আমি শুধু বিকেলে একবার বেরোই। বাকি সময়টা আমি বাড়িতেই থাকি। আমার অভ্যাসগুলো ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। রিটায়ার করার পর থেকে আমার রুটিনটা একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। আমার ইনসম্‌নিয়া আছে, সে কথা আগেই বলেছি। আমি ঘুমোই দুপুরবেলা, তাও এক গেলাস দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি খেয়ে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুই, উঠি ঠিক পাঁচটায়। তার পর চা খেয়ে বেরোই। রাত্তিরটা আমি বই পড়ি।'

'একদমই ঘুমোন না রাত্রে ?' ফেলুদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'একদমই না', বললেন ভদ্রলোক। 'অবিশ্যি, এককালে আমার ঠাকুরদাদারও শুনেছি এই বাতিক ছিল। তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর রাতটা ছিল দিন, আর দিনটা রাত। জমিদারীর কাজকর্ম তিনি রাত্রেই দেখতেন, আর সারা দুপুর আফিং খেয়ে

ঘুমোতেন। ভালো কথা, আপনার ধূমপানের প্রয়োজন হলে আমার সামনেই করতে পারেন ; আই ডোন্ট মাইন্ড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ', বলে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। বিরূপাক্ষবাবুর ষাটের কাছে বয়স হলেও তাঁকে বৃদ্ধ বলে মোটেই মনে হয় না।

'কাল থেকে তো আপনার বাড়িতে শুটিং শুরু হবে', বলল ফেলুদা। 'আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে।'

'আই ডোন্ট মাইন্ড', বললেন ভদ্রলোক। আমি থাকব বাড়ির উত্তর প্রান্তে, কাজ হবে দক্ষিণ দিকটায়। পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালো লাগল, তাই আর না করলাম না।'

এই কথা বলতে বলতেই একটা জিপের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি ফিল্‌মের দল এসে গেছে। বাগান পেরিয়ে দরজার মুখে এসে টোকা মারলেন পুলক ঘোষাল।

'কাম ইন স্যার', বলে উঠলেন বিরূপাক্ষ মজুমদার।

পুলক ঘোষাল ঢুকে এলেন, তাঁর পিছনে মহাদেব ভার্মা আর রাজেন রায়না।

'আমরা শুটিং-এ বেরোচ্ছি', বলল পুলক ঘোষাল, 'তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। কাল থেকে তো আপনার এখানেই কাজ, তা ছাড়া এই দুটি অভিনেতার সঙ্গে আপনার আলাপও হয়নি। ইনি হলেন ছবির নায়ক রাজেন রায়না, আর ইনি হলেন ভিলেন মহাদেব ভার্মা।'

'বসুন, বসুন', বললেন মিঃ মজুমদার। 'যখন এলেন, তখন একটু কফি খেয়ে যান।'

'না স্যার! আজ আর বসব না। কাল থেকে তো প্রায় সারাটা দিনই এখানে থাকতে হবে। ভালো কথা, আপনার সেক্রেটারি বলছিলেন আপনি নাকি দুপুরটা ঘুমোন। তা, দুপুরে তো আমাদের কাজ হবে, এ বাড়ি থেকে একটু দূরে আমাদের জেনারেটর চলবে। তাতে আপনার ব্যাঘাত হবে না তো?'

'মোটেই না', বললেন মিঃ মজুমদার। 'আমি দরজা-জানলা ভেজিয়ে পরদা টেনে শুই। বাইরের কোনও আওয়াজ ঘরে ঢোকাই

boiRboi.net

না।'

লক্ষ করছিলাম ভদ্রলোক কথা বলার সময় রায়না আর ভার্মার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। বললেন, 'যাক, এবার তা হলে বলতে পারব যে, ফিল্‌মস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অ্যাদ্দিন এ সৌভাগ্যটা হয়নি।'

এবার পুলক ঘোষাল লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

'লালুদা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

'কী ভাই ?'

'আমার মেমরি খুব শার্প, লালুদা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, নাইনটিন সেভেনটিতে গড়পারে ফ্রেন্ডস ক্লাবে "ভূশণ্ডীর মাঠে" প্লে হয়েছিল। সরস্বতী পুজোয়। আপনার মনে পড়ছে ?'

'বিলক্ষণ !'

'আপনি তাতে নদু মল্লিকের পার্ট করেছিলেন, মনে আছে ?'

'বাবা, সে কি ভুলতে পারি ! পাখোয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনও মনে আছে—ধা ধা ধিন্‌তা কত্তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে !—ওঃ ! সে কি ভোলা যায় ? জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয়।'

'না না, শেষ নয়।'

'মানে ?'

'এখানকার বেঙ্গলি ক্লাব আমাদের ডুবিয়েছে। বলেছিল দু-একটা ছোট পার্টের জন্য লোক দেবে, এখন বলছে তারা কলকাতায় চলে গেছে ছুটিতে। বিশেষ করে একটি পার্ট—বুঝেছেন লালুদা, ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান—'

'কে—অঘোরচাঁদ বাটলিওয়ালা ?'

'হ্যাঁ দাদা !'

'কিন্তু তার তো বেশি কিছু করার নেই ; শুধু দুটো সিন।'

'সেই দুটো সিন আমাদের একটু উদ্ধার করে দিতে হবে দাদা ! কথা খুব কম। আজ বিকেলে গিয়ে আপনাকে ডায়ালগ দিয়ে আসবে। এ কাজটা কাইন্ডলি আপনি করে দিন। সবসুদ্ধ তিন দিনের কাজ।'

boiRboi.net

'আমরা কিন্তু আর দশ দিন মাত্র আছি।'

'এক উইকের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করে দেব।'

'কিন্তু এই চেহারা নিয়ে—'

'আপনাকে মেক-আপ দেবো। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর একটা পরচুলা। ফার্স্টক্লাস মানাবে। কেয়া ভাই মহাদেব, মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যায় ?'

'নেহি নেহি ভাই', বললেন মহাদেব ভার্মা।

'আপনার সিগার খাওয়ার অভ্যেস আছে ?' লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করলেন পুলক ঘোষাল।

'ধূমপান করতুম এককালে', হাত কচলাতে কচলাতে বললেন লালমোহনবাবু, 'কিন্তু সিগারেট ছেড়েছি দশ বছর হল।'

'তাতে কী হল ? আর হ্যাঁ, চোখে একটা কালো চশমা।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, লালমোহনবাবু ব্যাপারটাতে ক্রমেই মেতে উঠছিলেন। এবার বললেন, 'ওক্কে! যখন এত করে বলছ, তখন "না" করব না। আমার নিজের গল্পে একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স থাকলে মন্দ কী ? কিন্তু একটা কথা।'

'কী ?'

'আমার নামের পাশে যেন একটা "অ্যাঃ" থাকে। পেশাদারী অভিনেতা হতে আমি নারাজ। হলে অ্যামেচার, আর না হলে নয়। ঠিক তো ?'

'ওক্কে!' বললেন পুলক ঘোষাল।

এই সুযোগে আমিও একটা ব্যাপার সেরে নিলাম। পুলক ঘোষালকে জিগ্যেস করলাম, 'আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি তো ?'

'একশোবার, ভাই, একশোবার', বললেন পুলক ঘোষাল।

boiRboi.net

৪

পুলক ঘোষালের দল তাদের কথা সেরে শুটিং-এর তোড়জোড় করতে চলে গেল। আমাদের কফি খাওয়া শেষ, তাই আমরাও আর বসলাম না। ফেলুদাই প্রথমে উঠে পড়ে বলল, 'আজ তাহলে আসি ?'

'অ্যাঁ ?'

ভদ্রলোক যেভাবে প্রশ্নটা করলেন তাতে বুঝতেই পারলাম, তিনি কোনও একটা কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পরমুহূর্তেই অবিশ্যি নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'উঠবেন ? ঠিক আছে। রয়েছেন যখন ক' দিন, তখন দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

আমরা তিনজনে নয়নপুর ভিলা থেকে বেরিয়ে উৎরাই দিয়ে হোটেলমুখো রওনা দিলাম।

ফেলুদা পথে কিছুই বলল না। কেন যেন, ও-ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। দুপুরে লাঞ্চ খাবার সময় লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কী মশাই, আমাদের অ্যাদ্দিনের আলাপ, আর এমন একটা খবর আপনি বেমালুম চেপে গেস্‌লেন ? ভূশণ্ডীর মাঠে-তে নদু মল্লিক ? বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার, আর আপনি সেই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ?'

লালমোহনবাবু একটা ফিশ ফ্রাইয়ের টুকরো মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আরে মশাই, সে-রকম বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয়। নর্থ ক্যালকাটায় ক্যারম চ্যাম্পিয়ন ছিলুম ফিফটি নাইনে—এ খবর জানতেন ? এনডিওরেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে, সে সব আপনি জানেন ? আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মেডেল পেয়েছি—একবার নয়, থ্রি টাইমস্‌। দেবতার গ্রাস পুরো মুখস্থ ছিল। ফিল্‌মে অফার বিশ বছর আগেও পেয়েছি—তখন আমার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল—ভাবতে পারেন ? কিন্তু সে অফার নিইনি। তখন থেকেই মাইন্ড মেক আপ করেছি যে লেখক হব। শখের লেখক নয়, পেশাদারী লেখক। স্রেফ লিখে পয়সা করা যায়

কিনা দেখব। তার পরের ইতিহাস অবিশ্যি খুব সহজ। খগেন জ্যোতিষী বলেছিল—তোমার কলমে জাদু আছে, তুমি লেখো। তবে এতটা যে সাকসেস হবে, তা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি।'

'একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি', বলল ফেলুদা।

'কী ?'

'এরা আপনাকে দিয়ে চুরুট খাওয়াবে। আপনি দশ বছর হল স্মোকিং ছেড়েছেন। সুতরাং একটা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে।'

'বলছেন ?'

'বলছি। এক কাজ করবেন। আজই একটা চুরুট কিনে ধোঁয়াটা পেটে না নিয়ে খাওয়া অভ্যাস করুন। পেটে গেলেই কিন্তু কাশির দমকের চোটে শট একেবারে মাটিংচকার হয়ে যাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি অ্যাডভাইস, স্যার।'

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাত আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজ অবজারভেটরি হিলটায় একটা চক্কর মারার ইচ্ছে আছে। পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে কাঞ্চনঘঙ্ঘার একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়।

লালমোহনবাবু প্রথম যে সিগারেটের দোকানটা পেলেন, সেখান থেকেই একটা চুরুট কিনে নিলেন। প্রথম টানে ধোঁয়া পেটে চলে গিয়ে সত্যিই একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা কোনও-মতে সামলে নিয়ে তার পর থেকে খুব সাবধানে ধোঁয়া টানামাত্র সেটা ছেড়ে দিতে লাগলেন। চুরুট হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের পার্সোনালটির একটা বদল লক্ষ করছিলাম। বেশ একটা মিলিটারি মেজাজ, জুতোর গোড়ালি দিয়ে শব্দ তুলে হাঁটা, ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এদিক-ওদিক চাওয়া। বুঝলাম, ভদ্রলোক অঘোরচাঁদ বাটলিওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে চলেছেন।

অবজারভেটরি হিলের পুবের রাস্তাটা দিয়ে গিয়ে যেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছি, অমনি সামনে দেখি বিকেলের পড়ন্ত রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সোনার রঙ ধরতে শুরু করেছে। লালামোহনবাবুর আবার কাব্যের মেজাজ এসে পড়ল, 'অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে' বলে আর বাকি কবিতাটা

বললেন না। আমরা পুরো পাহাড়টা চক্কর দিয়ে আবার যখন ম্যালে ফিরে এলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে, সূর্য পাহাড়ের পিছনে চলে গেছে। পুবে জালাপাহাড় রোডের দিকে চেয়ে দেখি ঘোড়ার স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়ে শুটিং-এর দল মালপত্তর কাঁধে নিয়ে ফিরছে, তার পিছনে লোকের ভিড়। তবে এ ভিড় মোটামুটি ভদ্র, বেশি উৎপাত করবে বলে মনে হল না। রায়না আর ভার্মা দুজনকেই কিছু অটোগ্রাফে সই দিতে হল সেটা দেখলাম। তার পর দলটা বাঁয়ে নেহরু রোড ধরে বোধহয় সোজা হোটেলের দিকে চলে গেল।

'গুড ইভনিং!'

ঘোড়ার পিঠে বিরূপাক্ষ মজুমদার। আমাদের দেখে নেমে এলেন।

'একটা কথা আজ সকালে আপনাকে বলা হয়নি', মিঃ মজুমদার ফেলুদাকে উদ্দেশ করে গলা নামিয়ে কথাটা বললেন। তার পর আরও কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এ খবরটা আমার মালির কাছ থেকে শোনা। কত দূর রিলায়েব্‌ল তা বলতে পারব না।'

'কী খবর?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ক' দিন থেকেই নাকি একটি লোককে আমাদের গেটের বাইরে বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।'

'বলেন কী।'

'মালিও তাই বলে। লোকটা পুরনো, তার কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'লোকটার কোনও বর্ণনা দিয়েছে?'

'বলছে মাঝারি হাইট, রং মাঝারি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। মুখ ভালো করে দেখেনি, কারণ চোখে চোখ পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে চলে যায়। তবে সিগারেট বা বিড়ি খায় এটা মালি বলল, কারণ গাছের পিছন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছে।'

'এইভাবে দৃষ্টি রাখার কোনও কারণ খুঁজে বার করতে পারেন আপনি?'

'তা পারি। আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে।

অষ্টধাতুর তৈরি একটা বালগোপাল। আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের মধ্যে ছিল এটা। নয়নপুরে। জিনিসটা খুবই ভ্যালুয়েব্‌ল। আর সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে।'

'সেটা কোথায় থাকে ?'

'আমার শোবার ঘরে তাকের উপর।'

'খোলা অবস্থায় ?'

'আমি তো রাত্রে জেগে থাকি, আর আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে, কাজেই চোর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।'

'আর কোনও কারণে লোক হানা দিতে পারে ?'

'আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। এটা কেন বলছি তার কারণ জিগ্যেস করবেন না। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে, তা হলে আপনার সাহায্য আশা করতে পারি তো ?'

'দ্যাট গোজ উদাউট সেইং', বলল ফেলুদা।

'তা হলেই নিশ্চিন্ত,' বললেন ভদ্রলোক।

এমন সময় একটি বছর ত্রিশের ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'এসো সমীরণ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,' বললেন মিঃ মজুমদার। 'ইনি হচ্ছেন আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ, আর ইনি প্রদোষ মিত্র, আর ইনি লালচাঁদ—স্যরি, লালমোহন...গাঙ্গুলি তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর ইনি প্রদোষবাবুর কাজিন।'

সমীরণ মজুমদার বেশ স্মার্ট দেখতে, তার উপর একটা গাঢ় লাল জার্কিন পরাতে আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে। বললেন, 'আপনি তো বিখ্যাত ডিটেকটিভ ?'

'বিখ্যাত কিনা জানি না', বলল ফেলুদা, 'তবে ডিটেকশন আমার পেশা বটে।'

'আমি আবার খুব গোয়েন্দাকাহিনীর ভক্ত। আপনার সঙ্গে একদিন বসে কথা বলার ইচ্ছা রইল।'

'নিশ্চয়ই।'

boiRboi.net

'আজ একটু শপিং-এ বেরিয়েছি। এক্সকিউজ মি।'

সমীরণবাবু চলে গেলেন।

'আমিও আসি।' ঘোড়ার পিঠে চড়ে বললেন মিঃ মজুমদার। 'আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

'প্রয়োজনে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না,' বলল ফেলুদা। 'আমরা উঠেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে।'

ইতিমধ্যে একটি অচেনা ছেলে এসে লালমোহনবাবুর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা নাকি ওঁর আগামীকালের ডায়ালগ। 'হিন্দি ডায়ালগ বাংলা অক্ষরে লিখে দিয়েছে, সুবিধাই হল।'

'অনেক কথা আছে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সাড়ে তিন লাইন,' শুকনো গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'হোটেলে ফিরে গিয়ে একবার দেবেন তো আমাকে ডায়ালগটা', বলল ফেলুদা। 'আপনাকে একটু তালিম দিয়ে দেব। আপনার হিন্দিতে বড্ড বেশি শ্যামবাজারের টান এসে পড়ে।'

আমরা গতকালের মতো আজকেও ফেরার আগে একবার কেভেনটারসের ছাতে গিয়ে বসলাম হট চকোলেট খাবার জন্য। ঠাণ্ডা বেশ কনকনে, তার উপর মেঘ নেই বলে শীত আরও বেশি। এর মধ্যেই অনেক তারা বেরিয়ে পড়েছে আকাশে, আর তার সঙ্গে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ছায়াপথটা।

'এখানে বসতে পারি ?'

আমরা তিনজন একটা টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের পাশে একটা চেয়ার খালি ছিল ; এবার দেখলাম একজন বছর ষাটেকের বাঙালি ভদ্রলোক সেটার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন। চোখে চশমা, কাঁচা-পাকা মেশানো গোঁফ আর মাথার চুল।

'বসুন', বলল ফেলুদা।

'আপনার পরিচয় আমার জানা আছে,' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার একটা ছবি সমেত সাক্ষাৎকার বোধহয় একটা বাংলা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বছর খানেক আগে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু এঁকে তো— ?'

'ইনি ঔপন্যাসিক লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।'

'কিছু মনে করবেন না—এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম—কিন্তু আজ আপনাদের দেখলাম আমার পাশের বাড়িতে ঢুকতে। আমি নয়নপুর ভিলার উত্তরের বাড়িটায় থাকি। বাড়িটার নাম দ্য রিট্রিট, আর আমার নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার—ইয়ে, আপনি কি কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন ?'

'আজ্ঞে না। এসেছি ছুটি কাটাতে।'

'না, মানে, বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয়...'

'কেন ? উনি কি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন নাকি ?'

'ইয়ে, ওঁর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় তো !'

'ওঃ, তাই বলুন। না, উনি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হল না। আর গুজবে কান দেওয়াটা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না।'

'তা তো বটেই। তা তো বটেই।'

আমার মনে হল, ফেলুদা ইচ্ছে করেই মিঃ মজুমদারের লেটেস্ট ব্যাপারটা চেপে গেল। ইনি কোথাকার কে, তা কে বলতে পারে ? আর ভদ্রলোক সত্যিই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

কেভেনটারসের ছাতে আলো অল্পই, কিন্তু তার মধ্যেই দেখেছিলাম লালমোহনবাবু পকেট থেকে তাঁর কাগজটা বার করে ডায়লগটা আউড়ে দেখছেন।

'তা হলে উঠি ? আলাপ করে খুব ভালো লাগল।'

হরিনারায়ণ মুখার্জি চলে গেলেন।

'মনে হল ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা', ফেলুদা মন্তব্য করল।

'সেটা আবার কী করে বুঝলেন মশাই ?'

'আমাদের চেয়ে শীতটা বেশি সহ্য করতে পারেন। সুতির শার্টের উপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পায়ে মোজাও পরেননি। ভদ্রলোককে একটু কালটিভেট করতে পারলে মন্দ হত না।'

'কেন?'

'আজ জানান দিয়ে গেলেন যে ওঁর কাছে খবর আছে।'

কেন জানি না, হট চকোলেটটা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল যে, ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, যে-সব লোকের সঙ্গে আলাপ করে যে-সব খবর জানতে পারছি, তার থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটা খুব আশ্চর্য নয়। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে, সেটা ভাবতেই পারিনি।

৫

পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে পুলক ঘোষালের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসে গেল লালমোহনবাবুর জন্য। আগের দিন রাত্রে ফেলুদার কাছ থেকে তালিম নিয়ে লালমোহনববাবু তাঁর সাড়ে তিন লাইন ডায়ালগটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যে লোকটি তাঁকে নিতে এল সে বাঙালি, নাম নীতিশ সোম। সে বলল আজ প্রথম দিন, তাই শুটিং আরম্ভ হতে হতে বারোটা হবে। কিন্তু লালমোহনবাবুর মেক-আপ আছে। তাই তাঁকে আগে প্রয়োজন। জামাকাপড়ের কথা পুলকবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন ফোন করে; লালমোহনবাবু নিজের কোট-প্যান্টই পরবেন, তবে কী রঙের সেটা এখনও ঠিক হয়নি, তাই তিনি সঙ্গে যা এনেছেন সবই নিয়ে যেতে হবে। আমিও যেতে চাই শুনে নীতিশবাবু বললেন, 'আপনি বরং এগারোটা নাগাত আসবেন। ততক্ষণে আমাদের তোড়জোড় প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আজ তো মহরত, তাই একটা ছোট অনুষ্ঠান আছে। সেটা এগারোটায় এলে দেখতে পাবেন। আপনি দুপুরের লাঞ্চটাও নাহয় আমাদের সঙ্গেই করবেন; হোটেল থেকে প্যাকড লাঞ্চ আসবে।'

সাড়ে আটটার মধ্যেই একটা সুটকেস নিয়ে 'দুগ্গা' বলে লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

আমি আর ফেলুদা ন'টা নাগাত হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা একটু জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটব। ফেলুদা বলল, 'দার্জিলিং-এ এসে সকালটা হোটেলে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।'

আজকের দিনটাও রোদ-ঝলমল, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যালের বেঞ্চিতে লোক ভর্তি, কারণ পুজোয় অনেক চেঞ্জার এসেছে। আমরা ঘোড়ার স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদা সিগারেট খাওয়া অনেক কমিয়ে দিলেও ব্রেকফাস্টের পর একটা না খেয়ে পারে না। একটা চারমিনার ধরিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমাকে প্রশ্ন করল, 'হালচাল কি-রকম বুঝছিস?'

আমি বললাম, 'এখন পর্যন্ত বিরূপাক্ষ মজুমদারকেই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'সেটা ঠিক। অবিশ্যি তার একটা কারণ হচ্ছে যে, একমাত্র এই ভদ্রলোক সম্বন্ধেই আমরা বেশ কিছু তথ্য জেনেছি, আর সেগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। যে লোক দিনে ঘুমোয় আর রাতে জাগে, যে লোক গরম গরম খবর কাগজ থেকে কেটে খাতায় সেঁটে রাখে, যে বলে যে তার জীবনে একটা রহস্য আছে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না, আর যে একটা মহামূল্য জিনিস সিন্দুকে না রেখে তার ঘরের তাকে রাখে, তাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা চলে না।'

'ওঁর ছেলে তো প্রায় কথাই বললেন না।'

'হ্যাঁ। আমার কাছে ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হল। ভাবটা যেন বেশি কথা বললে কোনও রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই সামলে চলছে।'

'আর রজতবাবু?'

'তোর কী মনে হল?'

'মনে হল যে লোকটার চোখ খারাপ কিন্তু চশমা নেয়নি।

একটা মোড়ায় ধাক্কা খেলেন দেখলে না ?'

'একসেলেন্ট ! একদম ঠিক বলেছিস। চশমাটা হয়তো ভেঙেছে ; আর মাইনাস পাওয়ার তাতে সন্দেহ নেই—অর্থাৎ দূরের জিনিস দেখতে পায় না, কাছের জিনিস পায়—তা না হলে ঠিকঠিক খাতাগুলো আনতে পারত না।'

'আর বম্বের হিরো আর ভিলেন ?'

'তোর কী মনে হয় ? আজকে তোর পরীক্ষাই হোক।'

'কাল একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম।'

'কী ?'

'লালমোহনবাবু যখন নদু মল্লিকের পাখোয়াজের বোলটা বলছিলেন, তখন রায়না আর ভার্মা দুজনের ঠোঁটের কোণেই হাসি দেখা দিল।'

'এটাও দুর্দান্ত বলেছিস।'

'তার মানে কি ওরা বাংলা জানে ?'

'আসলে বম্বের ফিল্ম্-জগতে এত বাঙালি কাজ করে যে, বাংলাটা অল্পবিস্তর অনেকেই বুঝতে পারে, বলতে না পারলেও।'

'ওদের দুজনকে দেখে মিঃ মজুমদার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেটা লক্ষ করেছিলে নিশ্চয়ই।'

'তা তো বটেই।'

'অবিশ্যি মিঃ মজুমদারের মনটা যেন মাঝে মাঝেই অন্য দিকে চলে যায়, তাই না ?'

'হ্যাঁ, লোকটা সব সময় যেন কিছু একটা ভাবছে। সেটা হয়তো বোঝা যাবে ওঁর সম্বন্ধে গুজবটা কী সেটা জানলে।'

আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা ঘোরার পর হোটেলে ফিরলাম। ফেলুদা বলল, 'তুই আজ মনের আনন্দে শুটিং দেখিস ; আমার কথা চিন্তা করিস না। আমি ভাবছি, একবার অবজারভেটরি হিলের মাথায় গুম্‌ফাটা দেখে আসব।'

আমি ঠিক সময়ে সাড়ে এগারটায় বেরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে নয়নপুর ভিলায় পৌঁছে গেলাম। ফট ফট শব্দ শুনে বুঝলাম যে জেনারেটর চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা যে কোথায় রাখা হয়েছে,

boiRboi.net

তা বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওদের দলের একজন এগিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। এ দিকটা বাড়ির দক্ষিণ দিক, এ দিকে কাল আসিনি। একটা ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে, সেখানে জোরালো স্টুডিওর আলো জ্বলছে। জানালা বন্ধ করে বাইরে থেকে দিনের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম দৃশ্যটা বোধহয় রাত্রের দৃশ্য, যদিও তোলা হচ্ছে দিনের বেলা।

কিন্তু আমাদের জটায়ু কোথায় ?

ও মা—ওই তো ভদ্রলোক! কিন্তু প্রথমে দেখে একেবারেই চিনতে পারিনি—দাড়ি আর পরচুলায় চেহারা এত বদলে গেছে। দিব্যি ভিলেন-ভিলেন লাগছে ভদ্রলোককে। আমায় দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে বেশ ভারিক্কি চালে জিগ্যেস করলেন, 'কী মনে হচ্ছে ? চলবে ?'

আমি ভদ্রলোকের চেহারার তারিফ করে বললাম, 'আপনার কথাগুলো মনে আছে তো ?'

'আলবৎ!' ভীষণ কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক।

অন্য একটা সোফায় বসে মহাদেব ভার্মা তাঁর গোঁফে চাড়া দিচ্ছিলেন। এবার পুলক ঘোষালের গলা পেলাম।

'লালুদা !'

লালমোহনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসলেন। আমি একটা সুবিধের জায়গা বেছে নিয়ে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

পুলক ঘোষাল এবার লালমোহনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

'লালুদা, আপনি প্রথমে বুক পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে মুখে পুরবেন ; সেই সঙ্গে মহাদেবও একটা সিগারেট মুখে পুরবে। তার পর আপনি পকেট থেকে দেশলাই বার করে মহাদেবের সিগারেটটা ধরিয়ে দেবেন, তার পর নিজের চুরুটটা ধরাবেন। তার পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন। তখন আমি "ইয়েস" বলব। তাতে আপনি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপনার প্রথম কথাটা

boiRboi.net

বলবেন। এর পরেই শট্ শেষ। এই শট্টা কিন্তু প্রধানত আপনারই শট। ক্যামেরা আপনারই মুখ দেখছে, আর মহাদেবের দেখছে পিঠ। বুঝেছেন?'

'ইয়েস,' বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে একটা কথা।'

'বলুন।'

'এ দেশলাইটা জ্বলবে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একেবারে টাট্‌কা। আজই সকালে কেনা।'

'ভেরি গুড।'

মিনিটখানেক আরও আমড়াগাছির পর শট্ আরম্ভ হল। ক্যামেরা আর সাউন্ড চালু হল, আর পুলকবাবু বলে উঠলেন, 'অ্যাকশন!'

লালমোহনবাবু মুখে চুরুট পুরলেন ঠিকই, কিন্তু দেশলাইটা ধরাতে গিয়ে বারুদের দিকটা হাতে ধরে উল্টো দিকটা ঘষতে লাগলেন দেশলাইয়ের গায়ে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্—দেশলাই আর জ্বলে না, এ দিকে ক্যামেরা চলেছে ঘড়ঘড় শব্দ করে।

'কাট, কাট!' চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল। 'লালুদা, আপনার বোধহয়—'

'সরি ভাই, ভেরি সরি। এবার আর ভুল হবে না।'

দ্বিতীয়বার অবিশ্যি চুরুট আর সিগারেট ঠিকই জ্বলল, কিন্তু চুরুটে টানটা একটু বেশি মাত্রায় হওয়ায় লালমোহনবাবুর বিষম লেগে শট্টা নষ্ট হয়ে গেল, আর পুলক ঘোষালকে আবার চেঁচিয়ে বলতে হল, 'কাট, কাট!'

তিনবারের বার আর কোনও ভুল হল না। 'ও. কে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল, আর সকলে লালমোহনবাবুকে তারিফ করে হাততালি দিয়ে উঠল।

আশ্চর্য এই যে, আরও পাঁচ ঘন্টা লালমোহনবাবুকে নিয়ে কাজ হল আর তার মধ্যে ভদ্রলোক একটাও ভুল করলেন না। এর মধ্যে অবিশ্যি ভদ্রলোককে দু'বার বাথরুমে যেতে হয়েছিল; সেটা শীতের জন্যও হতে পারে আবার নার্ভাসনেসের জন্যও হতে পারে। মোট কথা, পুলক ঘোষাল স্যাটিসফাইড।

boiRboi.net

'কাল আবার সেম টাইমে লোক যাবে কিন্তু,' বললেন পুলকবাবু।

'লোক যাবার কোনও দরকার ছিল না ভাই,' বললেন লালমোহনবাবু। আমি এমনিই চলে আসতে পারতাম।

'না না, তা কি হয় ?' বললেন পুলকবাবু। 'আমরা সকলের জন্যই লোক পাঠাই। ওটা আমাদের একটা নিয়ম।'

লালমোহনবাবুর মেক-আপ তুলতে লাগল দশ মিনিট, তার পর প্রোডাকশনের একটা জিপে করে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম।

নিজের ঘরে না গিয়ে আমাদের ডাবল রুমে এসে লালমোহনবাবু বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ফেলুদাকে বলে দিলাম লালমোহনবাবুর কাজ খুব ভালো হয়েছে আর সকলে খুব তারিফ করেছে।

'বাঃ, তাহলে আর কী,' বলল ফেলুদা, 'তাহলে তো বাজিমাৎ। একটা নতুন দিক খুলে গেল। এবার আর শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক নয়, চলচ্চিত্রাভিনেতাও বটে।'

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখছেন, আরেকটু হলে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আপনাকে যে একটা অত্যন্ত জরুরী কথা বলার আছে।'

'কী ব্যাপার ?'

'শুনুন মন দিয়ে। আজ দেড়টায় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। আমি সেই ফাঁকে টুক্ করে একবার স্মল ওয়র্ক সারতে গিয়েছিলাম বাথরুমে। বাড়ির দক্ষিণে আমাদের কাজ হচ্ছে ; সে দিকে বাথরুম আছে, কিন্তু তার ভেতর এরা শুটিং-এর যাবতীয় মালপত্তর রেখেছে ; তাই আমাকে যেতে হল উত্তর দিকে—অর্থাৎ যে দিকে মিঃ মজুমদার থাকেন। প্রোডাকশনের একজন ছোকরাই আমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। আমি গেলুম। এটা একটা আলাদা বাথরুম, বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্ড্ নয়। আমি কাজ সেরে হাত ধুয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, বাইরে এসেই কানে কোনও

একটা ঘর থেকে শুনি মিঃ মজুমদারের গলা। ভদ্রলোক কাকে যেন কড়া গলায় শাসনের সুরে বলছেন, "ইউ আর এ লায়ার ; তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।" যদিও গলার স্বর চাপা, কিন্তু তাতে যে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'বাংলায় বললেন কথাটা ?'

'ঠিক আমি যেমন বললাম। প্রথম অংশ ইংরিজি, বাকিটা বাংলা।'

'তার মানে ভদ্রলোক তখনও ঘুমোননি ?'

'না ; কারণ কাল যখন লাঞ্চ ব্রেক হয়, তখনও ভদ্রলোককে দক্ষিণের বারান্দায় দেখেছি। উনি শুটিং দেখতে এসেছিলেন। সকালে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি দেড়টায় বড়িটা খান, তার পর ঘুমোন। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন দেড়টা বেজে মিনিট সাতেক হয়ে গেছে।'

'ভদ্রলোকের কথার উত্তরে অন্য লোকটি কিছু বললেন না ?'

'বলে থাকলেও সেটা এত চাপা গলায় যে, আমি শুনতে পাইনি। আমার আবার তখন তাড়া—লাঞ্চ রেডি—তাই আর অপেক্ষা না করে চলে এলাম। কিন্তু মিঃ মজুমদারই যে কথাটা বলেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তার মানে হয় রজত বোস, নাহয় নিজের ছেলে সমীরণ মজুমদারকে বলেছেন কথাটা।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'তবে একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে মশাই। এই সব বোম্বাই-অভিনেতাদের বিষয়ে যত কিছু শোনা যায়, আসলে তত কিছু নয়।'

'এটা কেন বলছেন ?'

'লাঞ্চের পর রায়নার সঙ্গে একটা শট ছিল, সেটা ছোকরার ভুলের জন্য পাঁচবার করে নিতে হল। সামান্য ডায়ালগ, তবু বার বার ভুল করছে।'

'ও রকম হয়েই থাকে,' বলল ফেলুদা, 'সেরা অভিনেতারও হঠাৎ হঠাৎ নার্ভ ফেল করতে পারে।'

boiRboi.net

সব শেষে জটায়ু বললেন, 'যেটুকু নার্ভাসনেস ছিল, আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আর কোনও ভাবনা নেই।'

৬

বজ্রপাতটা হল পরের দিন, তবে আসল ঘটনাটা সরাসরি না বলে আগে দিনটা কিভাবে গেল বলি।

দিনটা মেঘলা, তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে আড়ালে। আমি ফেলুদার সঙ্গে সকালে বেরিয়ে একটু কেনাকাটা সেরে, বার্চ হিল রোড দিয়ে খানিকদূর বেড়িয়ে এগারোটা নাগাত রওনা দিলাম নয়নপুর ভিলায়। গতকাল রাত্রেও ফেলুদা লালমোহনবাবুকে তালিম দিয়েছে। এবারে সাড়ে তিনের জায়গায় সবসুদ্ধ পাঁচ লাইন ডায়ালগ। আজ আর চুরুট-সিগারেট ধরানোর ব্যাপার নেই, তাই সেদিক থেকে বাঁচোয়া।

লালমোহনবাবুর সাতটা শট ছিল। সাড়ে নটায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। আড়াইটেয় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। লাঞ্চের আগে চারটে, পরে তিনটে শট হয়ে সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু ফ্রি হয়ে গেলেন। পুলক ঘোষাল বলল, 'জিপের ব্যবস্থা আছে লালুদা, আপনি এনি টাইম যেতে চাইলে যেতে পারেন।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আজ যখন তাড়াতাড়ি শেষ হল, তখন ভাবছি হেঁটেই বাড়ি ফিরব ; গাড়ির দরকার নেই।'

'জাস্ট অ্যাজ ইউ লাইক,' বলল পুলক ঘোষাল।

পুলক ঘোষাল চলে গেলে পর লালমোহনবাবু বললেন, 'এদের চা-টা বেশ ভালো ; এক্ষুনি চা দেবে, সেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

দেড় মাইলের উপর রাস্তা, তাই চা খেয়ে পাঁচটা নাগাত বেরিয়ে হোটেল পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই দেখি ফেলুদা গায়ে জ্যাকেট চাপাচ্ছে।

'বেরোচ্ছ নাকি ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

ফেলুদা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'তোরা ছিলি না ওখানে ? তোরা শুনিস্‌নি ?'

'আমরা তো আধ ঘন্টা হল বেরিয়েছি, তখন পর্যন্ত তো কিছু শুনিনি। কী ব্যাপার ?'

'মিঃ মজুমদার খুন হয়েছেন।'

'অ্যাঁ !'

আমরা দুজনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ভদ্রলোক সাড়ে বারোটা নাগাত আমায় ফোন করেছিলেন। বললেন আমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, সেটা সন্ধ্যায় আমার এখানে এসে বলবেন। আর তার পর এই ব্যাপার।'

'তুমি খবর পেলে কী করে ?'

'ওঁর ছেলে ফোন করেছিলেন এই পাঁচ মিনিট আগে। পুলিশে খবর দিয়েছেন, কিন্তু আমাকেও যেতে বললেন। পাঁচটার পরেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙছে না দেখে সমীরণবাবু ওঁর ঘরে ঢোকেন ; বাবাকে কী যেন একটা বলার ছিল। দরজাটা কেবল ভেজানো ছিল ; মিঃ মজুমদার ছিটকিনি লাগাতেন না কখনো। ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত কাণ্ড। বুকে ছোরা মেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায়। ওঁর বাড়ির ডাক্তার এসে বলে গেছেন ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। শুটিং অবশ্যই বন্ধ হয়ে গেছে, এবং স্বভাবতই কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে। কারণ পুলিশ তদন্ত করবে। যাই হোক—আমি তো চললাম। তোরা কি থাকবি, না আমার সঙ্গে যাবি ?'

'থাকব কী !' বললেন লালমোহনবাবু। 'এর পরে কি আর থাকা যায় ? চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

আমরা তিনজন যখন নয়নপুর ভিলা পৌঁছালাম, তখন সোয়া ছটা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শুটিং-এর দলের সকলেই রয়েছে। পুলক ঘোষাল কাছেই ছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো ! ভারি মাই ডিয়ার লোক ছিলেন মিঃ মজুমদার। এক কথায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন।'

বাড়ির বাইরে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

আমরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনের বারান্দায়

একজন ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি। আমি ইন্সপেক্টর যতীশ সাহা।'

করমর্দন শেষ হবার পর ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার? কী বুঝলেন?'

'ঘুমের মধ্যেই খুনটা হয়েছে, যত দূর মনে হয়।'

'কী দিয়ে মেরেছে?'

'একটা ভুজালি। সেটা বুকেই ঢোকানো রয়েছে। ওটা নাকি মিঃ মজুমদারের ঘরেই থাকত।'

'আপনাদের ডাক্তার এসেছেন কি?'

'এই এলেন বলে। আসুন না ভিতরে।'

মিঃ মজুমদারের শোবার ঘরটা বেশ বড়। আমি আর লালমোহনবাবু দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইলাম, ফেলুদা ভিতরে গেল। মৃতদেহ সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে।

'একটা কথা আপনাকে বলে দিই,' ফেলুদাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন যতীশ সাহা, 'আমরা তো যথারীতি আমাদের ইনভেসটিগেশন চালিয়ে যাব, তবে আপনি যখন এখানে রয়েছেন, তখন আপনিও আপনার নিজের তরফ থেকে যা করতে চান, করতে পারেন। কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস্ পরস্পরকে জানালে বোধহয় কাজের দিক দিয়ে সুবিধা হবে।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল ফেলুদা। 'আর আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি এগোতেই পারব না।'

সমীরণবাবু এসেছেন ঘরে। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, চুল উস্কোখুস্কো।

ফেলুদা তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাপারটা তো আপনিই ডিসকাভার করেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন সমীরণবাবু। 'বাবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠে গিয়ে বারান্দায় বসতেন। তার পর লোকনাথ চা এনে দিত। আজ সোয়া পাঁচটায় বাবাকে জায়গায় না দেখে ভাবলাম ব্যাপার কী। খট্‌কা লাগল, তার পর বাবার শোবার ঘরে

গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি এই কাণ্ড।'

'এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে ? আপনার নিজের কোনও ধারণা হয়েছে এ সম্বন্ধে ?'

ফেলুদা প্রশ্ন করতে করতে ঘরটা পায়চারি করে দেখছে, কোনও কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

'কেবল একটা কথা বলার আছে,' বললেন সমীরণবাবু।

'কী ?'

'ঘরে একটা জিনিস মিসিং।'

'কী জিনিস ?'

আমরা সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টি দিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

'অষ্টধাতুর একটা বালগোপাল,' বললেন সমীরণবাবু। 'এটা ছিল আমাদের নয়নপুরের বাড়ির মন্দিরে। অনেক দিনের সম্পত্তি, এবং অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস।'

'কোথায় থাকত এটা ?'

'ওই তাকের উপর। ভুজালিটার পাশেই।'

সমীরণবাবু ঘরের একটা সেল্‌ফের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

যতীশ সাহা বললেন, 'এমন একটা জিনিস সিন্দুকে না রেখে বাইরে রাখা হত কেন ?'

'তার কারণ বাবা তো রাত্রে ঘুমোতেন না, আর সঙ্গে রিভলবার থাকত, তাই কোনও বিপদ আছে বলে মনে করেননি।'

'তা হলে তো রবারি-ই মোটিভ বলে মনে হচ্ছে', বললেন সাহা। 'জিনিসটার দাম কত হবে ?'

'তা ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার তো হবেই। সোনার অংশ বেশ বেশি ছিল।'

ফেলুদা খাটের পাশের টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে বলল, 'শিসটা ভাঙা, এবং ভাঙা টুকরোটা পাশেই পড়ে আছে।'

আমি দেখলাম পেনসিলের পাশে একটা ছোট্ট প্যাডও রয়েছে।

ফেলুদা নিচু হয়ে প্যাডের উপরের কাগজটা দেখছিল। তার পর বিড়বিড় করে বলল, 'ওপরের কাগজটা ছিঁড়েছে বলে মনে হচ্ছে...'

এবারে ও আরও নিচু হয়ে টেবিলের চার পাশের মেঝেটা

দেখতে লাগল। তার পর মেঝে থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল, 'পেয়েছি।'

আমি দূর থেকেই বুঝলাম প্যাডের কাগজের উপর কী যেন একটা লেখা রয়েছে।

কাগজটা নিজে ভালো করে দেখে ফেলুদা সেটা সাহার দিকে এগিয়ে দিল। সাহা কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটা পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বিষ?'

'তাই তো লিখছেন ভদ্রলোক', বলল ফেলুদা। 'আর যে ভাবে "ষ"-এর পেট কাটা হয়েছে, মনে হয় তার পরেই মৃত্যুটা হয়, এবং শিস ভেঙে পেনসিলটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর কাগজটাও প্যাড থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে।'

'কিন্তু বিষ কথাটা লিখবার অর্থ কী?' বললেন সাহা, 'যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে?'

boiRboi.net

'সেটাই তো ভাবছি,' ভ্রূকুটি করে বলল ফেলুদা। তার পর সমীরণবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'মিঃ মজুমদারের ঘুমের ওষুধ কোথায় থাকত, জানেন ?'

'ডাইনিং রুমে একটা বোতলের মধ্যে', বললেন সমীরণবাবু। 'দোকান থেকে এলেই লোকনাথ টিন-ফয়েল ছিঁড়ে বড়িগুলো বার করে বোতলে রেখে দিত।'

'সেই বোতলটা একবার আনতে পারেন ?'

সমীরণবাবুর ফিরে আসতে যেন একটু বেশি সময় লাগল। আর যখন এলেন, তখন ভদ্রলোকের মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'বোতল নেই', ধরা গলায় বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল, সে যেন এটাই আশা করছিল। বলল, 'গত পরশু সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই ভদ্রলোক একমাসের স্টক কিনলেন ওই ওষুধের।' তার পর সাহার দিকে ফিরে বলল, 'এই বড়ির খান ত্রিশেক একসঙ্গে একজন মানুষকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হতে পারে না ?'

'এটা কী বড়ি ?'

'টফ্রানিল। অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল্‌স।'

'তা নিশ্চয়ই হতে পারে', বললেন সাহা।

'এবং তখন সে বড়িকে বিষ বলা যেতে পারে না ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে বিষ কথাটার একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও...'। ফেলুদার যেন খট্‌কা লাগছে। একটু ভেবে বলল, 'যে লোককে খুন করা হচ্ছে, সে যদি মরার পূর্বমুহূর্তে কিছু লিখে যায়, তা হলে কী ভাবে তাকে মারা হচ্ছে সেটা না লিখে সে যাকে আততায়ী বলে সন্দেহ করছে তার নামটাই লিখে যাবে না কি ?'

'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন', বললেন সাহা, 'কিন্তু এক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেটা করেননি সেটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।...ভালো কথা, একবার বেয়ারা লোকনাথকে ডাকলে হত না ?'

ফেলুদা প্রস্তাবটা সমর্থন করে সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরণবাবু ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে লোকনাথের খোঁজে বেরিয়ে

গেলেন।

ফেলুদার চোখ থেকে যে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'লোকনাথ দেড়টা নাগাত একবার দক্ষিণের বারান্দায় এসেছিল মিঃ মজুমদারকে ডাকতে। কিন্তু মিঃ মজুমদার তৎক্ষণাৎ যাননি।'

'তার মানে আজকে তাঁর নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়েছিল,' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন লালমোহনবাবু। 'মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক শুটিং-এর ব্যাপারটাতে বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলেন। রায়না আর ভার্মাকে সুযোগ পেলেই নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন।'

সমীরণবাবু ঘরে ফিরলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলাম, খবর ভালো না। কিন্তু যা শুনলাম, ততটা তাজ্জব খবর আমি আশা করিনি।

'লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না', বললেন সমীরণবাবু।

'পাওয়া যাচ্ছে না ?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'না', বললেন সমীরণবাবু। 'সে দেড়টার কিছু পর থেকেই মিসিং। চাকররা দুটো নাগাত খেতো—লোকনাথ খায়ওনি। কোথায় গেছে, কখন গেছে, কেউ বলতে পারছে না।'

'রজতবাবু তাকে কোথাও পাঠাননি তো ?'

'না। উনি কিছু জানেনেই না। বললেন, দুপুরের খাবার পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেই উনি ঝাউবনে বেড়াতে যান। এটা ওঁর একটা বাতিক আছে। উনি দুপুরে ঘুমোন না।'

কথাটা যে সত্যি সেটা জানি। কারণ শুটিং-এ লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি একবার ঝাউবনে গিয়েছিলাম ছোট কাজ সারতে। তখন রজতবাবু ঝাউবন থেকে ফিরছিলেন।

'এই লোকনাথ বেয়ারা কতদিনের ?' জিগ্যেস করলেন সাহা।

'বছর চারেক', বললেন সমীরণবাবু। 'আগের বেয়ারা রঙ্গলাল খুব পুরনো লোক ছিল। সে হঠাৎ হেপাটাইটিসে মারা যায়। লোকনাথ খুব ভালো রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল। একটু লিখতে-পড়তেও পারত। বাবার ছবির ব্যাপারে রজতবাবুকে ও

সাহায্য করত।'

'তা হলে তো মনে হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে', বললেন সাহা। 'আপনাদের টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই', বলে সমীরণবাবু সাহাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-টা কেন দেওয়া হল, সেটা তো বুঝতে পারছি না ফেলুবাবু', বললেন লালমোহনবাবু। 'চুরিই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে তো সে কাজটা ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে বেহুঁশ করেই হয়ে যায়। আবার ছোরা কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'মনে হয় শুধু বড়িতে আততায়ী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। হয়তো যে সময় মূর্তিটা চুরি করতে এসেছিল, সেই সময় মজুমদার একটু নড়াচড়া করেছিলেন। বড়ির অ্যাকশন হতে তো সময় লাগে ! এই নড়াচড়া দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে ছোরাটা মারা হয়েছে। এবং তার পর মূর্তিটা সরানো হয়েছে।'

'কিন্তু তা হলে "বিষ"টা কখন লেখা হল ?'

'সেটা অবিশ্যি ছোরা মারার আগেই হয়েছে—যখন মজুমদার প্রথম বুঝেছেন যে, তাঁকে কিছু একটা খাইয়ে বেহুঁশ করার চেষ্টা হয়েছে। লেখাটা লিখেই উনি অন্তত সাময়িকভাবে সংজ্ঞা হারান। এ ছাড়া আর কোনও সমাধান আপাতত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফেলুদা যে খুশি নয় সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

সাহা ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসেছিলেন ; বললেন, 'আমার কাছে ইট সার্টেনলি মেক্স সেন্স। ...যাক্ যে, আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমার অন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমি এ বাড়ির এবং ফিল্মের দলের সকলকে জেরা করতে চাই।'

'একটা কথা', বললেন লালমোহনবাবু। 'ফিল্মের দলের মধ্যে সকলের কিন্তু বাড়ির উত্তর দিকের বাথরুম ব্যবহার করার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল পরিচালক পুলক ঘোষালের, ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ, রায়না, ভার্মা, আর আমার।'

'তা হলে শুধু তাদেরই জেরা করা হবে', বললেন সাহা।

'মানে, আমাকেও ?' ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'তা তো বটেই', বলল ফেলুদা। 'সুযোগ যাদের ছিল, তাদের মধ্যে আপনি তো একজন বটেই।'

সাহা বললেন, 'এ ছাড়া আছে বাড়ির লোক। অর্থাৎ—' ভদ্রলোক সমীরণবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

সমীরণবাবু বললেন, 'অর্থাৎ আমি, রজতবাবু, চাকর বাহাদুর, আর রান্নার লোক জগদীশ।'

'ভেরি গুড।'

৭

পরদিন সকালে সাড়ে নটায় পুলক ঘোষাল আমাদের হোটেলে এলেন। 'আপনাদের জেরা শেষ ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল ভদ্রলোককে।

'তা শেষ', বললেন পুলক ঘোষাল। 'কাল রাত সাড়ে নটায় ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল দেখুন তো। যদ্দিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে, তদ্দিন তো ও-বাড়িতে শুটিং বন্ধ। অবিশ্যি সমীরণবাবু বলেছেন যে সব মিটে গেলে ওঁদের বাড়িতে আবার কাজ করতে দেবেন, কিন্তু সেটা কবে তা কে বলতে পারে ? কত টাকা লস্ হল আমাদের ভাবতে পারেন ?'

লালমোহনবাবু চুকচুক করে সহানুভূতি জানালেন।

'তবে এটা ঠিক', বললেন পুলকবাবু, 'একটা প্রোডাকশনে বাধা পড়লে সচরাচর সে ছবি হিট হয়। আর, একটা কথা আপনি জানবেন লালুদা—আপনার গপ্পের মার নেই।'

পুলকবাবু চলে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ইন্‌স্পেক্টর যতীশ সাহা এলেন। বললেন, 'নো পাত্তা অফ লোকনাথ বেয়ারা। আমরা শিলিগুড়িতে পর্যন্ত লোক লাগিয়ে দিয়েছি। তবে আমার মনে হয় ইট্‌স এ ম্যাটার অফ টাইম। এখন হয়তো কোনও ভুটিয়া বস্তিতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে; সুনার অর লেটার ধরা পড়তে বাধ্য।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা কলকাতায় যাবার তাল করেছে ; সেইখানেও মূর্তিটা পাচার করবে। আশ্চর্য—সিধে মানুষও লোভে পড়লে কি রকম বেঁকে যায় !'

'আপনার জেরা তো হয়ে গেছে শুনলাম,' বলল ফেলুদা।

'তা হয়েছে', বললেন সাহা। 'এতে একটা জিনিস প্রমাণ হল যে, ফিল্ম শুটিং-এর ব্যাপারে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বেশ কিছুটা করে সময় কাটিয়েছে শুটিং দেখে। মিঃ মজুমদার তাঁর রুটিন ব্রেক করলেন—ভাবতে পারেন ? অথচ ওঁর জীবনটা চলন্ত ঘড়ির কাঁটার মতো !'

ফেলুদা বলল, 'সুযোগের ব্যাপারটা কী মনে হল ? মোটিভটা এখন থাক।'

'এখানে অবিশ্যি দুটো ব্যাপার দেখতে হবে', বললেন সাহা। 'এক, দুধে বড়ি মেশানো, আর দুই, ছোরা মেরে মূর্তি চুরি। দেড়টা নাগাত লোকনাথ দুধ রেডি করে মজুমদারকে খবর দিতে গেল। সে নিজেই ত্রিশটা বড়ি মেশাতে পারে। অথবা সে যখন ছিল না, তখন অন্য লোক কাজটা করতে পারে। রজতবাবু বললেন তখন উনি নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন। সমীরণবাবুও বললেন তিনি নিজের ঘরে ছিলেন। এ সবের অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই। চাকর বাহাদুর আর রান্নার লোক জগদীশ শুটিং দেখছিল। দিস ইজ এ ফ্যাক্ট।'

'আপনাদের ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কী বলেন ?'

'বলছেন আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে স্ট্যাবিং হয়েছে। ছুরিকাঘাতেই যে মৃত্যু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তা না হলে এতো ব্লিডিং হত না।'

'লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল ?'

'কেউ না। আসলে সকলের মনই শুটিং-এর দিকে পড়ে ছিল।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন ; এবার বললেন, 'আমার জেরাটা এখন সেরে নিলেই ভাল হত না ?'

'নিয়মমতো কালকেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল।' বললেন

boiRboi.net

ইন্সপেক্টর সাহা, 'কিন্তু আপনি মিঃ মিত্তিরের বন্ধু বলে আর ইনসিস্ট করিনি। যাই হোক, এবার আপনি বলুন গতকালের ঘটনাগুলো।'

'আমি পৌঁছেছি নটায়', বললেন লালমোহনবাবু। 'তার পর মেক-আপ করতে লেগেছে এক ঘণ্টা। যে ঘরে শুটিং, তার পাশেই দক্ষিণের বারান্দা ; আমরা অভিনেতারা আমাদের ডাকের অপেক্ষায় সেখানেই বসেছিলাম। সেখানে একটা ব্যাপার হয়। মিঃ মজুমদার সাড়ে দশটা নাগাত একবার এসে রায়না আর ভার্মাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে যান মিনিট পাঁচেকের জন্য। পরে রায়না আমাকে বলে যে, মজুমদার তাঁদের একটা মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি সেটা ছিল ওই বালগোপালটা।'

'তার পর ?' প্রশ্ন করলেন সাহা।

'তার পর এগারোটার সময় আমার আর ভার্মার ডাক পড়ে। আমরা দুজনে শুটিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হই। দশ মিনিটের মধ্যে শট্ আরম্ভ হয়। লাঞ্চের আগে চারটে শট্ হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় শটের পর সাড়ে বারোটা নাগাত আমি একবার বাথরুমে যাই।'

'তখন আর কাউকে দেখেছিলেন কি ?'

'না। বাথরুম থেকে ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে রিহার্সালের জন্য ডাকা হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিন নম্বর শট্ হয়। তার পর আমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছিল। সেই সময়টা আমি দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলাম।'

'একা ?'

'আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মা ছিল, আর মিঃ মজুমদার এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ওঁকে লোকনাথ খবর দিতে আসে ওঁর দুধ রেডি আছে বলে। তার পাঁচ-সাত মিনিট পরে মজুমদার চলে যান। পৌনে দুটোর সময় আমার ডাক পড়ে চার নম্বর শটের জন্য। এটা ছিল শুধু আমার একার শট। এর পরেই আড়াইটায় লাঞ্চ ব্রেক হয়। তখন আমি একবার বাথরুম যাই হাত ধুতে। আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মাও গিয়েছিল।'

'কে প্রথমে হাত ধোয় ?'

'আমি। তার পর আমি চলে আসি। খেতে সবসুদ্ধ মিনিট কুড়ি লাগে। তার পর আমি বারান্দাতেই বসেছিলাম। তপেশ ছিল আমার সঙ্গে।'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

লালমোহনবাবু বলে চললেন, 'এই সময়টা রায়না আর ভার্মা কোথায় ছিল লক্ষ করিনি। তিনটের সময় আবার কাজ শুরু হয়। আমার পাঁচ নম্বর শট শেষ হয়ে সাড়ে তিনটেয়। তার পর আলো চেঞ্জ করার জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের একটা বিরতি ছিল।'

'তখন আপনি কী করছিলেন?'

'আমি, রায়না আর ভার্মা দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। তপেশও ছিল কাছাকাছি বসে।'

আমি আবার সায় দিলাম।

'ভার্মা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ওঁর অভিজ্ঞতা বলছিলেন আমাদের।'

'এই পুরো সময়টাই কি আপনারা তিনজনে একসঙ্গে ছিলেন?'

লালমোহনবাবু একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন। তার পর বললেন, 'ভার্মা বোধ হয় একবার উঠে গিয়েছিল মিনিট পাঁচেকের জন্য। তখন রায়না বোম্বাই ফিল্‌ম জগতের গসিপ্ শোনাচ্ছিলেন। তার পর—'

'আর দরকার নেই, এতেই হবে', বললেন ইন্সপেক্টর। 'তবে লোকনাথকে যে বিকেলের দিকে আর দেখেননি, সেটা আপনার মনে আছে?'

'লোকনাথ...লোকনাথ...উঁহু, লোকনাথকে আর দেখিনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার', বলে সাহা উঠে পড়লেন। তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিও তো ছিলে ওখানে?'

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'তোমার কিছু বলার আছে?'

'লালমোহনবাবু যা বলেছেন, সবই ঠিক বলেছেন। আমি শুধু একবার আড়াইটের সময় পিছনে ঝাউবনে যাই বাথরুম সারতে। তখন রজতবাবুকে দেখি, উনি বাড়ির দিকে ফিরছেন। দেখে মনে

boiRboi.net

হল যেন একটু হাঁপাচ্ছেন।

সাহা বললেন, 'ভদ্রলোক জেরাতেও বলেছিলেন যে, মাঝে মাঝে দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে উনি ঝাউবনে বেড়িয়ে আসেন। গতকালও গেছেন বলে বলছিলেন। ভালো কথা, দুপুরে যে লাঞ্চটা হত, তাতে কি শুধু ফিল্মে যারা কাজ করছে তারাই অংশগ্রহণ করত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন লালমোহনবাবু। 'সমীরণবাবু আর রজতবাবুকেও অফার করেছিল পুলক, কিন্তু ওঁরা রাজি হননি।'

'ভালো কথা', বললেন সাহা। 'ভুজালির হাতলে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা বোধহয় আশাও করা যায়নি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে।'

'কী প্রশ্ন?'

'খুনের টাইমটা সাড়ে চারটে হওয়ার চেয়ে আড়াইটা হওয়াই বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয় না কি?'

'কেন বলুন তো?'

ধরুন যদি লোকনাথই অপরাধী হয়, সে স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি পারে তার কাজ সেরে ফেলবে। দেড়টায় সে বড়ি মিশিয়েছে দুধে—আটাশখানা—তার পর তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে কেন? যদি মূর্তিটা নেবার সময় সে ছোরা মেরে থাকে—যেটা স্বাভাবিক—তা হলে সেটা এত পরে করবে কেন?'

'গুড পয়েন্ট', বললেন সাহা। 'অবিশ্যি আড়াইটায় খুনটা হলে সেটা ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যায় না।'

ইনস্পেক্টর সাহা উঠে পড়লেন। বললেন, তাঁকে একবার নয়নপুর ভিলায় যেতে হবে। ঘর থেকে বেরোবার সময় ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না কেন বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা কিছু না। আসলে আমি খুব জটিল কেস হ্যান্ডেল করে অভ্যস্ত। এটা কেমন যেন বেশি সরল বলে মনে হচ্ছে। এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তাই সেটাকে

সহজে গ্রহণ করতে পারছি না।'

'এ আবার আপনার বাড়াবাড়ি মশাই', বললেন সাহা। 'আমরা সহজ কেস হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আর আপনি দেখছি তার ঠিক উল্টো। এইখানেই পুলিশ আর শখের গোয়েন্দার তফাত।'

সাহা চলে গেলেন, কিন্তু ফেলুদার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা রয়েই গেল। ও শেষে বলল, 'একটা সামান্য সহজ জিনিস নিয়ে এত ভাবার কোনও মানেই হয় না। লোকনাথকে খুঁজে বার করবে পুলিশ; সেখানে আমার কিছু করারই নেই। চল, একটু বেড়িয়ে আসি ম্যালে।'

আজকের দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন, তার ফলে শীতটাও একটু বেশি, তাই বোধহয় ম্যালে বেশি লোক নেই। আমরা তিনজন এগিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসলাম।

ভারী অদ্ভুত লাগছে কুয়াশার মধ্য ম্যালটাকে। এতই কুয়াশা যে দশ হাত দূরের লোককে দেখা যায় না। কাছে এলে মনে হয় হঠাৎ যেন শূন্য থেকে বেরিয়ে এল। সেই ভাবেই বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকেই। তার পর ফেলুদার দিকে চেয়ে হাত দুটো জোড় করে বললেন, 'নমস্কার!'

৮

ফেলুদাও প্রতিনমস্কার করল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় কেভেনটারসে সামান্য পরিচয় হয়েছিল আমাদের—আপনার মনে আছে বোধ হয়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাম তো হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়?'

'বাঃ, আপনার মেমরি তো বেশ শার্প দেখছি। তা, একটু বসতে পারি আপনাদের পাশে?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা ওর নিজের আর লালমোহনবাবুর মাঝখানে একটু জায়গা করে দিল। ভদ্রলোক বসলেন।

amarboi.net

'আপনি তো নয়নপুর ভিলার পাশেই থাকেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উত্তর দিকের বাড়িটা আমার। আমি আছি এখানে প্রায় এগারো বছর।'

'আপনার বাড়ির পাশেই তো একটা ট্র্যাজিডি হয়ে গেল।'

'তা তো বটেই', বললেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু এর একটা আঁচ তো আগে থেকেই পাওয়া গেস্‌ল, তাই নয় কি ?'

'আপনার তাই মনে হয় ?'

'এ কথা বলছি, কারণ বিরূপাক্ষ মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল বলতে পারি না, কারণ মজুমদার যে খুব মিশুকে লোক ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই।'

'কী করে জানলেন ?'

'আমি এককালে বছর দশেক ছিলাম মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। আমার পেশা ছিল জিওলজি। ইট পাথর নিয়ে কারবার ছিল আমার। সেই নীলকণ্ঠপুরে একবার আসেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। তখন ওঁর বয়স ছিল হয়তো পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। শিকারের খুব শখ ছিল ভদ্রলোকের। নীলকণ্ঠপুরের রাজা পৃথ্বী সিং মজুমদারকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর জঙ্গলে গিয়ে শিকার করার জন্য। পরস্পর আলাপ ছিল আগে থেকেই। এই দুই শিকারীর মধ্যে একটা মিল ছিল। সেটা এই যে, কেউই মাচার উপর থেকে শিকার করতে চাইতেন না। এমন কি হাতির পিঠ থেকেও না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিটারদের সাহায্য না নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে বাঘ শিকার করা। এই শিকার থেকেই হয় এক চরম দুর্ঘটনা।'

'কি রকম ?'

'বাঘের বদলে মানুষের উপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার।'

'সে কি !'

'ঠিকই বলছি।'

'মানে, কোনও স্থানীয় অধিবাসী-টাসী— ?'

'না। তা হলে তো তবু কথা ছিল। যিনি মরেছিলেন, তিনি

ছিলেন ভদ্রলোক এবং বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। বাঙালি হলেও বাপের আমল থেকে মধ্যপ্রদেশবাসী। পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজ ইতিহাসের প্রফেসারি, কিন্তু প্রচণ্ড শখ ছিল কবিরাজীর। রাজা এবং মজুমদার যে সময় বাঘ খুঁজছিলেন, সেই সময় ব্রহ্ম ঘুরছিলেন জঙ্গলে গাছড়ার অনুসন্ধানে। তাঁর গায়ে একটা গেরুয়া চাদর ছিল। একটা ঝোপের পাতা নড়তে দেখে আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে গেরুয়া দেখে বাঘ ভেবে গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার। সে গুলি গিয়ে লাগে সুধীর ব্রহ্মের পেটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

'এ খবর যাতে না ছড়ায়, তার জন্য বিস্তর টাকা খরচ করতে হয়েছিল পৃথ্বী সিং-কে। আমি নিজে জানি, কারণ আমি ছিলাম ব্রহ্মের বন্ধুস্থানীয়। মজুমদার কলঙ্কের হাত থেকে পার পায় ঠিকই, কিন্তু সে যে অপরাধী, সে যে হত্যাকারী, বাঘ মারতে সে যে মানুষ মেরে ফেলেছিল, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই! এই অপরাধের বোঝা বয়ে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে?'

'আপনার কি মনে হয়, এবার যে-খুন হয়েছে, তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও যোগ আছে?'

'একটা ব্যাপার আছে। আপনি গোয়েন্দা, আপনি হয়তো বর্তমানে হত্যা নিয়ে ভাবছেন, তাই আপনাকে বলছি। সুধীর ব্রহ্মর একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রহ্ম। এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তখন ছেলেটির বয়স ষোল। সে কিন্তু এই ধামা চাপা দেওয়ার ব্যাপারটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি। আমাকে কাকা বলে সম্বোধন করত রমেন। সেই সময়ই সে বলেছিল যে বড় হয়ে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। এখন তার বয়স হওয়া উচিত আটত্রিশ।'

'আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছিল?'

'না। আমি নীলকণ্ঠপুর ছাড়ি আজ থেকে বিশ বছর আগে। কিছুকাল ছোট নাগপুরে ছিলাম। তার পর রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং-এ। আমার বাড়িটা আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানি না। ছোট্ট কটেজ বাড়ি। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। আমার একটি ছেলে, সে কলকাতায় প্লিডার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে

বাইরে রয়েছে।'

'আপনার কি ধারণা, সুধীর ব্রহ্মের সেই ছেলে এখন এখানে রয়েছে?'

'তা বলতে পারব না ; আর বাইশ বছর পরে তাকে দেখলে হয়তো চিনতেও পারব না। কিন্তু সে বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে কথা আমি জানি।'

ভদ্রলোক যে ঘটনাটা বললেন, সেটা যে খুবই আশ্চর্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বুঝতে পারছিলাম যে, এ কাহিনী ফেলুদাকে নতুন করে ভাবাবে।

ফেলুদা বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সে ছেলে যদি এখন এখানে নাও থাকে, মিঃ মজুমদারের জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে এটা শুনে খুবই অবাক লাগছে। তাঁর জীবনে যে কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছিল সে রকম ইঙ্গিত দু'-একবার পেয়েছি, এমন কি আপনিও দিয়েছেন, কিন্তু সেটা যে এমন একটা ঘটনা, তা ভাবতে পারিনি। আর আপনি নিজেই যখন সে সময় নীলকণ্ঠপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।'

হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। ফেলুদার কপালে নতুন করে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে। আমার মন বলছে এবার আর কেসটাকে তেমন সহজ বলে মনে হচ্ছে না ফেলুদার। খানিকটা পথ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ও বলল, 'এই কাহিনী আমার চিন্তাকে সাহায্য করবে না ব্যাহত করবে সেটা বুঝতে পারছি না। এখন এই শহরের অবস্থা যেমন, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। একরাশ কুয়াশা এসে চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যদি একটু সূর্যের আলো দেখতে পেতাম!'

আমরা হাঁটিতে হাঁটতে অবজারভেটরি হিল রোডের পুব দিকটায় এসে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার মনের ভিতরটা ছটফট করছে, তাই সে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

কুয়াশার মধ্যেই একজন নেপালি একটা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে

এল, পিঠে কোনও সওয়ার নেই। 'বাবু ঘোড়া লেগা, ঘোড়া ?' বলে উঠল লোকটা, কিন্তু আমরা তাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম। সামনে বাঁয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা, ডাইনে খাদ, আমরা সে খাদ বাঁচিয়ে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে চলেছি। রাস্তার পাশের রেলিংটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায়। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে সামনে উত্তরে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইনটা দেখা যায় ; আজ আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে রয়েছে একটা দুর্ভেদ্য সাদা দেয়াল।

এবার পাশের রেলিংটা ফুরিয়ে গেছে। এখন ডাইনে রাস্তার ধারেই খাদ। আমরা এখনও পাহাড়ের দিক ঘেঁষে চলেছি, যদিও দেখছি ফেলুদা, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে একটু বেশি ডান দিকে চলে যাচ্ছে। লালমোহনবাবু খালি বলছেন, 'মিস্টিরিয়াস, মিস্টিরিয়াস'...। তার পর একবার বললেন, 'মশাই, মিস্ট থেকেই মিস্ট্রি আর মিস্টিরিয়াস এসেছে নাকি ?'

হঠাৎ আমাদের পিছনে ফিরতে হল, কারণ দ্রুত পায়ের শব্দ পেয়েছি। কিন্তু কই, এখনো তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না ! অথচ পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসছে। তার পর হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। তার মুখ ভালো করে দেখার আগেই সে মূর্তি ফেলুদাকে সজোরে মারল একটা ধাক্কা খাদের দিকে। ফেলুদা টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল—চারিদিক কুয়াশায় কুয়াশা !

ইতিমধ্যে মূর্তিও আবার কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তার দ্রুত পায়ের শব্দ।

লালমোহনবাবুর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, কী সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আর সেই সঙ্গে দুটো নেপালি সামনের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এল, আর আমাদের দেখেই জিগ্যেস করল, 'কেয়া হুয়া, বাবু ?'

আমরা বললাম কী হয়েছে। আমাদের সঙ্গের লোক খাদে পড়ে গেছে জেনেই তারা দুজন অনায়াসে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচে নেমে গেল—'এক মিনিট ঠাহরিয়ে বাবু, হাম্ দেখ্‌তা হ্যায় কেয়া হুয়া।'

লোক দুটোও কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু মুহূর্তেই

boiRboi.net

কুয়াশাও হঠাৎ পাতলা হয়ে চারদিকে সব কিছু যেন আবছা আবছা দেখা যেতে লাগল। কে যেন একটা ফিন্‌ফিনে চাদর টেনে সরিয়ে নিচ্ছে সমস্ত দৃশ্যের উপর থেকে।

নীচে ওটা কী ?

একটা গাছ। রডোডেনড্রন বলেই তো মনে হচ্ছে। তার গুঁড়ির সঙ্গে লেগে একটা মানুষ পড়ে আছে। ফেলুদা ! ওই যে তার খাকি জার্কিন আর লাল-কালো চেক্ মাফলার।

নেপালি দুটো মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে গেছে, তার পর ফেলুদাকে দু' হাতে ধরে তুলতেই যেন ফেলুদারও হুঁশ ফিরে এসেছে।

'ফেলুদা !'

'ফেলুবাবু !'

আমাদের দুজনের ডাকের উত্তরে ফেলুদা তার ডান হাতটা তুলে আশ্বাস দিল যে, সে ঠিকই আছে।

তার পর সে খাড়াই দিয়ে উঠে এল দুই নেপালির সাহায্যে—আমাদের চরম বিপদের সময় দুই আচমকা বন্ধু।

পাঁচ মিনিটের কসরৎ ও চেষ্টার পর ফেলুদা পৌঁছে গেল আমাদের কাছে—সে হাঁপাচ্ছে, তার কপাল ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, হাতেও আঁচড় লেগেছে, তাতে রক্তের আভাস।

'বহুৎ সুক্রিয়া !' ফেলুদা বলল তার উদ্ধারকারীদের।

তারা দুজনে চাপড় মেরে ফেলুদার গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বলল, ম্যালের মোড়েই ডাক্তারখানা আছে, সেখানে এক্ষুনি গিয়ে যেন ফেলুদা ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করে।

আমাদেরও সে মতলব ছিল। আমরা হাঁটা দিলাম আবার ম্যালের দিকে।

'লোকটা কে ছিল বুঝতে পারলে তপেশ ?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন। আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি বলতে কি, চাপ দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি আমি। আর দাড়িটাও মনে হচ্ছিল নকল। 'কি রকম বোধ করছেন ?' জটায়ু জিগ্যেস করলেন ফেলুদাকে।

'বিধ্বস্ত', বলল ফেলুদা। 'ওই গাছটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, না হলে হাড়গোড় সব চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু মনে হচ্ছে, এবার আস্তে আস্তে মাথা খুলে যাবে। একটা জোরালো ক্লু তো এর মধ্যেই পেয়েছি। আমার এ রকমই হয়, জানেন, এ রকমই হয়। এটার দরকার ছিল। আর এটাও বুঝলাম যে, কেসটা মোটেই সরল নয়।'

৯

ফেলুদার জখম যে তেমন গুরুতর হয়নি সেটা ডাক্তারখানায় গিয়েই বোঝা গেল। ডাক্তার বর্ধন বসেন ডিসপেনসারিতে, তিনিই ফার্স্ট এড দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক স্বভাবতই ঘটনাটা জানতে চাইলেন, আর আমাদেরও বলতে হল।

'কিন্তু আপনার ওপর এ আক্রমণের কারণ কী?' জিগ্যেস করলেন বর্ধন।

এর ফলে ফেলুদাকে নিজের পরিচয় দিতে হল। তাতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'আপনিই স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র? আমি তো আপনার অনেক কীর্তির বিষয়ে পড়েছি মশাই! চাক্ষুষ পরিচয় যে হবে, সেটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।...কিন্তু আপনি কি মিঃ মজুমদারের খুনের তদন্ত করছেন নাকি?'

'ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে', বলল ফেলুদা।

'ভদ্রলোক তো আমারই পেশেন্ট ছিলেন', বললেন ডাঃ বর্ধন।

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস। আশ্চর্য মনের জোর ছিল মিঃ মজুমদারের। দেখে বোঝাই যেত না যে ওঁর ওপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গেছে, এবং এখনও যাচ্ছে। নিজের ছবি নিয়ে মেতে থাকতেন, আর ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়াতেন।'

'কিন্তু ঝড়ের কথা কী বলছেন একটু জানতে পারি কি?'

'একে তো ওঁর নিজের অসুখ ছিল। তার পর স্ত্রীকে হারান বছর

সাতেক আগে। ভদ্রমহিলার ক্যানসার হয়েছিল। তার উপর পুত্রের সমস্যা।'

'সমীরণবাবুর কথা বলছেন?'

'এত গুণ ছিল ছেলেটির, কিন্তু শেয়ার বাজারের খেলা খেলতে গিয়ে সব গেছে। এখন দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছে। একটিমাত্র ছেলে, তাই ভাবতে কষ্ট হয়। আমি তো ওঁর ডাক্তার ছিলাম, তাই সুখ-দুঃখের অনেক কথাই আমাকে বলতেন। এবারও যে ছেলে এসেছে, আই অ্যাম শিওর তার কারণ বাপের কাছে হাত পাতা। কিন্তু আমি যত দূর জানি বাবা সম্প্রতি ছেলের উপর রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একটা আলটিমেটাম দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হব না। সমস্ত ব্যাপারটা কালিমাময়, আনপ্লেজেন্ট। আমার ভালো লাগছে না। খুনের কথাটা শুনে অবধি আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

'ভদ্রলোক উইল করে গেছেন কিনা জানেন?'

'তা জানি না। তবে করে থাকলে ছেলেকেই নিশ্চয় সব কিছু দিয়ে গেছেন—যদি না ইতিমধ্যে উইল বদলে থাকেন।'

ফেলুদা ডাঃ বর্ধনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ভদ্রলোক একটি পয়সাও নিলেন না। আসবার সময় ফেলুদা বলল, 'আপনি যে আমার কত উপকার করেছেন, তা আপনি জানেন না। ফার্স্ট এড নিতে এসেছিলাম, তার সঙ্গে আরও অনেক এড পেয়ে গেলাম।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'তোরা যদি বিশ্রাম করতে চাস তো হোটেলে ফিরে যেতে পারিস। আমি কিন্তু এখন একটু নয়নপুর ভিলায় যাব। আজকের জানা সব নতুন তথ্য মাথায় রেখে নতুন করে তদন্ত শুরু কতে হবে। আমার চোখে কেসটা এখন একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে।'

আমরাও দুজনেই অবিশ্যি সঙ্গেই যেতে চাইলাম। ও যদি এত ধকলের পরও বিশ্রাম ছাড়া চলতে পারে, তা হলে আমরা তো পারবই। সত্যি, আশ্চর্য শক্ত শরীর ফেলুদার। পাহাড়ের গা গড়িয়ে প্রায় একশো ফুট নীচে চলে গিয়েছিল।

আমরা নয়নপুর ভিলায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। সমস্ত বাড়িটায় একটা থমথমে ভাব, যদিও চারিদিকের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে। নুড়ির ওপর আমাদের পায়ের শব্দ শুনেই বোধ হয় রজতবাবু ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আপনার যে হাত খালি খালি লাগছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের কতকগুলো কাজ ছিল, সেই ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন...'

'কী কাজ বলুন।'

'আমরা একবার মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরটা দেখতে চাই। তার পর আপনার ঘরটাও একটু দেখব। অবিশ্যি তার সঙ্গে কিছু প্রশ্নও করতে হবে।'

'বেশ তো, চলুন।'

'সমীরণবাবুকে দেখছি না— ?'

'উনি বোধ হয় স্নান করতে গেছেন।'

'তা হলে চলুন মিঃ মজুমদারের স্টাডিতেই বসা যাক্।'

আমরা চারজনে বাড়ির উত্তর দিকের পিছনের অংশে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুসজ্জিত, পরিষ্কার ঘর, পুবের জানলা দিয়ে বাড়ির পিছনের ঝাউবন দেখা যায়। জানালার সামনে একটা বেশ বড় মেহগনি টেবিল, তার পিছনে একটা আর সামনে দুটো ভারী চেয়ার। এ ছাড়া, ঘরের পশ্চিম অংশেও আলাদা বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা সোফা আর দুটো মুখোমুখি আর্ম চেয়ার। আমরা সেখানেই বসলাম। ফেলুদার বসবার তাড়া নেই, সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। টেবিলের উপর থেকে পেপারকাটার তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

'এটায় তো বেশ ধার দেখছি', বলল ফেলুদা, 'এই দিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।'

লালমোহনবাবু বললেন, ওর একটা জোড়া নাকি ওঁদের শুটিং-এ ব্যবহার হচ্ছে। 'এটা দিয়ে ভিলেনকে পিঠ চুলকোতে দেখানো হয়েছে।'

সত্যিই ছুরিটাকে দেখলে বেশ ধারালো মনে হয়। ফেলুদা সেটা আবার টেবিলের উপর রেখে দিল।

ঘরের এক দিকে একটা বুক-শেল্‌ফে সারি সারি বড় খাতা দাঁড় করানো রয়েছে, তার দুটো আমরা এর আগেই দেখেছি। এগুলোতেই সেই সব খুনখারাবির খবর সাঁটা আছে। ফেলুদা তার আরও দু'-একটা উল্টোপাল্টে দেখল। তার পর প্রশ্ন করল, 'আপনি আসার আগে এগুলো কে সাঁটত?'

'মিঃ মজুমদার নিজেই।'

'আপনি আসার পর থেকে তো উনি সে কাজটা আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে আমাকে লোকনাথ মাঝে মাঝে সাহায্য করত।'

'লোকনাথ বেয়ারা?'

'হ্যাঁ। লোকনাথ স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে। সে রীতিমতো লিখতে-পড়তে পারে।'

'এটা একটা অপ্রত্যাশিত খবর। তবে, পড়াশুনা করে সে বেয়ারার কাজ কেন নিল, সেটা বলতে পারেন?'

'মিঃ মজুমদার ওকে খুব ভালো মাইনে দিতেন।'

'আর সে বেয়ারাই শেষকালে এমন একটা কাজ করল?'

'ফেলুদা ঘুরে ঘুরে এটা সেটা দেখছে আর প্রশ্ন করে চলেছে।

'আপনি এখানে আসার আগে কী করতেন?'

'একটা দিশি ফার্মে চাকরি করতাম।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'ক' বছর করেছিলেন এই কাজ?'

'সাত বছর।'

'মিঃ মজুমদার কি সেক্রেটারি চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কদ্দূর পড়েছেন?'

'আমি বি-কম পাশ।'

'আপনার ফ্যামিলি নেই?'

boiRboi.net

'আমি বিয়ে করিনি। বাবা-মা মারা গেছেন।'

'ভাই-বোন নেই?'

'না।'

'তার মানে আপনি একা মানুষ?'

'হ্যাঁ।'

'এই ছবিটা কী ব্যাপার?'

একটা শেল্‌ফের উপর একটা বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। একটা গ্রুপ ছবি; দেখে মনে হয় আপিসের গ্রুপ, সবসুদ্ধ জনা পঁয়ত্রিশ লোক, কিছু পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে, বাকি সামনের চেয়ারে বসে।

'ও ছবিটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তোলা', বললেন রজতবাবু। 'একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেবার দিন ছবিটা তোলা হয়েছিল। মিঃ মজুমদার তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন।'

ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখল।

'কোনজন কে—সেটা লেখা নেই ছবিতে? মিঃ মজুমদারকে তো চিনতেই পারছি।'

'ছবির তলার দিকে থাকতে পারে। হয়তো বাঁধানোর সময় মাস্কের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে।'

'এটা আমার কাছে দু-তিন দিন রাখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা ছবিটা আমার হাতে চালান দিল। আমি আর লালমোহনবাবু সেটা দেখলাম। আপিসের গ্রুপ যেমন হয় তেমনই ব্যাপার। মিঃ মজুমদার প্রথম সারিতে চেয়ারে বসে আছেন বোধ হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাশে।

ফেলুদা বলল, 'খুনের দিন সকাল বেলা আপনি কখন কী করছিলেন সেটা জানা দরকার।'

প্রশ্নটা করে ফেলুদা কোটের পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে একটা পাতা খুলে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তার পর বলল, 'সাড়ে এগারোটার সময় মিঃ মজুমদার তাঁর স্টাডিতে

amarboi.net

boiRboi.net

আসতেন। তখন আপনার তাঁর সঙ্গে থাকতে হত। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ চলত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন কী কাজ ছিল?'

'মিঃ মজুমদারের অনেক চেনা পরিচিত ছিল দেশ-বিদেশ। উনি তাঁদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন। তাতেই বেশির ভাগ সময় কেটে গেছিল সে দিন।'

'সাড়ে এগারোটার আগে সকালে আপনি কী করছিলেন?'

'ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শুটিং-এর দল আসতে শুরু করে। আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে ওঁদের তোড়জোড়ের কাজ দেখছিলাম।'

'কোনও শট নেওয়া দেখছিলেন?'

'প্রথমটা দেখেছিলাম। মিঃ গাঙ্গুলি আর মিঃ ভার্মাকে নিয়ে শট।'

লালমোহনবাবুর মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম, তিনি রজতবাবুর কথাটার সমর্থন করছেন।

'সেটা কটা নাগাত?'

'আন্দাজ এগারোটা। আমি ঘড়ি দেখিনি। তার কিছু পরেই আমি মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরে চলে আসি।'

'কাজের পর তো লাঞ্চ খেতেন আপনারা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনারা তিনজনে এক সঙ্গে খেতেন?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়ার পর কী করেন?'

'লাঞ্চ শেষ হয় প্রায় একটার সময়। তার পর আমি নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বই পড়ি।'

'কী বই?'

'বই না, পত্রিকা। রিডারস্ ডাইজেস্ট।'

'তার পর?'

'তার পর দুটো নাগাত একটু ঝাউবনে ঘুরতে বেরোই।

boiRboi.net

ঝাউবনটা খুব সুন্দর। আমি ফাঁক পেলেই ও দিকটা একবার ঘুরে আসি।'

'তার পর ?'

'আড়াইটে নাগাত আমি ফিরে আসি। তার পর বিকেল চারটে অবধি বিশ্রাম করে আর একবার শুটিং দেখতে যাই। তখন মিঃ গাঙ্গুলির একটা শট হচ্ছিল।'

লালমোহনবাবু আবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'মিঃ মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও ঘর থেকে বেরোলেন না তখন আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি ?'

'আমি ঘড়ি দেখিনি। বাড়িতে হট্টগোল, জেনারেটর চলছে, আমার সময়ের খেয়াল ছিল না।'

'মিঃ মজুমদার বস্ হিসেবে কি রকম লোক ছিলেন।'

'খুব ভালো।'

'আপনার উপর চোটপাট করেননি কখনও ?'

'না।'

'মাইনে যা পেতেন, তাতে আপনি খুশি ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের আগের দিন লালমোহনবাবু দুপুরের দিকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ মজুমদারের গলা শুনতে পান। তিনি কাউকে বলছিলেন, "ইউ আর এ লায়ার। আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"—এই কথাটা উনি কাকে বলতে পারেন, সে ধারণা আছে আপনার ?'

'একমাত্র ওঁর ছেলে ছাড়া আর কারুর কথা তো মনে পড়ছে না।'

'ওঁর ছেলের সঙ্গে মিঃ মজুমদারের সদ্ভাব ছিল না ?'

'ছেলের সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপারে ওঁর আক্ষেপ ছিল।'

'সেটা আপনি কি করে জানলেন ?'

'আমার সামনে দু'-একবার বলেছেন—"সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়ছে"—বা ওই জাতীয় কথা। উনি ছেলেকে ভালোও বাসতেন, আবার সেই সঙ্গে শাসনও করতেন।'

'উনি কোনও উইল করে গেছেন বলে আপনি জানেন ?'

'যদ্দূর জানি করেননি।'

'কেন বলছেন এ কথা ?'

'কারণ একদিন আমাকে বলেছিলেন—"এখন তো দিব্যি আছি ; আরেকটু শরীরটা ভাঙুক, তার পর উইল করব" ।'

'তার মানে ওঁর সম্পত্তি ওঁর ছেলেই পাচ্ছেন ?'

'তাই তো হয়ে থাকে।'

'এবার আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি ?'

'আসুন।'

রজতবাবুর শোবার ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। একটা খাট, একটা ছোট আলমারি, একটা তাক, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। দেয়ালে আলনা রয়েছে একটা, তাতে একটা শার্ট, একটা খয়েরি পুলোভার আর একটা তোয়ালে ঝুলছে। ঘরের একপাশে একটা সুটকেস রয়েছে, তাতে আর. বি. লেখা।

টেবিলের উপর তিন-চারখানা ইংরিজি পেপার ব্যাক আর গোটা পাঁচেক পত্রিকা রয়েছে।

'হিন্দি পত্রিকা দেখছি যে ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে', বললেন রজতবাবু, 'বাবা ওখানকার ডাক্তার ছিলেন। ইস্কুলে হিন্দি শিখেছিলাম। বাবা মারা যাবার পর কলকাতায় মামা বাড়িতে চলে আসি।'

আমরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'মিঃ মজুমদার ঘুমের আগে একটা বড়ি খেতেন, সেটা আপনি জানতেন ?'

'হ্যাঁ। আমি অনেকবার গিয়ে সে বড়ি এনে দিয়েছি। টফ্রানিল। পুরো মাসের স্টক একবারে কিনে নিতেন।'

'হুঁ...এবার একটু সমীরণবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

সমীরণবাবু স্নান সেরে তাঁর ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অশৌচ অবস্থা, তাই দাড়ি কামাননি ভদ্রলোক। ওঁর সঙ্গে কথা বলে খুব বেশি কিছু জানা গেল না। ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে ওঁর বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত।

'বাবা আগে এ রকম ছিলেন না', বললেন ভদ্রলোক। 'অসুখের পর থেকে এ রকম হয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনার দিক থেকে কি কোনও পরিবর্তন হয়নি, যাতে আপনার বাবা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন ?'

'আমার দু'-একটা ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে সেটা ঠিকই, কিন্তু সে রকম তো ব্যবসায় হতেই পারে।'

'খুনের আগের দিন দুপুরে দেড়টা নাগাত আপনার সঙ্গে মিঃ মজুমদারের কোন রকম কথা কাটাকাটি হয়েছিল ?'

'কই, না তো !'

'আপনার বাবার কাছ থেকে কি আপনার মাঝে মাঝে টাকা চাইতে হত ?'

'তা চাইব না কেন ? আমার বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন।'

'আপনার বাবা যে উইল করে যাননি, সেটা আপনি জানতেন ?'

'জানতাম। বাবা একদিন আমাকে রাগ করে বলেছিলেন উইল করলে আমাকে এক পয়সাও দেবেন না।'

'কিন্তু এখন তো আপনি সব কিছুই পাচ্ছেন ?'

'তা পাচ্ছি।'

'এতে আপনার অনেক সমস্যা মিটে যাবে—তাই না ?'

'তা যাবে, কিন্তু এটার জন্য তো আমি দায়ী নই। আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমি বাবাকে খুন করেছি ?'

'ধরুন যদি তাই করি। সুযোগ ও কারণ—দুটোই তো আপনার ছিল !'

'ঘুমের বড়ি খাওয়ানোর সুযোগ আমার কী করে থাকবে ? সে বড়ি তো দিত লোকনাথ।'

'কিন্তু সে দিন লোকনাথ দুধটা রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, এটা ভুলবেন না। আর ছুরি বসানোর সুযোগও আপনার ছিল। আপনার বাবার ঘরেই এ কাজের জন্য একটি উত্তম অস্ত্র ছিল—যেটা সত্যি করেই ওই কাজে লাগানো হয়।'

সমীরণবাবু একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এ সব কী বলছেন আপনি ? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? মূর্তি চুরির কথাটা

ভাবছেন না কেন ? বাবা মরলেই তো আমি টাকা পাব, সেখানে আর বালগোপালের দরকার কী ?'

'আপনার হয়তো তাড়া ছিল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো আর আপনার হাতে টাকা আসবে না ; তার তো একটা লিগ্যাল প্রোসেস আছে !'

'তা হলে লোকনাথ গেল কোথায় ? যে আসল লোক, তার সম্বন্ধে তদন্ত না করে আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন ?'

'সেটার কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও সেটা প্রকাশ্য নয়।'

'ঠিক আছে, আপনি আপনার গোপন কারণ নিয়ে থাকুন, কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে একেবারেই ঘটনাচক্রে। আসল অপরাধীকে পেতে হলে আপনার অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। এর বেশি আর আমি কিছু বলতে চাই না।'

১০

দুপুরে লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল যে-গ্রুপ ছবিটা ও মিঃ মজুমদারের স্টাডি থেকে এনেছে, সেটা নিয়ে ওকে একবার ফোটোগ্রাফির দোকান দাশ স্টুডিওতে যেতে হবে। 'তা ছাড়া, একবার থানায় গিয়ে সাহার সঙ্গে দেখা করাও দরকার। কতকগুলো জরুরী ইনফরমেশন চাই, সে কাজটা আমার চেয়ে পুলিসের পক্ষে অনেক বেশি সহজ। তোরা এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসতে চাস তো আসতে পারিস। আমি বাড়ি ফিরে আর বেরোব না। কারণ আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। কেসটা এখনও ঠিক দানা বাঁধেনি।'

ফেলুদা বেরিয়ে গেল। কী আর করি—আমরাও দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হাঁটতে কোনও অসুবিধা নেই।

হোটেলের বাইরে এসে আমি লালমোহনবাবুকে বললাম, আপনার একটা জিনিস এখনও দেখা হয়নি ; সেটা আমি দেখেছি।

সেটা হল মজুমদারের বাড়ির পিছনের ঝাউবন। অবিশ্যি আমিও গেছি মাত্র দু মিনিটের জন্য, কিন্তু তাতেই মনে হয়েছে বনটা দারুণ। যাবেন ?'

'সেটা যেতে হলে মজুমদারের বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হয় ?'

আমি বললাম, 'তা কেন ? ওদের বাড়িতে পৌঁছবার আগেই মেন রোড থেকে একটা রাস্তা বাঁ দিকে বেরিয়ে বনের দিকে চলে গেছে—দেখেননি ?'

আমরা দুজন রওনা দিয়ে দিলাম। ফেলুদার কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছি না। ও যে কয়েকটা ক্লু পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো যে কী সেটা এখন আমাদের বলবে না। ওর হালচাল আমার খুব ভালো করেই জানা আছে। এখন ওর চিন্তা করা আর ইনফরমেশন জোগাড় করার সময়। সব সূত্র খুঁজে পেয়ে কেসটা মাথায় পরিষ্কার হলে তার পর বম্ব-শেলটা ছাড়বে।

পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এখানে যে রহস্যটা কোথায়, সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না, তপেশ। লোনাথ বেয়ারা খুন করে মূর্তি চুরি করে পালিয়েছে—ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। তোমার দাদা এত যে কী সাতপাঁচ ভাবছেন ! বাকিটা তো পুলিসের ব্যাপার। তারা কালপ্রিটকে খুঁজে পেলেই খেল খতম।'

আমি বললাম, 'আপনি ফেলুদাকে এত দিন চেনেন, আর এটুকু বুঝছেন না যে, কোথাও একটা গণ্ডগোল না থাকলে ফেলুদা মিথ্যে ভাবত না ! এক তো চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে, ওঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হল খাদে ফেলে। সেটা নিশ্চয়ই লোকনাথ বেয়ারা করেনি। তা ছাড়া, মিঃ মজুমদারের জীবনে একটা কেলেঙ্কারি রয়েছে। উনি নিজে একজনকে অজান্তে খুন করেছিলেন। তার পর তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে একজন টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তাকে ধরা যায়নি। তার পর আপনি নিজে সে দিন শুনলেন মজুমদার একজনকে ধমক দিচ্ছেন, সেটা যে কে সেটা এখনও বোঝা যায়নি। এত রকম জিলিপির প্যাঁচ সত্ত্বেও আপনি বলছেন, কেসটা সহজ ?'

সত্যি বলতে কি, আমার নিজের মনের মধ্যে সব কিছু এমন

তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল যে আমি কোনওটার সঙ্গে কোনওটার যোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কাজেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে, ভাবার কাজটা ফেলুদার উপরেই ছেড়ে দেব।

ঝাউবনটাতে একবার ঢুকেই বুঝেছিলাম যে সেটা একটা আশ্চর্য জায়গা। আজ ভালো করে দেখে আসল ব্যাপার বুঝতে পারলাম। এটাকে ঝাউবন বলা ঠিক নয়, কারণ এখানে পাইন, ফার, রডোডেনড্রন ইত্যাদি অনেক রকম চেনা-অচেনা গাছই আছে। গাছের মাঝে মাঝে ঝোপ রয়েছে, তাতে আবার লাল নীল হলদে ফুল। আজ দিনটা মেঘলা, তাই সমস্ত বনটাই আবছা অন্ধকারে ঢাকা। মনে হয়, অজস্র থামওয়ালা একটা বিরাট গির্জার মধ্যে আমরা এসেছি। যেখান দিয়ে এখন হেঁটে চলেছি, সেখান থেকে পশ্চিমে চাইলে গাছের ফাঁক দিয়ে নয়নপুর ভিলা দেখা যায়। অবিশ্যি বনের মধ্যে দিয়ে যতই এগোচ্ছি, ততই বাড়িটা দূরে সরে গিয়ে গাছপালায় ঢেকে যাচ্ছে। এটা মানতেই হবে যে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে এই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গা-টা বেশ ছমছম করছিল। লালমোহনবাবু তাই বোধ হয় একবার বললেন, 'এখানে কাউকে খুন করলে লাশ আবিষ্কার করতে মাসখানেক অন্তত লাগবে।'

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। এবার আর নয়নপুর ভিলা দেখা যাচ্ছে না। একটা মাত্র পাখির ডাক কিছুক্ষণ থেকে কানে আসছে, কিন্তু সেটা যে কী পাখি তা জানি না।

উত্তর দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ দেখি, মেঘ সরে গিয়ে দুটো পাইন গাছের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আমি লালমোহনবাবুকে সেই দিকে দেখতে বলব বলে ডাইনে ঘুরেই দেখি, ভদ্রলোক চোখ বড়-বড় করে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। কী দেখছেন ভদ্রলোক?

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পুবে চাইতেই বুঝলাম ব্যাপারটা কী।

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে একটা ঝোপ, আর সেই ঝোপের পিছনে এক জোড়া জুতো-পরা পা দেখা যাচ্ছে।

'এগিয়ে গিয়ে দেখবে?' ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করলেন

লালমোহনবাবু।

আমি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওই জুতো জোড়া আমি আগে দেখেছি।

ঝোপটা পেরোতেই ব্যাপারটা বুঝলাম।

একটা লাশ পড়ে আছে মাটিতে।

একে আমরা চিনি।

এ হল লোকনাথ বেয়ারা।

একেও বুকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে, যদিও অস্ত্রটা কাছাকাছির মধ্যে নেই।

তার বদলে আছে একটা পাথরের সামনে একটা ভাঙা বোতল, আর সেই বোতলের চারিদিকে ছড়ানো গোটা ত্রিশেক বড়ি। সেই বড়ি এককালে সাদা ছিল, কিন্তু এখন জল আর মাটি লেগে সেটা আর সাদা নেই।

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা ফিরে এলাম হোটেলে। ফেলুদাও বলল সে ফিরেছে মিনিট পাঁচেক আগে। লালমোহনবাবু 'সেনসেশন্যাল ব্যাপার—' বলে নাটক করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি ওঁকে থামিয়ে এক কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম।

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাহাকে নিয়ে দুটো জিপ চলে এল, একটায় চারজন কনস্টেবল।

আমরা আবার ফিরে গেলাম ঝাউবনে যেখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গায়।

'ইনিও দেখছি ছুরিকাঘাতে মৃত', বললেন সাহা। 'আসলে আমরা খুঁজছিলাম লোকালয়ে, ভাবছিলাম লোকটা কোনও গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে। এই ডিসকভারির জন্য পুরো ক্রেডিট পাবেন মিস্টার মিত্তিরের বন্ধু এবং কাজিন। সত্যিই আপনারা কাজের কাজ করেছেন।'

মৃতদেহ চলে গেল পুলিসের জিম্মায়, আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

'এ যে মোড় ঘুরে গেল!' আমাদের ঘরে এসে খাটের উপর ধপ্

করে বসে বললেন লালমোহনবাবু।

'ঘুরেছে ঠিকই', বলল ফেলুদা, 'কিন্তু অন্ধকারের দিকে নয়, আলোর দিকে। এখন শুধু কয়েকটা খবরের অপেক্ষা। তার পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।'

সন্ধ্যায় এল ফেলুদার টেলিফোন—সাহার কাছ থেকে। একপেশে কথা শুনে, আর ফেলুদার গোটা বিশেক 'হ্যাঁ' 'আই সি' আর 'ভেরি গুড' শুনে আন্দাজ করলাম যে, খবরটা যা আসবার তা এসে গেছে। শেষে ফেলুদা বলল, 'তা হলে কাল সকাল দশটার সময় সকলকে বলুন যেন মিঃ মজুমদারের বৈঠকখানায় জমায়েত হয়। নয়নপুর ভিলার সকলে এবং মাউন্ট এভারেস্টের পুলক ঘোষাল, রাজেন রায়না, মহাদেব ভার্মা আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। আপনাদের উপস্থিতি তো অবশ্যই এসেনশিয়াল।'

১১

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের হোটেলের ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। আমরা দুজনেই আগেই উঠে পড়েছিলাম, সবে বেড-টি খাওয়া হয়েছে, ফেলুদা বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলল। ওকে শুধু দুটো কথা বলতে শুনলাম—'বলেন কী!' আর 'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

ফোনটা রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'লালমোহনবাবুকে বল তৈরি হয়ে নিতে—এক্ষুনি!'

কী ব্যাপার, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সেটা পুলিসের জিপে উঠে বুঝলাম। আজ সকাল সকাল পুলিসের জিপ নয়নপুর ভিলায় গিয়েছিল ওদের মিটিং সম্বন্ধে খবর দিতে। গিয়ে শুনল সমীরণবাবু নাকি একটা জরুরী টেলিফোন পেয়ে পনের মিনিট আগে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন। অথচ ফেলুদার মতে মিটিং-এ তাঁকে ছাড়া চলবে না।

আমাদের জিপ শিলিগুড়ির রাস্তা ধরল।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এই স্পিডে কোনও দিন চলেছি বলে মনে

boiRboi.net

পড়ে না। দেখতে দেখতে ঘুম সোনাদা টুং ছাড়িয়ে গেল। তবু ভাগ্যি ভালো এখন অবধি তেমন কুয়াশা পাইনি। নইলে জিপের স্পিড তোলা যেত না। অসম্ভব তুখোড় ড্রাইভার, তাই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা আধ ঘণ্টায় পেরিয়ে গেল।

সাহা অবশ্যি কার্সিয়ং আর শিলিগুড়িতেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সমীরণবাবুর গাড়ি তারা আটকায়। কিন্তু ট্যাক্সির নম্বরটা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটা বার করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যেত।

কার্সিয়ং পর্যন্ত গিয়েও সমীরণবাবুর ট্যাক্সির কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। সাহা ড্রাইভারকে বললেন, 'এবার পাংখাবাড়ির শর্টকাটটা ধরো।'

আমাদের দুটো জিপ ছিল ; একটা সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেল, আর অন্যটা—যাতে আমরা রয়েছি—সেটা শর্টকাটটা ধরল।

পাংখাবাড়ির রাস্তা যে কী ভয়ানক প্যাঁচালো, সেটা যে না দেখেছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। লালমোহনবাবু তো চোখ বন্ধ করে রইলেন। বললেন, 'অন্য গাড়ির দেখা পেলে ব'লো, তপেশ। আমি তার আগে আর চোখ খুলছি না ; খুললেই গা গুলোবে।'

পনের মিনিট সাপের মতো প্যাঁচানো উৎরাই দিয়ে যাবার পর একটা হেয়ারপিন বেন্ড ঘুরেই দেখা গেল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি। বোঝাই যাচ্ছে টায়ার পাংচার। গাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে সিগারেট টানছেন সমীরণ মজুমদার।

আমাদের জিপ দেখেই ভদ্রলোক কেমন যেন হকচকিয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা আর সাহা এগিয়ে গেল সমীরণবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'কী—কী ব্যাপার ?'

'কিছুই না', বলল ফেলুদা, 'হয়েছে কি, আপনি যে মিটিংটা

boiRboi.net

অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কলকাতা, তার চেয়েও ঢের জরুরি মিটিং রয়েছে আজই, সকাল দশটায় আপনাদের নয়নপুর ভিলাতে। সেখানে আপনার থাকা একান্তই প্রয়োজন। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে আপনার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ুন আমাদের জিপে। সঙ্গে আপনার সুটকেসটাও অবিশ্যি নেওয়া চাই।'

তিন মিনিটের মধ্যে আমরা আবার রওনা হলাম উল্টো মুখে। পথে কোনও কথা হল না। ফেলুদা চুপ, সাহা চুপ, সমীরণবাবুও চুপ।

নয়নপুর ভিলা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে দশটা।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ফেলুদা সমীরণবাবুকে বলল, 'আপনার লোকনাথ বেয়ারা যখন আর নেই, তখন আপনার অন্য চাকর বাহাদুরকে বলুন কফি করতে। অন্তত বারো কাপ।'

আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। পাশের ঘর থেকে আরও চেয়ার এনে রাখা হয়েছে। সবাই যাতে বসতে পারে।

কফি আসার সঙ্গে সঙ্গেই এভারেস্ট হোটেলের দলও চলে এল। পুলক ঘোষাল একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী লালুদা ?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'তুমি যেই তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। তবে যত দূর জানি, রহস্যে আলোকপাতের জন্যেই এই মিটিং-এর ব্যবস্থা। আলোকসম্পাত করবেন শ্রীপ্রদোষ মিত্র।'

'আমাদের শুটিং আবার চালু করতে পারব তো ?'

'সে তো ভাই বলতে পারব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে।'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা !...বারো বছর এ লাইনে আছি, সতেরোখানা ছবি ডাইরেক্ট করেছি, কিন্তু এ হুজ্জতে পড়িনি কখনও।'

পুলক ঘোষালের কাঁচুমাচু ভাব দেখে আমার মায়া হল। ছাপ্পান্ন লাখ খরচ হবার কথা ছবিটাতে। সেটা এখন বেড়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে ?

সবাই চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল। সকলেরই অস্বস্তি ভাব। আমি একবার সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার ডাইনে

boiRboi

বসেছেন লালমোহনবাবু, আর বাঁয়ে ফেলুদা। ফেলুদার পরে পর-পর গোল হয়ে বসেছেন ইনস্পেক্টর সাহা, সমীরণবাবু, রজতবাবু, পুলক ঘোষাল, মহাদেব ভার্মা, রাজেন্দ্র রায়না আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। এ ছাড়া ঘরে দাঁড়িয়ে আছে নেপালি চাকর বাহাদুর, রান্নার লোক জগদীশ, আর চারজন কনস্টেবল। চারজনই রয়েছেন ঘরের দরজার মুখটাতে।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হল। শেলফে রাখা একটা বাহারের ঘড়িতে টিং টিং করে দশটা বাজল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ঘরে একমাত্র ফেলুদার মধ্যেই কোনও অস্বস্তির ভাব নেই। ইনস্পেক্টর সাহাকেও একবার আঙুল মটকাতে লক্ষ করেছি।

বোম্বাইয়ের অভিনেতা দুজন রয়েছে বলে ফেলুদা ইংরিজিতে কথা বলল, আমি সেটা বাংলা করে লিখছি।

ফেলুদা আরম্ভ করল—

'গত ক'দিনে এ বাড়িতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো ঠিক এইভাবে এগুলো ঘটত না, কিন্তু এ বাড়িতে একটা ফিল্মের শুটিং চলাতে দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, এবং অনেক লোকের মনই পড়ে ছিল এই শুটিং-এর দিকে—যার ফলে কতকগুলি ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

'প্রধান ঘটনা হল—বাড়ির যিনি কর্তা—বিরূপাক্ষ মজুমদার—তিনি খুন হন। আমি নিজে একজন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটার ; আমার কাছে হত্যাটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল। খুনের প্রধান উদ্দেশ্য যদি মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে থাকে, তা হলে লোকনাথ বেয়ারার উপর সন্দেহ পড়াটা খুব স্বাভাবিক, কারণ সে খুনের পর থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মন এটা মানতে চাইছিল না—কেন, সেটা ক্রমে প্রকাশ করছি। প্রথমে, যিনি খুন হয়েছিলেন তাঁকে জড়িয়ে দুটো ঘটনা আমি আপনাদের বলতে চাই।

'একটা ঘটে যখন তিনি কলকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি তরুণ

কর্মচারী—নাম ভি. বালাপোরিয়া—তহবিল তছরূপ করে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। ওখানকার রাজা পৃথ্বী সিং-এর আমন্ত্রিত হয়ে বিরূপাক্ষ মজুমদার সেখানে যান বাঘ শিকার করতে। সেখানে জঙ্গলে ঝোপের পিছনে বাঘ ভেবে তিনি একটি মানুষের উপর গুলি চালান। তার ফলে সেই মানুষের মৃত্যু হয়। যিনি মরেন, তিনি ছিলেন বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর একটি শখ ছিল, সেটা হল কবিরাজী গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করা। এই কাজ করতেই তিনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়। এই হত্যার খবর যাতে সম্পূর্ণ গোপন থাকে, তার জন্য পৃথ্বী সিংকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

'যিনি মারা গিয়েছিলেন, সেই সুধীর ব্রহ্মের একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রহ্ম। স্বভাবতই রমেন ব্রহ্ম এই ঘটনায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বড় হয়ে তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। এখানে বলে রাখি, এই ঘটনা আমি শুনি দার্জিলিং-এর বাসিন্দা এবং মিঃ মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি সেই সময় নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন এবং সুধীর ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন। এই ঘটনার অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনে যে একটা কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেছিল এবং সেটা যে খবরের কাগজ থেকে চেপে রাখা হয়েছিল, সে ইঙ্গিত বিরূপাক্ষ মজুমদার নিজেই আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ আমি দেখি না।

'এবার বিরূপাক্ষবাবুর হত্যার ঘটনায় আসা যাক। তাঁকে মারবার কারণ ও সুযোগ কার থাকতে পারে এটা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তাঁর ছেলে সমীরণবাবুর কথা। সমীরণবাবু শেয়ার মার্কেটে অনেক লোকসান দিয়েছেন, এ খবর আমরা পেয়েছি। এটা কি সমীরণবাবু অস্বীকার করতে পারেন?'

সমীরণবাবু মাথা নেড়ে 'না' বললেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে।

'আর তিনি যে তাঁর পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হলেন, সেটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন ?'

সমীরণবাবু এবারও মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা। 'এবার আমরা খুনের চেহারাটা দেখব।

'বিরূপাক্ষবাবু দুধে মিশিয়ে টফ্রানিল বলে একটা বড়ি খেয়ে দুপুরে ঘুমোতেন। এই দুধ তাঁকে এনে দিত তাঁর বেয়ারা লোকনাথ। এই বড়ি মৃত্যু দু' দিন আগে পুরো এক মাসের স্টক, অর্থাৎ একত্রিশটা, কেনেন বিরূপাক্ষবাবু। তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুনের পর দেখা যায় যে, তার একটিও অবশিষ্ট নেই। আমাদের স্বভাবতই মনে হবে যে এই বড়িগুলির সবই তাঁর দুধের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল। ত্রিশটা টফ্রানিল একসঙ্গে খেলে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় এই দেখে যে, বিরূপাক্ষবাবু একটা কাগজে কাঁপা হাতে "বিষ" কথাটা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার দেখা গেল এই যে, তাঁকে যে শুধু বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল তা নয়। সেই সঙ্গে তাঁকে ছোরাও মারা হয়েছিল। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, "বিষ" কথাটা লেখার পরে তাঁকে ছোরা মারা হয়েছিল। মনে হয়, বড়িতে কাজ দেবে না মনে করে আততায়ী পরে আর একবার এসে ছোরা মেরে খুনটাকে আরও নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করে।

'এখানে প্রশ্ন আসে—এই খুনের মোটিভ কী ? এরও উত্তর পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। বিরূপাক্ষবাবুর ঘরে অষ্টধাতুর একটি মহামূল্য মূর্তি ছিল। সেটি এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

'এখানে আমার মনে খট্‌কা যাই থাকুক না কেন, পুলিশের বিশ্বাস হয় যে, বেয়ারা লোকনাথ মূর্তিটা হাত করার জন্য মনিবকে ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে তার পর খুনটাকে আরও জোরদার করার জন্য তাঁর

বুকে ছুরি মেরে মূর্তিটাকে নিয়ে পালায়। গতকাল কিন্তু জানা যায় যে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলি ও ভাই তপেশ গতকাল বিকেলে এই বাড়ির পিছনের ঝাউবনে বেড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ লোকনাথ বেয়ারার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। তাকেও ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ; মৃতদেহের পাশে ছড়ানো ছিল খান ত্রিশেক টফ্রানিলের বড়ি। অর্থাৎ লোকনাথ শুধু যে খুন বা চুরি করেনি তা নয়, যাতে তার মনিবকে বড়ি খাইয়ে হত্যা না করা হয়, সেইজন্য সে বড়িগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময় কেউ তাকে খুন করে।

'অর্থাৎ এও জানা যাচ্ছে যে বিরূপাক্ষ মজুমদারের মৃত্যু হয় একমাত্র ছুরির আঘাতেই, বড়ি খেয়ে নয়।

'ইতিমধ্যে আমার নিজের কতকগুলো অভিজ্ঞতা হয়—যে-সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলতে চাই।

'নয়নপুর ভিলার একজন বাসিন্দা হিসাবে রজত বোস সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল ছিল, যদিও প্রথম দিকে তাঁর উপর সন্দেহ পড়ার কোনও কারণ ছিল না। তাঁকে জেরা করে আমি জানতে পাই যে, তিনি ফিফটি সেভনে বি-কম পাশ করেন।

'এ ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, রজত বোস নামে কোনও ছাত্র ওই বছর বি. কম পাশ করেনি।'

আমি রজতবাবুর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ যেন কেমন মুষড়ে পড়েছেন। ফেলুদার দৃষ্টি তখন রজতবাবুর দিকে। সে বলল, 'এই গোলমালটা কেন হল বলতে পারেন ?'

রজতবাবু দু' বার গলা খাক্‌রে চুপ করে গেলেন। তার পর যেন নিজের মনকে শক্ত করে একটা বড় রকম নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুন করিনি, কিন্তু করতে চেয়েছিলাম—একশোবার চেয়েছিলাম। হি কিল্‌ড মাই ফাদার ! তার পর ঘুষ দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করেন। হি ওয়াজ এ ক্রিমিন্যাল !'

ফেলুদা বলল, 'সে ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করতে

চাই—সত্যি কি মিথ্যে বলুন।'

'কী কথা ?'

রজতবাবু এখনও হাঁপাচ্ছেন।

ফেলুদা বলল, 'সে দিন লোকনাথ রোজকার মতো দুধে বড়ি মিশিয়ে তার মনিবকে খবর দিতে গিয়েছিল। মজুমদার সেই সময় শুটিং দেখছিলেন। তখন দুধের গেলাস আর বড়ির বোতল খাবার ঘরে পড়ে ছিল। আপনি সুযোগ বুঝে দুধে আরও বেশি করে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন—তাই নয় কি ?'

রজতবাবু বললেন, 'আমি তো বলেইছি—আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু আপনি কাজটা করার আগেই ঘরে লোকনাথ ফিরে আসে—ঠিক কি না ? এবং সে আপনাকে ওখানে ওইভাবে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে। আপনি তার মুখ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন।'

'হি ওয়াজ এ ফল !' চেঁচিয়ে উঠলেন রজতবাবু। আমি ওকে দলে টানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও রাজি হয়নি।'

'তাই আপনি তাকে আক্রমণ করেন। সে আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বড়ি সমেত বোতল নিয়ে ঝাউবনে পালায়। আপনি তার পিছু নেন ; আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল—মিঃ মজুমদারের পেপার কাটার। আপনি তাকে ধরে ফেলেন, কিন্তু আপনি ছুরি মারার আগে সে তার হাতের বোতল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে থাকলেও রজতবাবু হঠাৎ ভেঙে পড়ে দু' হাতে মুখ গুঁজে নিলেন।

দু'জন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

'আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন', বলল ফেলুদা, 'আপনার সুটকেসে যে আর. বি. লেখা আছে, সেটা তো আসলে রমেন ব্রহ্ম, এবং সেই জন্যেই পরে রজত বোস নাম নিয়েছিলেন ?'

রজতবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা আবার তার কথা শুরু করল।

'এর মধ্যে গতকাল আবার একটা ঘটনা ঘটে। একজন লোক

কুয়াশার মধ্যে আমাকে খাদে ফেলে মারতে চেষ্টা করে।'

সমস্ত ঘর চুপ। সকলেই ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। ফেলুদা বলে চলল—

'লোকটিকে ভালো করে দেখা যায়নি কুয়াশার জন্য, তবে তার চাপ দাড়িটা যে কৃত্রিম, সেটা সন্দেহ করেছিলাম। সে লোকটি যখন আমাকে ঠেলা মারে, তখন আমি একটা সেন্টের গন্ধ পাই। সেটা ছিল ইয়ার্ডলি ল্যাভেণ্ডার এবং সে গন্ধ আমি আর একবার একজনের গায়ে পেয়েছিলাম—দমদম এয়ারপোর্টে রেস্টোরান্টে বসে।'

এখানে হঠাৎ রাজেন রায়না কথা বলে উঠল।

'আমি নিজে ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করি, কিন্তু মিস্টার মিত্তির যদি বলেন যে আমি ছাড়া সে সেন্ট কেউ ব্যবহার করে না, তা হলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন।'

ফেলুদার ঠোঁটের কোণে হাসি।

'আপনি যে এ কথা বলবেন তা আমি জানতাম', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু আমার কথা বলা তো এখনও শেষ হয়নি, মিঃ রায়না।'

'বলুন কী বলবেন।'

ফেলুদা এবার সাহার কাছ থেকে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা খাম বার করল। আর সেই সঙ্গে একটা বাঁধানো ছবি। এটা সেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গ্রুপ ফোটো।

'এই গ্রুপ ছবিটার কথা কি আপনার মনে আছে, মিঃ রায়না?'

'আই হ্যাভ নেভার সিন ইট বিফোর।'

'কিন্তু এতে যে আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন!'

'মানে?'

এইবার ফেলুদা খাম থেকে একটা ছবি বার করল। এটা একটা মুখের এনলার্জমেন্ট।'

'এই ছবিটার উপর আমার একটু কলম চালাতে হয়েছে', বলল ফেলুদা, 'কারণ তখন আপনার দাড়ি ছিল না, এখন হয়েছে। দেখুন তো এঁকে চিনতে পারেন কিনা। এটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস্

ডিপার্টমেণ্টের ভি. বালাপোরিয়ার ছবি।'

রায়না আর হাতে নিয়ে ছবিটা দেখল না। সে একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে। আমি দেখতে পাচ্ছি ছবিটার সঙ্গে রায়নার হুবহু সাদৃশ্য।

'যাঁর বাড়িতে আপনার শুটিং হবে তিনি যে আপনার এককালের বস্, এবং তিনি যে আপনাকে চিনে ফেলবেন, এটা আপনি কী করে জানবেন ? আর, একবার যদি সত্য কথা প্রকাশ পেয়ে যায়, তা হলে সেই কলঙ্কের চাপে আপনার ফিল্‌ম কেরিয়ারের কী দশা হবে সেটা তো আপনি বুঝতেই পারছিলেন। মিঃ মজুমদার আপনাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন। আপনি অস্বীকার করেন। তাতে তিনি বলেন, "ইউ আর এ লায়ার !" আর তার পর বাংলায় বলেন, "আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না"। আপনি এগারো বছর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, কাজেই আপনি বাংলা যথেষ্ট ভালো ভাবেই জানতেন।

'আর খুনের সুযোগের কথাই যদি হয়, তা হলে লাঞ্চের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ বন্ধ ছিল ; সেই ফাঁকে মিঃ মজুমদারের ঘরে যাওয়া আপনার সম্ভব ছিল ; আর মিঃ মজুমদার যখন আপনাদের তাঁর বালগোপালকে দেখাতে নিয়ে যান, তখন তার পাশেই যে একটি ভুজালি রয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।'

সাহা এবার রায়নার দিকে রওনা দিলেন। পুলক ঘোষাল মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মনের কী অবস্থা, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। লালমোহনবাবু এবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'কিন্তু মজুমদার "বিষ" কথাটা কেন লিখলেন—'

লালমোহনবাবুর কথা শেষ হল না, কারণ ফেলুদা আবার মুখ খুলেছে। সে বলল—

'আমি আরও বলছি, মিঃ রায়না। মিঃ মজুমদারকে যখন আপনি খুন করতে যান, তখন তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আপনাকে দেখেছিলেন। ছুরির আঘাতের পরও তিনি কয়েক মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন। কারণ ছুরি ঠিক মোক্ষম জায়গায় লাগেনি। মিঃ মজুমদার

আপনার নামটা লিখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোটা লিখতে পারেননি। সে নামটা কী আপনি বলবেন ?'—রায়না চুপ।

'আমি বলি ?'

রায়না চুপ।

'আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে, ভি. বালাপোরিয়া হচ্ছে বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া। বিষ্ণুদাসের "বিষ"-টুকু মজুমদার লিখতে পেরেছিলেন, আর পারেননি।'

'আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি !' বলে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া ওরফে রাজেন রায়না।

ফেলুদা এবার সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরণবাবু বললেন, 'আমি তো এদের কাছে শিশু !'

'তা বটে', বলল ফেলুদা। 'এবার সুটকেসটা খুলুন তো দেখি ; খুলে অষ্টধাতুর বালগোপালটা বার করে দিন।'

বিকেলে কেভেনটারসের ছাতে বসে কথা হচ্ছিল। আমরা তিনজন আর পুলক ঘোষাল।

'দার্জিলিংটা বড় অপয়া জায়গা, লালুদা', বললেন পুলক ঘোষাল। 'তার চেয়ে ভাবছি, সিমলায় করব শুটিংটা। রাজেন রায়নার জায়গায় অর্জুন মেরহোত্রা। কেমন মানাবে ?'

'দুর্দান্ত', বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে আমার অংশটা বাদ পড়বে না তো !'

'পাগল !—নভেম্বরেই শুটিং আরম্ভ করে ফেলব, আর ফেব্রুয়ারিতে শেষ। আরও চারখানা ছবি আছে আমার হাতে, সব এইট্টি সেভেনের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে।'

'চারখানা ছবি ! পর পর ?'

'তা আপনাদের আশীর্বাদে মোটামুটি চলছে ভালোই, লালুদা !'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললল, 'এঁকেও তা হলে এ. বি. সি.ডি. বলা চলে, তাই না ?'

'কি-রকম ?' চোখ কপালে তুলে জিগ্যেস করলেন জটায়ু।

'এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর !'

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

boiRboi.net

১

'এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?' এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু—'যা গন্‌গনে গরম পড়েছে, আর তো এখানে থাকা যায় না।'

'কোথায় যাওয়া যায়, সেটা আপনিই বলুন না', বলল ফেলুদা। 'ভ্রমণের নেশা তো আপনার আরও প্রবল। আমি তো ইচ্ছা করলে বারো মাস কলকাতায় পড়ে থাকতে পারি।'

'আপনার হাতে এখন কোনও কেস নেই তো ?'

'তা নেই।'

'তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায় যেতে চাইছে আপনার মন ?'

'পাহাড় তো বটেই ; আর পাহাড় বলতে আমি হিমালয়ই বুঝি। বিন্ধ্য, ওয়েস্টার্ন ঘাট্‌স—এ সব আমার কাছে পাহাড়ই নয়। আমার মন যেখানে যেতে চাইছে, সেখানে না গেলে নাকি জন্মই বৃথা।'

'কোথায় ?'

'এত হিন্টস দিলুম তাও বুঝতে পারলেন না ?'

'ভূস্বর্গ ?'

'এগজ্যাক্টলি ! কাশ্মীর ! প্যারাডাইজ অন আর্থ। রোজগার তো বলতে নেই, দুজনেরই অনেক হল। সংসার আপনারও নেই, আমারও নেই। এত টাকা জমিয়ে রাখছি কার জন্যে ? চলুন বেরিয়ে পড়ি—ক্যালকাটা টু ডেল্‌হি, ডেল্‌হি টু শ্রীনগর।'

'শ্রীনগরই তো কাশ্মীরের একমাত্র দেখার জায়গা নয়। আরও আছে।'

boiRboi.net

'সবই দেখা যাবে একে একে।'

'পাহালগাম, গুলমার্গ, খিলেনমার্গ—অনেক কিছু দেখার আছে।'

'তা বেশ তো ; দিন পনেরো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একটু ঘোরাঘুরি না করলে আমার মাথায় প্লট আসে না। পুজোর জন্য একটা কিছু লিখতে হবে তো !'

'আপনার অত অনেস্টির প্রয়োজন কী জানি না। আর পাঁচ জন যারা লিখছে, সব বিদেশি থ্রিলার থেকে প্লট সংগ্রহ করছে। ভদ্র ভাষায় বললাম, আসলে স্রেফ চুরি ছাড়া আর কিছুই না। আপনিও এবার লেগে পড়ুন।'

'হ্যাঁ, আমি চুরি করি আর শেষটায় আপনিই গালমন্দ করুন। আপনার কথার শ্লেষ ভুজালির চেয়েও তীক্ষ্ণ।'

'তা হলে যেভাবে চলছে চলুক—থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।'

'তা না হয় হল, কিন্তু কাশ্মীর যাবার ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে ?'

'হাউসবোটে থাকবেন তো ?'

'শ্রীনগরে ?'

'শ্রীনগর ছাড়া আর হাউসবোট নেই। ডাল লেকের উপরে থাকা যাবে।'

'সেই তো ভালো—তাই নয় কি ? বেশ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'অনেক খরচ কিন্তু। তার চেয়ে বোধ হয় হোটেল শস্তা।'

'ও সব খরচের কথা শুনতে চাই না। ব্যাঙ্কে অনেক জমে আছে—ইনকাম ট্যাক্স দিয়েও। যাব—গিয়ে ম্যাক্সিমাম ফুর্তি যাতে হয়, তাই করব।'

'তা হলে শ্রীনগরে হাউসবোট, পাহালগামে তাঁবু আর গুলমার্গে লগ ক্যাবিন।'

'চমৎকার ! টুরিস্ট অফিস থেকে লিটারেচর নিয়ে আসব, তারপর দিন ক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে।'

boiRboi.net

কাশ্মীরের প্রস্তাবটা ফেলুদারও মনে ধরেছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। লালমোহনবাবু ঘণ্টা দু-এক আড্ডা মেরে চলে যাবার পর ফেলুদা ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে চলে এল। বলল, 'মনস্থির যখন করেই ফেলা হয়েছে, তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ সোমবার ; শনিবার নাগাত বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'ঠাণ্ডা হবে না ওখানে ?'

'তা হবে, এবং তার জন্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে।'

'লালমোহনবাবু সেটা জানেন তো ?'

'নিশ্চয়ই জানেন। তবে সাবধানের মার নেই। কাজেই ওঁকে সেটা ফোনে জানিয়ে রাখা দরকার। এমনিতেই তো শীতকাতুরে।'

দু দিনের মধ্যে লন্ড্রি থেকে আমাদের শীতের কাপড় এসে গেল। ঠিক হল, প্রথমে শ্রীনগরেই দিন সাতেক থাকা হবে, তার পর অন্য জায়গাগুলো দেখা যাবে। হাউসবোট কাশ্মীর ট্যুরিজ্‌ম থেকে ব্যবস্থা করা হল। একটা হাউসবোটে একটা পুরো ফ্যামিলি থাকতে পারে। তাই তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমি না গিয়ে পড়া পর্যন্ত কল্পনাই করতে পারছিলম না ব্যাপারটা কি রকম হয়। নৌকোয় থাকা ! তাও আবার লাক্সারি নৌকো ! বোধ হয় জমিদারি আমলের বজরার মতো। পুস্তিকায় ছবি দেখে বুঝলাম যে হাউসবোটগুলো কটেজের মতো দেখতে। সেই সঙ্গে আবার ছোট ছোট নৌকোর ছবিও দেখা যাচ্ছে, যাতে করে ডাল লেকে ঘুরে বেড়ানো যায় ; কারণ হাউসবোটগুলো নড়েচড়ে বেড়ায় না।

ফেলুদাকে বললাম, 'যা বুঝছি শ্রীনগর শহরটায় দেখবার জিনিসের মধ্যে আছে কিছু বিখ্যাত মোগল বাগান। তবে পাহাড়েঘেরা উপত্যকা, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ঝিলাম বয়ে চলেছে, তা ছাড়া দু'-তিনটে লেক, পপলার, ইউক্যালিপটাস, চিনার গাছের সারি—মনে হয় জায়গাটা খুব সুন্দর। তবে গুলমার্গ পাহালগামও কিছু কম যায় না। পরে যদি ১১,০০০ ফুট খিলেনমার্গে ওঠা যায়,

তা হলে সেখান থেকে নাঙ্গা পর্বতের নাকি একটা অদ্ভুত ভিউ পাওয়া যায়। পনেরো দিনের জন্য খুব খুব জমজমাট ট্যুর, কাজেই চিন্তা করার কিছুই নেই।'

প্ল্যানমাফিক আমরা শনিবারই বেরিয়ে পড়লাম। এবার প্লেনে তিনজনের এক লাইনে সিট পড়েনি বলে লালমোহনবাবুকে আলাদা বসতে হল। ভদ্রলোক দেখলাম তাঁর পাশের একটি বাঙালির সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। দিল্লীতে এয়ারপোর্টে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সহযাত্রীটি কে ছিলেন মশাই ?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'নাম সুশান্ত সোম, এক রিটায়ার্ড জজের সেক্রেটারি। দলেবলে কাশ্মীর চলেছেন। ওঁরাও হাউসবোটে থাকবেন। ভদ্রলোক তোমার দাদাকে দেখেই চিনেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনও তদন্তে যাচ্ছি কি না। একবার মনে হল বলি হ্যাঁ, তারপর মাইন্ড চেঞ্জ করে সত্যি কথাটাই বলে দিলুম।'

চারিদিকে বাঙালির ভিড়, তাদের অনেকের কথাবার্তা শুনেই মনে হল, তাঁরাও কাশ্মীর যাচ্ছেন। শ্রীনগরের প্লেন ছাড়তে আরও তিন ঘণ্টা দেরি। তার মধ্যে আমরা আর এক প্রস্থ চা খেয়ে নিলাম। রেস্টোর‍্যান্টে লালমোহনবাবুর আলাপী ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। উনি আমাদের টেবিলের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'আমার নাম সুশান্ত সোম,' ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন—'আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ হল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন মিলেছে, তখন আপনার সঙ্গেও আলাপটা সেরে নিই। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার তদন্তের কথা অনেক পড়েছি। দাঁড়ান, আমার বস্‌ও হয়তো আপনাকে দেখলে খুশি হবেন।'

রেস্টোর‍্যান্টের দরজা দিয়ে আরও দল ঢুকেছে। সুশান্তবাবু তাদের দিকেই এগিয়ে গেলেন। জনা চারেক ভদ্রলোক, তার মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, প্রায় বৃদ্ধ বললেই চলে। সুশান্তবাবু তাঁকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কী বলতে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

'বসুন বসুন—উঠছেন কেন ?' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। আমি প্রায় সারা জীবন ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই প্রথম একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে দেখলাম।'

ফেলুদা বলল, 'ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত মানে— ?'

'আমি একজন রিটায়ার্ড জজ। বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। এখন সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছি। শরীরও কিঞ্চিৎ ভেঙে পড়েছে—সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে ঘুরতে হয়। ছেলেও আছে, বেয়ারাও আছে। আর আছে প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই ইনি। সুশান্ত খুব কাজের ছেলে। একে ছাড়া চলে না আমার।'

'আপনারা শ্রীনগরেই থাকবেন ?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আপাতত। তবে ইচ্ছে আছে কাশ্মীরটা একটু ঘুরে দেখার।'

'আমাদেরও ওই একই প্ল্যান', বলল ফেলুদা। 'শ্রীনগরে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। আপনারা কি হাউসবোটে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ। হাউসবোটটা একটা ইউনিক ব্যাপার। আমি সিক্সটি-ফোরে একবার এসে থেকে গেছি। ইয়ে, এনার সঙ্গে তো আলাপ হল না—' ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে ফিরেছেন।

'আমিও ক্রাইম', বলল জটায়ু। 'আমি একজন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক।'

'ওরে বাবা ! তা হলে তো ক্রিমিন্যাল ছাড়া সবাই উপস্থিত দেখছি...ঠিক আছে। দেখা হবে শ্রীনগরে। আমরাও একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।'

২

আকাশ থেকে শ্রীনগর উপত্যকার এক রূপ, আর মাটিতে নেমে আর এক রূপ। চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এও ঠিক যে, এ জায়গার সঙ্গে দার্জিলিং-সিমলার কোনও মিল নেই। শ্রীনগরের দৃশ্য একেবারে অনন্য। সেটা আরও বেশি করে

boiRboi.net

বুঝতে পারলাম ট্যাক্সিতে করে শহরে আসার সময়। শহর থেকে এয়ারপোর্ট সাত মাইল। একবার মনে হয়েছিল উপত্যকা বলে বুঝি অনেকটা কাঠমাণ্ডুর মতো হবে, কিন্তু তার পর লেক আর ঝিলাম নদী দেখে সে ধারণা একদম পাল্টে গেল।

আমাদের যেতে হবে ডাল লেকের দক্ষিণে শহরের রাস্তা বুলেভার্ডে। আধ ঘণ্টায় বুলেভার্ডে পৌঁছে গেলাম। লেকের এ দিকটা পাকা গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা। ঘাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট নৌকোয় গিয়ে উঠতে হয়। এই নৌকোকে এখানে বলে শিকারা। ভেনিসে যেমন জলপথে যাতায়াতের জন্য গণ্ডোলা, এখানে তেমনি শিকারা। আমাদের হাউসবোটের নাম 'ওয়াটার লিলি'। 'ওয়াটার লিলি'র শিকারাও ঘাটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা মালসমেত তাতে গিয়ে উঠলাম। তার পর পঞ্চাশ হাত খানেক গেলেই পাশাপাশি সার বাঁধা আর হাউসবোট নেই। যা আছে, সবই লেকের পশ্চিম অংশে।

শিকারা থেকে বোটে উঠতে কোনও কসরতের দরকার হয় না, খুবই সহজ ব্যবস্থা। বোটের সামনের দিকে খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে ইচ্ছা করলে বসা যায়, আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরের ডেকে ওঠার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে চেয়ারে বসে চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, চা খাওয়া যায়, আর স্রেফ আড্ডাও মারা যায়।

ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই বসবার ঘর, তাতে সোফা, চেয়ার, কার্পেট ইত্যাদি বৈঠকখানার যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে, দেয়ালে ছবি রয়েছে, ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আবার একটা ছোট লাইব্রেরিও রয়েছে। বসবার ঘরের পরে খাবার ঘর, দুটো বেডরুম, বাথরুম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে জলের উপর একটি বাংলো বাড়ি, যাতে সব রকম ব্যবস্থা আছে। কিচেনও আছে, তবে সেটা পিছন দিকে একটা ছোট্ট আলাদা নৌকোয়।

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি লেগেই আছে, বললেন, 'ভাগ্যিস ডিসিশনটা নিয়েছিলাম। এর ক্রেডিট কিন্তু সবটাই আমার পাওনা। তোমার দাদা ভূস্বর্গের কথা ভাবেননি।'

ফেলুদা বলল, 'আমি তো আপনার মতো লেখক নই।

আইডিয়া আসা উচিত আপনার মাথা থেকে। যাকগে, এখন আগে একটু চা খেয়ে শিকারায় করে লেকটা একবার ঘুরে দেখা যাক।'

দুজন চাকর রয়েছে হাউসবোটের সঙ্গে, নাম মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা।

চা খেয়ে বেরোতে সূর্য হেলে এল পশ্চিমে। মে মাস হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা ; আমাদের কলকাতায় শীতের সময় যে পোশাক পরতে হয়, এখন এখানেও তাই পরতে হয়। ফেলুদা বলল, 'আজ শুধু লেকটা ঘুরে দেখা যাবে, কাল থেকে সাইট সিইং আরম্ভ হবে। বুলেভার্ডের পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় রয়েছে, এক হাজার ফুট উঁচু। ওর মাথায় রয়েছে শঙ্করাচার্যের মন্দির। সম্রাট অশোকের ছেলে জালুকের তৈরি। তা ছাড়া লেকের পুব দিকে মোগল বাগান রয়েছে—নিশাদবাগ, শালিমার চশমা শাহি—এগুলোও দেখা চাই। চশমা শাহির স্প্রিং-এর জল নাকি একেবারে অমৃত—যেমনই স্বাদ, তেমনি ক্ষুধাবর্ধক।'

'লেকের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, ওটা কী ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানতাম ফেলুদা কাশ্মীর সম্বন্ধে সব পড়াশুনা করে এসেছে।

ফেলুদা বলল, 'ওটাকে বলে চার মিনার। দ্বীপটার চার কোণে চারটে চিনার গাছ রয়েছে।'

মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা শিকারা চালাতে আরম্ভ করল, আমরা বাঁয়ে গোটা দশেক হাউসবোট পেরিয়ে আসল লেকে গিয়ে পড়লাম। দুটো পাশাপাশি হাউসবোট নিয়ে রয়েছেন রিটায়ার্ড জজ সিদ্ধেশ্বর মল্লিক আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। আমরা খোলা লেকে পড়বার আগে একটা বোট থেকে সুশান্ত সোম আমাদের দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাবেন। চায়ের নেমন্তন্ন রইল।'

ডাল লেকের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারিদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে-ওখানে পদ্ম শালুক শাপলা ফুটে আছে, শিকারা সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে

চলেছে। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে, বললেন, 'কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের এথিনিয়াম ইস্কুলের মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা আট লাইনের কবিতা আছে। ভদ্রলোক বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন, আর সেই সব জায়গা নিয়ে পদ্য লিখে গেছেন। কাশ্মীরেরটা শুনুন ফেলুবাবু, কি রকম ডিসেন্ট—

করি নত শির
তোমারে প্রণমি কাশ্মীর
কুমারীকার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
ঝিলামের জলে ধোয়া অপূর্ব শহর
কত হ্রদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছা। ...'

'বাঃ, দিব্যি', বলল ফেলুদা—যদিও বুঝলাম সেটা জটায়ুর মনে কষ্ট না দেবার জন্য। কবিতায় লালমোহনবাবুর রুচিটা যে একটু গোলমেলে, তার পরিচয় এর আগেও অনেকবার পেয়েছি।

শুধু কবিতা নয়, ডাল লেকের দৃশ্যে ভদ্রলোককে গানেও পেয়েছে। গুনগুন করে কী গাইছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন উর্দু গজল।

এদিকে সন্ধ্যার আলো অনেক বেশিক্ষণ থাকে—অন্তত বছরের এই সময়টায়। আমরা সাড়ে সাতটায় যখন ফিরছি, তখনও পুরো অন্ধকার হয়নি।

সুশান্ত সোম তাঁদের হাউসবোটের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'আসুন, একটু আড্ডা মারা যাক।'

আমরা এঁদের বোটের সামনে শিকারা দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠলাম। এঁদের বোটের নাম 'রোজমেরি'। এঁদের পাশেই রয়েছে এঁদের অন্য বোট, সেটার নাম 'মিরান্ডা'। 'রোজমেরি'-তে থাকেন সুশান্ত সোম আর জজ সাহেবের ছেলে, নাম বিজয় মল্লিক। 'মিরান্ডা'-তে আছেন মিঃ মল্লিক, তাঁর ডাক্তার হরিনাথ মজুমদার

boiRboi.net

আর বেয়ারা প্রয়াগ।

চায়ের অর্ডার দিয়ে উপরের ডেকে উঠে সুশান্ত ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার তাস চলে ? তিন-তাস ?'

'অভ্যেস নেই', বলল ফেলুদা, 'তবে তাসের প্রায় সব খেলাই মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'নীচের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা জমেছে।'

'এত লোক পেলেন কোথায় ?'

'প্লেনে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়ের। একজন বাঙালি, নাম সরকার ; আর একজন পাঞ্জাবি। তিন জনেই জুয়াড়ি।'

আমরা চারজনে বসলাম। সত্যি, কলকাতা যে কোন সুদূরে চলে গেছে, তার কোনও হিসাবই নেই। হাউসবোটের টপ ডেকে বসে চা খাওয়ার আয়োজন—এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের ডান দিকের হাউসবোটে সাহেবরা এসে উঠেছে—সেখান থেকে বিলিতি বাজনার শব্দ আসছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাহেব-মেম সেই বাজনার সঙ্গে নাচছে সামনের বৈঠকখানায়।

ফেলুদা সুশান্তবাবুকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'সিদ্ধেশ্বরবাবু ক'দিন হল রিটায়ার করেছেন ?'

'পাঁচ বছর', বললেন সুশান্তবাবু। 'ওঁর তখন ষাট বছর বয়স।'

'কিন্তু জজের তো রিটায়ার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

'ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অ্যানজাইনা। ভদ্রলোকের রিটায়ার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তারের কথায় বাধ্য হয়ে করতে হয়। উনি বহু অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এক-এক সময় বলেন, 'আমার শেষ জীবনে দুঃখ আছে। এত লোককে ফাঁসিতে পাঠালে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। উনি ডায়েরি লিখতেন ; সে ডায়েরি সব এখন আমার হাতে, কারণ আমি ওঁর একটা জীবনী লিখছি—যদিও সেটা আত্মজীবনী হিসেবেই বেরোবে। সেই ডায়েরিতে উনি যেদিনই কারুর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন সেদিনই লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে ক্রসের সঙ্গে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। সেটাতে বুঝতে হবে,

প্রাণদণ্ড দিয়ে নিজেরই মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে এটা ঠিক হল কি না। এখন কী করছেন জানেন? ওঁর যে ডাক্তার—মজুমদার—তিনি ভালো মিডিয়ম—তাঁর সাহায্যে প্ল্যানচেট করছেন, আর ফাঁসির আসামীর আত্মাদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞেস করছেন, তারা সত্যিই খুন করেছিল কিনা। আত্মা যদি বলে যে হ্যাঁ, সে সত্যিই খুন করেছিল, তা হলে উনি খানিকটা নিশ্চিন্তবোধ করেন। এখন পর্যন্ত ওর জাজমেন্টে কোনও ভুল বেরোয়নি।'

'আপনারা কি এখানে এসেও প্ল্যানচেট করবেন নাকি?'

'সেই জন্যেই তো ডাক্তারকে একই হাউসবোটে রেখেছেন। ওর অ্যানজাইনাটা এখন অনেকটা কন্ট্রোলে এসেছে। আসলে ডাক্তার সঙ্গে এসেছেন প্ল্যানচেটের জন্য।'

'আজ রাত্রেও কি আপনাদের প্ল্যানচেট হবে।'

'আজ হয়তো হবে না, কিন্তু দু'-এক দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।...কেন বলুন তো?'

'আমি ইন্টারেস্টেড', বলল ফেলুদা। 'অবশ্যি উনি আমার উপস্থিতি বরদাস্ত করবেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।'

'সেটা আমি বলে দেখতে পারি। উনি আপনার প্রতি বেশ প্রসন্ন, সেটা আমি এর মধ্যেই বুঝেছি। আর এমনিতে প্ল্যানচেটের ব্যাপারে উনি কোনও গোপনতা অবলম্বন করেন না। যা ফলাফল হয়, সবই তো ওঁর আত্মজীবনীতে যাবে। আমি তো সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখছি।'

'তা হলে আপনি একটু জিজ্ঞেস করে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

আমরা চা খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে নিজেদের বোটে চলে এলাম। বৈঠকখানায় ঢুকে সোফায় ধপ করে বসে পড়ে লালমোহনবাবু বললেন, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং ম্যান—দিস্ জজ সাহেব।'

'ইন্টারেস্টিং তো বটেই', বলল ফেলুদা, 'তবে উনিই একমাত্র জজ নন, যাঁর এইরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ রকম ঘটনা

boiRboi.net

দেশে-বিদেশে আগেও শোনা গেছে।'

'ভালো কথা—আপনার সঙ্গে আমার পারমিশনটাও চেয়ে রাখবেন। প্ল্যানচেট দেখার সুযোগ ছাড়া যায় না।'

৩

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন শহরটা ঘুরে দেখলাম। লালমোহনবাবু একটা 'হটশট' ক্যামেরা কিনেছেন, তাই দিয়ে পটাপট ছবি তুলছেন। সেগুলো শহরের মাহাত্তা অ্যান্ড কোম্পানিতে ডেভেলাপ আর প্রিন্ট করে দেখা গেল মন্দ ওঠেনি। যদিও লালমোহনবাবুর নিজের মন্তব্য 'হাইলি প্রোফেশনাল' মোটেই মানা যায় না।

নিশাদবাগ, শালিমার আর চশমা শাহিও এক সকালে বেরিয়ে দেখে এলাম। মনটা চলে গেল সেই জাহাঙ্গির শাজাহানের আমলে। এই ট্রিপটা আমরা করেছিলাম মল্লিক ফ্যামিলির সঙ্গে, ফলে তাদের সঙ্গে আলাপটাও আরও জমে উঠল। সিদ্ধেশ্বরবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'আপনি শুনছি আমার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। আপনি প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেন?'

'আমার মনটা খুব খোলা, জানেন', বলল ফেলুদা। 'প্ল্যানচেট, স্পিরিচুয়ালিজম ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি অনেক পড়েছি। পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যে সম্ভব, সেটা বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলে গেছেন ; সেক্ষেত্রে প্ল্যানচেট সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করার কোনও মানে হয় না। তবে যেমন সব কিছুর মধ্যে থাকে তেমনই এর মধ্যে ধাপ্পাবাজি চলে। আসলে মিডিয়ম যদি খাঁটি হয়, তাহলেই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।'

'ডাঃ মজুমদার ইজ এ ফার্স্ট রেট মিডিয়ম। আপনি একদিন বসে দেখুন না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার বন্ধু আর আমার ভাইও আসতে চায়।'

'মনে বিশ্বাস থাকলে কোনও লোকের আসাতেই আমার আপত্তি নেই। আজই আসুন। ভালো কথা, আমি কাদের আত্মা নামাচ্ছি,

জানেন তো ?'

'যে সব লোককে আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, তাদের তো ?'

'হ্যাঁ। আমি জানতে চাইছি, আমার জাজমেণ্টে কোনও ভুলে হয়েছে কি না। এখন পর্যন্ত সে রকম ভুল পাইনি।'

'আপনারা রোজ একটি করে আত্মা নামান ?'

'হ্যাঁ। একটার বেশিতে ডাক্তারের স্ট্রেন হয়।'

'তা হলে ক'টায় আসব ?'

'আসুন রাত দশটায়। ডিনারের পর বসা যাবে। তখন চারিদিকটা বেশ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।'

ডিনারের পর আমরা মিঃ মল্লিকের হাউসবোটে গিয়ে হাজির হলাম। বসবার ঘরে প্ল্যানচেটের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা টেবিলকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার রাখা হয়েছে ; বুঝলাম চেয়ারগুলো খাবার ঘর থেকে আনা হয়েছে। আমরা আর সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলাম। মিঃ মল্লিক বললেন, 'আজ আমরা রামস্বরূপ রাউত বলে একটি বিহারী ছেলের আত্মাকে নামাব। এই ছেলেটির আজ থেকে দশ বছর আগে ফাঁসি হয়, এবং আমিই সে ফাঁসির জন্য দায়ী ছিলাম। আমার বিশ্বাস : এর ফাঁসির দণ্ড হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু জুরির ভার্ডিক্ট ছিল গিল্টি, আর খুনটাও ছিল একটু নৃশংস ধরনের। তাই আমি সাময়িক ভ্রান্তিবশত জেনেশুনেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিই। যদিও আমার মনে এই আদেশের যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কেসটা এমন চতুরভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে ছেলেটিকে অপরাধী বলেই মনে হয়।...মজুমদার তুমি তৈরি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জানালার সব পরদা টেনে দিয়ে ঘরটাকে একেবারে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সকলে যে যার জায়গায় বসেছি। আমার ডান দিকে ফেলুদা, বাঁ দিকে লালমোহনবাবু, ফেলুদার ডান পাশে মিঃ মল্লিক আর তাঁর পাশে—লালমোহনাবাবুর বাঁ দিকে—ডাঃ মজুমদার।

মিঃ মল্লিক গম্ভীরভাবে বললেন, 'ছেলেটির বয়স ছিল উনিশ। শার্প চেহারা, নাকের নীচে সরু গোঁফ, গায়ের রং পরিষ্কার। বিহারের ছেলে—নাম রামস্বরূপ রাউত। ছুরি দিয়ে খুনের মামলা, ঘটনাস্থল কলকাতার বাগবাজারের একটা গলি। ছেলেটিকে দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হয়নি। আপনারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী একটা চেহারা স্থির করে নিয়ে তাতে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করুন। প্রশ্ন আমিই করব, উত্তর মজুমদারের মুখ দিয়ে আসামীর কণ্ঠস্বরে বেরোবে।'

পনেরো মিনিট এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকার পরই বুঝলাম টেবিলটা আস্তে আস্তে নড়তে আরম্ভ করেছে। তার পর আরও জোরে দোলানি শুরু হল। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট খানেক পরে, মল্লিকমশাই প্রশ্ন করলেন—হিন্দিতে।

'তুমি কে?'

'আমার নাম রামস্বরূপ রাউত।'

ডাক্তারের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা। শুনে বেশ গা শিউরে ওঠে।

মিঃ মল্লিক আবার প্রশ্ন করলেন—

'তোমার ফাঁসি হয়েছিল ১৯৭৭ সালে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য দায়ী, তা তুমি জানো?'

'জানি।'

'খুনটা কি তুমিই করেছিলে?'

'না।'

'তবে কে করেছিল?'

'ছেদিলাল। সে ভয়ানক ধূর্ত ছিল। তার অপরাধ সে অত্যন্ত চতুরভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে। পুলিশ আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে।'

'আমি সেটা জানি। আমি তোমায় দেখেই বুঝেছিলাম যে, তোমার দ্বারা এ খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি

boiboi.net

তোমাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করি।'

'সে নিয়ে এখন আর ভেবে কী হবে ?'

'আমি চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'সেটা আমি খুব সহজেই করতে পারি। তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তারা ক্ষমা করবেন কি না জানি না।'

'তাদের কথা আমি ভাবছি না। তোমার ক্ষমাটাই আমার প্রয়োজন।'

'মৃত্যুর পর আর কারুর ওপর কোনও আক্রোশ থাকে না।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মিঃ মল্লিক উঠে গিয়ে ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন। ডাঃ মজুমদারের জ্ঞান আসতে আরও মিনিট দু'-এক লাগল।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল বটে।

'মনটা অনেকটা হাল্‌কা লাগছে', বললেন মিঃ মল্লিক, 'এই একটি মৃত্যুদণ্ডে যে আমি ভুল করেছিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এবং এখন তো বুঝতেই পারছি যে আমার ধারণাই ঠিক।'

ফেলুদা বলল, 'এই প্ল্যানচেট করে কি আপনি নিজের মনটাকে হালকা করতে চান ?'

'শুধু তাই নয়', বললেন মিঃ মল্লিক, 'আমার মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে যে, আদৌ একজন মানুষ আর একজনের প্রাণদণ্ড দিতে পারে কি না।'

'কিন্তু তা ব'লে খুনির শাস্তি হবে না ?'

'হবে—কিন্তু প্রাণদণ্ডের দ্বারা নয়। কারাদণ্ড নিশ্চয়ই চলতে পারে। তা ছাড়া অপরাধীর সংস্কারের জন্য রাস্তা বার করতে হবে।'

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মল্লিক বলেন, 'আমরা গুলমার্গ যাচ্ছি পরশু। আপনারা আসুন না আমাদের সঙ্গে।'

ফেলুদা বলল, 'সে তো খুব ভালোই হয়। ওখানে কি

boiRboi.net

থাকবেন ?'

'এক রাত', বললেন ভদ্রলোক। 'গুলমার্ক থেকে খিলেনমার্গ যাব—তিন মাইল পথ—হেঁটেও যাওয়া যায়, ঘোড়াতেও যাওয়া যায়। তার পর ফিসে এসে এক রাত থাকা। এখান থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ; আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্সিই আপনাদেরটাও করে দেবে।'

সেই কথা রইল। আমরা তিনজনে আমাদের হাউসবোটে ফিরে এলাম।

ফেলুদা শুতে যাবার আগে বলল, 'মল্লিকমশাইয়ের ধারণাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। একজন খুনির প্রাণদণ্ড হবে না, সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। ভদ্রলোকের আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে। অবিশ্যি একজন জজের এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

'তবে ভেবে দেখুন', বললেন লালমোহনবাবু, 'এক কথায় একটা লোকের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। কতখানি ক্ষমতা দেওয়া থাকে একজন জজের হাতে। এই ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়লে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনে সংশয় আসতে পারে বইকি।'

'সেটা অবশ্য ঠিক', বলল ফেলুদা।

৪

boiRboi.net

শ্রীনগরের সঙ্গে গুলমার্গের কোনও মিলই নেই। এখানে হ্রদ, নদী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি কিছুই নেই ; যা আছে, তা হল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে মসৃণ ঘন সবুজ ঘাস—যা দেখতে একেবারে মখমলের মতো ; আর আছে ঝাউ বন আর পাইন বন আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাঠের ঘর বাড়ি। সব মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর। এই পাহাড়ের গায়েই গল্‌ফ খেলা হয়। আর শীতকালে যখন ঘাস বরফে ঢেকে যায়, তখন স্কিইং হয়।

শ্রীনগর থেকে টাংমার্গ পর্যন্ত আঠাশ মাইল ট্যাক্সি করেই আসতে হয়, তার পর শেষের চড়াই চার মাইল যেতে হয় ঘোড়াতে।

কলকাতায় থাকতেই ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল যে, কাশ্মীরে ঘোড়ায় চড়তে হবে।—'ভয় নেই, উটের চেয়ে অনেক সহজ।' লালমোহনবাবু একেবারে পাকাপোক্ত রাইডিং ব্রিচেস করিয়ে এনেছিলেন। গুলমার্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললেন ঘোড়া চড়ার মতো সহজ ব্যাপার আর নেই।

আমাদের সঙ্গে মল্লিক মশাইরাও এসেছেন। আমরা আজকের রাতটা গুলমার্গে থেকে কাল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর দু' হাজার ফুট ওপরে খিলেনমার্গ দেখে বিকেলেই শ্রীনগর ফিরে যাব।

থাকার জন্য আমরা পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন নিয়েছি। আমাদেরটা ছোট, ওদেরটা বড়। বিকেলে ক্যাবিনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তিনজন ভদ্রলোক এসে হাজির—সুশান্তবাবু, সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের ছেলে বিজয়বাবু ও আর একজন—যাকে আমরা চিনি না, সুপুরুষ চেহারা, টক্‌টকে রং, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। সত্যি বলতে কি, তিনজনেই মোটামুটি এক বয়সী।

সুশান্তবাবু নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁর নাম অরুণ সরকার। ইনি কলকাতায় ব্যবসা করেন। আমাদের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ। জুয়াড়িদের একজন বললে বোধ হয় আপনার চিনতে আরও সুবিধে হবে।'

সকলেই হেসে উঠল। সুশান্তবাবু বললেন, 'আমরা এসেছি কেন বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের সঙ্গে আলাপ করতে এঁরা দুজনেই খুব ব্যগ্র। তা ছাড়া শুনছিলাম, আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলিও তো একজন নামী লেখক—ওঁর সব বই-ই নাকি বেস্ট-সেলার।'

লালমোহনবাবু মাথা হেঁট করে হেঁ হেঁ করে একটু বিনয়ের ভাব দেখালেন।

বিজয় মল্লিক আর অরুণ সরকারের খাতিরে ফেলুদাকে তার গোটা দু'-তিন বিখ্যাত কেসের বর্ণনা দিতে হল। শেষ হয়ে যাবার পর সরকার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী কাশ্মীরে এই প্রথম?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ, এই প্রথম। আমি কিন্তু আপনাকে প্রথমে

দেখে কাশ্মীরী ভেবেছিলাম। আপনি বোধ হয় এখানে আর একবার এসেছেন?'

'তা এসেছি', বললেন সরকার। 'ইন ফ্যাক্ট, আমার ছেলেবেলার কয়েকটা বছর শ্রীনগরেই কেটেছে। বাবা এখানে একটা হোটেলে ম্যানেজারি করতেন। তার পর বছর কুড়ি আগে আমরা কলকাতা চলে যাই।'

'এখানকার ভাষা আপনার জানা নেই?'

'তা অল্পবিস্তর আছে বইকি।'

এবার ফেলুদা বিজয় মল্লিকের দিকে ফিরল।

'আপনার বাবার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে আপনার কোনও কৌতূহল নেই?'

বিজয়বাবু বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'বাবার ভীমরতি ধরেছে', বললেন বিজয়বাবু। 'একজন খুনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।'

'আপনি সে কথা বাবাকে বলেননি?'

'বাবার সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্ক নয়। উনি আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন না, আমিও ওঁর ব্যাপারে কিছু বলি না।'

'আই সি।'

'তবে বাবা যা করছেন তা করে যদি শান্তি পান, তা হলে আমার বলবার কিছু নেই।'

'আপনার মা নেই?'

'না। মা বছর চারেক হল মারা গেছেন।'

'আর ভাই বোন?'

'এক দাদা ছিল, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং করত, সে গত বছর মারা যায়। তার মেমসাহেব বউ আর এদেশে আসেনি। এক বোন আছে, তার স্বামী ভূপালে কাজ করে।'

'আমার বিশ্বাস আপনার কাশ্মীরের দৃশ্য সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল নেই।'

'কী করে বুঝলেন?'

boiRboi.net

'কারণ যে পরিমাণ সময় ঘরে বসে তাস খেলে কাটান !'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে কাব্য নেই। আমি কাঠখোট্টা মানুষ। আমার দু'-একজন বন্ধু আর দু' প্যাকেট তাস হলেই হল।'

সরকার একটু হেসে বলল, 'আমি কিন্তু তাসও খেলি, আবার দৃশ্যও দেখি। সেটা বোধহয় ছেলেবেলায় কাশ্মীরে থাকার জন্য হয়েছে।'

'যাই হোক্'—বিজয়বাবু উঠে পড়লেন—'আমাদের কিন্তু তাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। আজ সুশান্তকে দলে টেনেছি। আপনারা কেউ— ?

'আমরা ভাবছিলাম একটু ঘুরতে বেরোব। আপনারা এখন কিছুক্ষণ খেলবেন তো ?'

'এগারোটা পর্যন্ত তো বটেই।'

'তা হলে ফিরে এসে একবার টুঁ মারব।'

'বেশ। কাল আবার দেখা হবে।'

'তিন ভদ্রলোক গুডবাই করে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'এখন না বেড়িয়ে আফটার ডিনার ওয়াকে বেরোলে ভালো হত না ?'

'তথাস্তু', বলল ফেলুদা।

এখানে ক্যাবিনের সঙ্গে বাবুর্চি রয়েছে, তাকে বলে দিয়েছিলাম রাত্তিরে ভাত আর মুরগির কারি খাব। দেখলাম দিব্যি রান্না করে। সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না, তাই তিনজনেই বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাতের গুলমার্গ শহর দেখতে বেরোলাম।

নিরিবিলি শহর, তার মধ্য দিয়ে তিনজন হেঁটে চলেছি। পথে যে লোক একেবারে নেই, তা নয়। ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সত্যি বলতে কি, হিসেব নিলে বোধহয় বিদেশি টুরিস্টই সংখ্যায় বেশি হবে। লালমোহনবাবু এখনও গুনগুন করে গজল গাইছেন, খালি শীতের জন্য গলায় মাঝে মাঝে অযথা গিটকিরি এসে যাচ্ছে।

'শীত লাগছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তা লাগছে, তবে মনে হয় খুব স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এ সব জায়গায় বেশি রাত না করাই ভালো। চ' তোপ্‌সে, ফেরা যাক।'

আমরা উল্টোমুখে ঘুরলাম। শহর আর আমাদের ক্যাবিনের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। সেখানটা বসতি নেই বললেই চলে। আমরা সেই জায়গাটা দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল। কী যেন একটা জিনিস শন্‌শন্ শব্দে আমাদের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা গাছের গায়ে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। 'আমাদের মাথা' বলছি, কিন্তু আসলে সেটা ঠিক ফেলুদার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ফেলুদার কাছে টর্চ ছিল, সেটা জ্বালিয়ে গাছের তলায় ফেলতেই দেখা গেল বেশ বড় একটা পাথর। সেটা ফেলুদার মাথায় লাগলে নির্ঘাৎ একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত।

প্রশ্ন হচ্ছে—কে এই লোকটা, যে-এভাবে আক্রমণটা করল ? আর এর কারণই বা কী ? আমরা তো সবে এখানে এসেছি। এখনও গোলমেলে ব্যাপার কিছু ঘটেনি, তদন্তের কোনও প্রশ্নই উঠছে না, তাহলে এই হুম্‌কির মানে কী ?

ক্যাবিনে ফিরে এসে ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, 'ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না। আমাকে পছন্দ করছে না কেউ ; এবং গোয়েন্দাকে হটানোর চেষ্টার একটাই কারণ হতে পারে—কোনও কুকীর্তি হতে চলেছে। অথচ সেটা যে কী, সেটা আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনার সেই ·৩২ কোল্ট রিভলভারটা আশা করি এনেছেন।'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বাক্সেই রাখা থাকে। কিন্তু রিভলভার ব্যবহার করার সময় এখনই এল কই ? কোনও ক্রাইম তো ঘটেনি এখনও !'

'যাই হোক, রাত্তিরে দরজা-জানালা সব ভালো করে বন্ধ করে শুতে হবে। এখানে রিস্‌ক নেওয়া চলবে না। আশ্চর্য ব্যাপার

boiRboi.net

মশাই !—আপনার সঙ্গে ছুটিতে কোথাও বেরোলেই কি গণ্ডগোল শুরু হবে ?'

ফেলুদা একটু ভেবে বলল, 'যাই, ওদের সঙ্গে একটু তাস পিটিয়ে আসি। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব। আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

৫

আগেই বলেছি যে, খিলেনমার্গ যেতে হলে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে দু' হাজার ফুট উপরে উঠতে হয়। আমরা দুই ক্যাবিনের বাসিন্দারা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। সেটাই করা হল।

আমাদের মধ্যে এক মিঃ মল্লিকই ঘোড়া নিলেন, আর-সকলে হেঁটে যাওয়া স্থির করলাম। শুনেছি, পথের দৃশ্য অতি চমৎকার, আর দু' পাশে অনেক ফুল গাছ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'এই সাত দিনেই এনার্জি বেড়ে গেছে মশাই। হেঁটে দু' হাজার ফুট পাহাড়ে ওঠাটা কোনও ব্যাপারই বলে মনে হচ্ছে না।'

সত্যিই পথের দৃশ্য অপূর্ব। আমরা তিনজনে মোটামুটি একসঙ্গে হাঁটছি, বাকি ওদের দল ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দলে আছি সব সুদ্ধ ন' জন—আমরা তিন জন, মিঃ মল্লিক, বিজয় মল্লিক, ডাঃ মজুমদার, সুশান্তবাবু, মিস্টার সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

প্রায় দু' ঘণ্টা লাগল দু' হাজার ফুট উঠতে ; আর উঠেই এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের হকচকিয়ে দিল। আমরা একটা পাহাড়ের পিঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, মাটিতে বরফ, সামনে বরফের পাহাড় আর উল্টো-দিকে ছড়িয়ে আছে গাছপালা নদী হ্রদ-সমেত দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকা, আর তারও পিছনে আকাশের গায়ে যেন খোদাই করা রয়েছে নাঙ্গা পর্বত।

ফেলুদা বলল, 'এই বোধ হয় ক্লাইম্যাক্স। কাশ্মীরে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কি ?'

লালমোহনবাবু ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বার বার বলছেন, 'আসুন, একটা গ্রুপ তুলি, একটা গ্রুপ তুলি এই বরফের উপর দাঁড়িয়ে।'

হঠাৎ বাকি দল থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। সেটা একটা প্রশ্নের আকার নিয়ে আমাদের কানে এল।

'মণ্টু কই ?'

প্রশ্নটা করেছেন মিঃ মল্লিক, অত্যন্ত ব্যস্ত কণ্ঠে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মণ্টু হল বিজয় মল্লিকের ডাক-নাম। কারণ দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? এতই পিছিয়ে পড়েছেন কি ? না, তা তো হতে পারে না। এঁরা একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে হাঁটছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজয়বাবু কি একেবারে দলছুট হয়ে গিয়েছিলেন ?'

এবার সুশান্ত সোমের গলা শোনা গেল। 'আপনি এখানেই থাকুন মিঃ মল্লিক। আমরা নীচে খোঁজ করে আসছি।'

যেমন কথা তেমন কাজ, আর এই অনুসন্ধানের পার্টিতেও আমরা যোগ দিলাম।

যে পথ দিয়ে উপরে উঠেছি, এবার সেই পথ দিয়েই নেমে যাওয়া। আমার বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ করছে। লোকটা গেল কোথায় ?

সুশান্তবাবু গলা তুলে চিৎকার দিলেন।

'বিজয়বাবু ! বিজয়বাবু !'

কোনও উত্তর নেই।

মিনিট পনেরো নামার পরেই হঠাৎ লালমোহনবাবু এক জায়গায় এসে থম্‌কে থেমে গেলেন, তাঁর দৃষ্টি একটা ঝোপের দিকে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দৌড়ে গেল ঝোপটার দিকে, কারণ পাতার ফাঁক দিয়ে একটা জুতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ে ওঠার বুট।

'মিঃ সোম !' ফেলুদা হাঁক দিল।

মিঃ সোম দৌড়ে পৌঁছে গেল ফেলুদার পাশে, তার পিছনে বাকি চারজন।

boiRboi.net

ঝোপের পিছনে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বিজয় মল্লিক।

ফেলুদা নাড়ি টিপেই বলল, 'হি ইজ অ্যালাইভ। মনে হয় মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

কাছেই একটা ঝরনা ছিল, তার থেকে আঁজলা করে জল এনে মুখে ঝাপটা দিতে ভদ্রলোক চোখ খুলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। তার পর অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায়— ?'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার এ অবস্থা কী করে হল ?'

কেউ...ধাক্কা...'

'আপনি যেখানে পড়েছেন, মনে হয় আপনাকে অনেক উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে হয়েছে।'

'হ্যাঁ...তাই...একটা ফুল দেখছিলাম ঝুঁকে পড়ে...'

'অজ্ঞানটা হয়েছেন এই গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠোকা খেয়ে ?'

'তাই হবে।'

'আপনি দেখুন তো উঠতে পারেন কি না।'

ফেলুদা ভদ্রলোকের দু' হাত ধরে নিজের কাঁধের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু টলোমলো অবস্থার পর ভদ্রলোক দেখলাম নিজেকে সামলে নিলেন।

ফেলুদা এবার মাথাটা দেখে বলল, 'একটা জায়গায় চোট লেগেছে, রক্ত বেরোয়নি, তবে জায়গাটা ফুলে গেছে। দু'-তিন দিন একটু ভোগাবে আপনাকে। এখন আপনি ফিরে চলুন। একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তা না হলে আস্তে আস্তে হেঁটে চলুন। পরে এক সময় আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছে রইল।'

বিজয়বাবু এতক্ষণে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে গেছেন, কেবল দু'-এক বার মাথার একটা বিশেষ জায়গায় আলতো করে হাত বোলালেন।

আমি মনে মনে ভাবছি—ভদ্রলোকের এ দশা করল কে এবং কেন ?

গুলমার্গ ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। আমরা যে যার ক্যাবিনে চলে গেলাম। ফেলুদা বলল, 'আগে একটু চা খাওয়া

দরকার।'

খানসামাকে চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর লক্ষ করলাম, ফেলুদার ভুরুটা অস্বাভাবিক রকম কুঁচকে আছে।

চায়ের পর দেখি, বিজয়বাবু নিজেই এসে হাজির, সঙ্গে সুশান্তবাবু আর মিঃ সরকার।

'বাধ্য হয়েই আপনার কাছে আসতে হল', বললেন বিজয়বাবু। 'আমি এত হতভম্ব আর কখনও হইনি।'

'আপনার উপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কেউ নেই এখানে?'

'কে থাকতে পারে বলুন! তাহলে তো সুশান্ত বা ডাঃ মজুমদার বা মিঃ সরকারের কথা বলতে হয়। সে তো হাস্যকর ব্যাপার হত!'

'কাশ্মীরে এসে পূর্বপরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না।'

'কলকাতাতে এমন কেউ নেই, আপনার উপর যার কোনও আক্রোশ থাকতে পারে।'

'আমি তো সে রকম কারুর কথা জানি না।'

'আপনি তো কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গ্র্যাজুয়েট?'

'হ্যাঁ। স্কটিশ চার্চ কলেজ।'

'মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট ছাত্রজীবন ছিল?'

'ঠিক তা বলা যায় না।'

'কেন?'

'কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে কুসঙ্গে পড়ি, নেশা ধরি, ড্রাগস।'

'হার্ড ড্রাগস?'

'হ্যাঁ—কোকেন, মর্ফিন...'

'তার পর?'

'বাবা টের পেয়ে যান।'

'বাবা তো তখনও জজিয়তি করতেন?'

boirboi.net

'হ্যাঁ।'

'তার পর ?'

'তিনি আমার এই অভ্যাস ছাড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তার পর আশা ছেড়ে দেন।'

'এই অবস্থাতেও আপনি গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছিলে ?'

'আমি খুবই ভালো ছাত্র ছিলাম।'

'আপনি বাড়িতেই থাকতেন ?'

'কিছু দিন ছিলাম, তার পরে আর পারিনি। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কানপুরে এক আশ্চর্য লোকের সংস্পর্শে আসি। সাধুই বলতে পারেন। নাম আনন্দস্বামী। তখনও আমি নেশায় মত্ত, কিন্তু ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে আমার নেশা চলে যায়। একে মিরাক্‌ল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই।'

'তার পর বাড়ি ফেরেন ?'

'হ্যাঁ। বাবা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেন।'

'তখন আপনার বয়স কত ?'

'সাতাশ-আটাশ হবে।'

'তার পর ? আপনি চাকরি করেন ?'

'বাবাই একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দেন। আমি এখনও সেখানেই আছি।'

'আপনার জুয়ার প্রতি একটা আসক্তি আছে না ?'

'তা আছে।'

সেটা কোনও সমস্যার সৃষ্টি করছে না তো ?'

'না।'

'আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, আপনার কোনও শত্রু আছে কি না, আপনি কী বলবেন ?'

'যত দূর জানি, আমাকে খুন করতে চাইবে এমন কোনও শত্রু আমার নেই। ছোটখাটো শত্রু বোধ হয় সকলেরই থাকে—তার পিছনে ঈর্ষা থাকতে পারে। এটা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

boiRboi.net

'একশোবার।...এবার আরও দু'-এক জন সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করে নিই। ডাঃ মজুমদারকে আপনি কদ্দিন থেকে চেনেন ?'

'উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আজ প্রায় পনেরো বছর হল।'

'বেশ। আবার সুশান্তবাবুকে একটা প্রশ্ন।'

সুশান্তবাবু বললেন, 'বলুন।'

'আপনি কতদিন হল মিঃ মল্লিকের সেক্রেটারির কাজ করছেন ?'

'ওঁর রিটায়ার করার সময় থেকেই। তার মানে পাঁচ বছর।'

'বেয়ারা প্রয়াগ কত দিন আছে ?'

ও-ও আন্দাজ পাঁচ বছর। মিঃ মল্লিকের পুরনো বেয়ারা মকবুল হঠাৎ মারা যায়। তার পর উনি প্রয়াগকে রাখেন।'

'বেশ, আজ এই পর্যন্তই থাক। তবে পরে দরকার হলে আবার প্রশ্ন করতে পারি তো ?'

'নিশ্চয়ই', বললেন বিজয়বাবু।

৬

'কী মশাই, আবার যেই কে সেই ?'

শ্রীনগর ফিরে এসে আমরা সকালে বোটের উপরের ডেকে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু মন্তব্যটা করলেন।

'যেই কে সেই', বলল ফেলুদা। 'যা বুঝছি, ছুটি-ভোগ মানেই দুর্ভোগ। ক্রাইম যেন আমাদের পিছনে ওঁত পেতে থাকে, একটু আরাম করলেই ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে এবার যে রকম হতভম্ব হয়েছি, সে রকম কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কোনও খুঁটিই যেন খুঁজে পাচ্ছি না, যেটা ধরে একটু এগোব। সব অন্ধকার।'

তার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'সুশান্তবাবুকে বলতে হবে একবার যদি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো দেন।'

'ও ডায়েরি দিয়ে আপনার কী লাভ?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'কিসে কী কাজ দেয় তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে? অবশ্য মিঃ মল্লিকের রাজি হওয়া চাই। সেটা সুশান্তবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'তা, সে তো এখনই পারেন—ওই তো সুশান্তবাবু।'

সত্যিইদেখি, ভদ্রলোক শিকারা করে বুলেভার্ডের দিক থেকে ফিরছেন, সঙ্গে কিছু খরিদ করা জিনিসপত্র।

ফেলুদা ডেকের রেলিং-এর পাশে ঝুঁকে পড়ে ডাক দিল।

'ও মশাই, এক মিনিট এদিকে আসতে পারেন?'

শিকারাটা আমাদের বোটের কাছে চলে এল। ফেলুদা বলল, 'মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?'

'সবগুলো', বললেন সুশান্তবাবু, 'চব্বিশটা আছে।'

'ওগুলো দু'-তিনটে করে ধার নিতে পারি? মল্লিক ফ্যামিলি সম্বন্ধে আর একটু জানতে না পারলে আমি এই নতুন পরিস্থিতির ঠিক কিনারা করতে পারছি না। আমার মনে হয় ডায়েরিগুলো পড়লে কিছুটা সুবিধা হতে পারে।'

সুশান্তবাবু বললেন, 'আমি একবার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মনে হয় না উনি কোনও আপত্তি করবেন, কারণ আপনারা তো সবই শুনেছেন ওঁর মুখ থেকে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সুশান্তবাবু চারটে পুরনো ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে আমাদের হাউসবোটে এসে হাজির। বললেন, 'এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, "জীবনী যখন বেরোবে, তখন তো সবই জানাজানি হয়ে যাবে। কাজেই এখন পড়তে দিতে আর কী আপত্তি থাকতে পারে? আর ক্রাইমের কথাই যদি হয়, তা হলে সবই তো খবরের কাগজের রিপোর্টে বেরিয়েছে"।

ফেলুদা বলল, 'এগুলো দেখা হয়ে গেলে আর এক সেট আমি আপনারা কাছ থেকে চেয়ে আনব।...তোপ্‌সে—তুই আর লালমোহনবাবু বরং যা, মানসবল লেকটা দেখে আয়। আমি এখন

boighar.net

একটু ঘরে বসে আজ করব।'

'ভালো কথা', বললেন, 'সুশান্তবাবু, 'আপনার পাহালগাম যাবেন না ?'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'কবে যাবেন ? আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে গেলেই ভাল। আমরা পরশু যাচ্ছি।'

'ভেরি গুড।'

মানসবল লেকের মতো স্বচ্ছ জল আমি আর কোনও লেকে দেখিনি। জলের একেবারে তল অবধি উদ্ভিদ দেখা যায়। ভারি অদ্ভুত লাগে দেখতে।

লালমোহনবাবু দৃশ্য উপভোগ করলেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, মাঝে মাঝে ওঁর ফেলুদার তদন্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার বললেন, 'তোমার দাদা ওই ডায়েরিগুলো পড়ছেন কেন জানি না। যাদের একবার ফাঁসি হয়ে গেছে, তারা তো আর খুনখারাপি করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'সেটা ফেলুদাকেই বুঝতে দিন না।'

মানসবল শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে ; আমাদের ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। ফেলুদা দেখলাম বৈঠকখানার সোফায় বসে তখনও ডায়েরি নিয়ে পড়ছে। বলল, 'সারা দিনে বারোটা ডায়েরি পড়ে শেষ করেছে এবং সব ক'টাই নাকি ইন্টারেস্টিং।'

'কোনও কাজ হল কি ?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'কাজ কিসে হয়, সেটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না। আপাতত আমার কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। নতুন তথ্য কিছু বেরিয়েছে—শুধু ডায়েরি থেকে নয়। যেমন বিজয়বাবু বলেছেন যে, সেদিন যে উনি ঘাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন তখন একটা ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। আমার মতে সেটা আংটি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তবে তাতেও যে খুব সুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ আংটি এখানে তিনজন পরেন—সুশান্তবাবু, মিঃ সরকার আর প্রয়াগ। আর যদি এ দলের

বাইরে কেউ থাকে, তা হলে তো চমৎকার। তা হলে আমাদের কোনও তদন্তই কাজ দেবে না।’

‘কিন্তু সে রকম দল কি বেশি ছিল ?’ জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘তা ছিল না ঠিকই।’

‘আমার তো একটিও মনে পড়ছে না।’

‘একটি ছিল—পাঞ্জাবি দল—তবে তাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই ছিল ঘোড়ার পিঠে।’

‘আশা করি আর কোনও গোলমাল হবে না।’

‘আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভূস্বর্গে এসে এ সব ঝামেলা ভালো লাগে না—বিশেষ করে যখন বুদ্ধি খাটাবার কোনও স্কোপ পাওয়া যাচ্ছে না।’

পাহালগাম যাবার আগে আমরা শ্রীনগরে আর এক দিন ছিলাম, তার মধ্যে ফেলুদা মিঃ মল্লিকের বাকি ডায়েরিগুলো পড়া শেষ করে ফেলল।

‘কী বুঝলেন ?’ জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, ‘অন্তত ছ'টা প্রাণদণ্ড সম্পর্কে উনি নিশ্চিত যে, সেগুলো অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোতে তিনি ভুল করেছেন। এই ছ'টা কেসেই কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। একটি বিশেষ কেস—সেখানে আবার আসামী হচ্ছেন কাশ্মীরী, নাম সপ্রু—সেখানে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পরে মল্লিকের খুব অনুশোচনা হয়। তার পরেই অবিশ্যি ওঁর অ্যানজাইনার পেইন আরম্ভ হয় এবং উনি কিছু দিনের মধ্যে রিটায়ার করেন।’

পাহালগাম শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল। লিদর উপত্যকায় ছোট্ট শহর। এক পাশ দিয়ে খরস্রোতা লিদর নদী বয়ে গেছে। তাতে সাহেবরা ট্রাউট মাছ ধরে। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। আগে এখানে হোটেল-টোটেল ছিল না, এখন অনেক হয়েছে। তবে এখনও ইচ্ছে করলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে নদীরে ধারে থাকা যায়। আমরা সেভাবেই থাকব বলে ঠিক করলাম।

চারটে ট্যাক্সি করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বারোটার মধ্যে আমরা পাহালগাম পৌঁছে গেলাম। শহরটা একপেশে ; নদীর পশ্চিম দিকে শুধু পাহাড়, বাড়ি ঘরদোর কিছুই নেই। আর পুব দিকে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট, দোকান-পাট নিয়ে ছবির মতো শহর।

আমাদের তাঁবুর জন্য আগেই বলা ছিল, গিয়ে দেখি যে তাঁবু খাটাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এ তাঁবু স্পেশ্যাল ধরনের মজবুত তাঁবু, এতে ডাইনিং রুম, বেডরুম, অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম সবই আছে। আমাদের একটা তাঁবু আর মল্লিকদের দুটো। সামনে বিশ হাতের মধ্য দিয়ে তোড়ে বয়ে চলেছে লিদর নদী, তার একটানা শব্দ কখনও থামে না। লালমোহনবাবু হলিউডের ছবির কথায় চলে গেলেন ; বললেন, 'মশাই, একমাত্র ওয়েস্টার্ন ছবিতেই এ রকম আউটডোর লাইফ দেখেছি ; আমাদের আবার কোনও দিন এ রকমভাবে থাকতে হবে, ভাবতে পারিনি।'

দুপুরে তাঁবুতে লাঞ্চ খেয়ে (এখানেও সঙ্গে কিচেন রয়েছে) সবে বাইরে বেরিয়েছি, এমন সময় দেখি সুশান্ত সোম আমাদের তাঁবুর দিকে আসছেন।

'লাঞ্চ শেষ ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ', বলল ফেলুদা।

'এখান থেকে আট মাইল দূরে চন্দনওয়াড়ি বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো ?'

'যেখানে একটা বরফের ব্রিজ আছে—সেটা সারা বছর থাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা দেখতে যাবার মতলব করছেন নাকি ?'

'গেলে সবাই একসঙ্গে গেলেই তো ভাল হয় ?'

'তবে আজই সবে এলাম, আজ ভাবছিলাম পাহালগামটাই ঘুরে দেখব। চন্দনওয়াড়ি কাল গেলে হয় না ?'

'আমাদেরও সেই আইডিয়া। আমি শুধু আপনাদের ইনভাইট করতে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'অবশ্যই একসঙ্গে যাব। আমাকে ছাড়া বোধ হয়

boiRboi.net

আপনাদের আর চলবে না। এর মধ্যেই যা একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে গেল। এটাকে তো অ্যাটেম্‌প্টেড মার্ডার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বিজয়বাবুর খুব ভাগ্য ভাল যে, উনি বেঁচে গেলেন।'

'তা হলে কাল দুটো নাগাদ যাওয়া যাক। এখান থেকে আট মাইল ঘোড়া করে যেতে হয়। লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'প্রয়াগ! প্রয়াগ!' মিঃ মল্লিক ডাকতে ডাকতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি। এ দিকে প্রয়াগ সামনেই নদীর ধারে হাত-মুখ ধুচ্ছে।

'বোধ হয় নদীর শব্দের জন্য শুনতে পাচ্ছে না', বলল ফেলুদা।

'না', বললেন মিঃ মল্লিক, 'ও এমনিতেই কানে একটু খাটো, তিনবার না ডাকলে উত্তর দেয় না।'

প্রয়াগ এবার ডাক শুনে মনিবের কাছে দৌড়ে গেল।

'যাও, আমার লাঠিটা নিয়ে এসো।'

'হুজুর', বলে প্রয়াগ তাঁবুর ভিতর চলে গেল।

কিছুক্ষণ থেকেই দেখছিলাম, ফেলুদা প্রয়াগকে একদৃষ্টে লক্ষ করছে। কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে অন্য তাঁবুটা থেকে বিজয়বাবু আর মিঃ সরকারও বেরিয়ে এসেছেন। সরকার এঁদের সঙ্গ ছাড়েননি। মনে হয় পুরো ট্যুরটাই এঁদের সঙ্গে ঘুরবেন।

'আমরা কাল চন্দনওয়াড়ি যাচ্ছি', বললেন সুশান্তবাবু।

সকলে প্রস্তাবে সায় দিল।

ফেলুদা বলল, 'তোরা দু-জনে ডেক-চেয়ার নিয়ে নদীর ধারে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কর, আমি একটু পাহাড়ি পথে ঘুরে আসি। মাথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার।'

'কতক্ষণের জন্য যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই ঘণ্টাখানেক,' বলল ফেলুদা।

'সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত অস্ত্রটি আছে তো?'

'তা আছে।'

ফেলুদা চলে গেল।

লালমোহনবাবুর মাথায় একটা নতুন গল্পের প্লট এসেছে, সেটা

boiRboi.net

boirboi.net

আমাকে শুনিয়ে পরখ করে দেখে নিলেন। আমি আবার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাজেস্ট করলাম। এই করতে করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে বসে থাকলে বোরিং লাগে না, তাই সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'দু' ঘণ্টা হতে চলল, তবু তোমার দাদা এলেন না—'

সত্যিই তো ! এটা আমার খেয়ালই হয়নি।

'কী করা যায়, বলো তো ?'

ফেলুদার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও অভ্যাসে হয়ে গেছে মুহূর্তে ডিসিশন নেবার।

আমি উঠে পড়লাম।

'চলুন, ওকে খুঁজতে বেরোই।'

'চলো।'

ফেলুদা কোন্ রাস্তা ধরেছে সেটা আমরা জানতাম। আমরা দু' জনে সেই পাহাড়ি পথে চড়াই ধরে রওনা দিলাম। পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ, পরিবেশ চমৎকার, কিন্তু আমাদের সে সব উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। ফেলুদা বলেছিল এক ঘণ্টায় ফিরবে ; এ বিষয়ে ওর কথার নড়চড় হয় না। কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই হয়েছে।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পরেই যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। একটা ঝোপের ধারে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ফেলুদা। আমার গলা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু পাল্স ধরেই বললেন, 'বেঁচে আছেন—কোনও চিন্তা নেই।'

ফেলুদাও নড়েচড়ে উঠল। তার পরেই উঠে বসে মাথার পিছনে হাতটা দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলল, 'এবার মিস্ করেনি রে। একেবারে মোক্ষমভাবে লক্ষ্যভেদ।'

'উঠতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই। ব্যথা তো মাথায়।'

ফেলুদা উঠে পড়ে আমাদের দু' জনের কাঁধে ভর করে কয়েক পা হেঁটে বলল, 'ঠিক হ্যায়, হাঁটতে পারব।'

boiRboi.net

'কিন্তু কাউকে কি দেখতে পেলেন ?'

'তা হলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত। সে লোক অত কাঁচা নয়। ক'টা দিন যাক। আর একটু মাথা না খাটালে চলছে না।'

রাত্তিরে মিঃ মল্লিকের তাঁবুতে আবার প্ল্যানচেট হল। বলা হয়নি, এর মধ্যে শ্রীনগরে আর একদিন প্ল্যানচেট হয়েছিল, যাতে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শাসমল বলে এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আত্মা এসে বলল যে, সে সত্যিই খুন করেছিল।

আজকের প্ল্যানচেটে ফেলুদা ডায়েরি পড়ে যার কথা বলেছিল, সেই কাশ্মিরি মিঃ মনোহর সপ্রুর আত্মা নামানো হল। আশ্চর্য মিডিয়ম ডাঃ মজুমদার—দশ মিনিটের মধ্যেই আত্মা চলে আসে।

সপ্রুর আত্মা প্রশ্ন করল, 'আমাকে কেন ডেকেছ ?'

মিঃ মল্লিক বললেন, 'তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলাম আমি। যে খুনের মামলার আমি ছিলাম জজ।'

'সেটা আমি জানি।'

'আমার বিশ্বাস হয়েছিল খুনটা তুমি করোনি।'

'খুন করেছিল হরিদাস ভগত। পুলিশ ভুল তদন্ত করেছিল। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না।'

'কিন্তু আমি যে সেই সেভেনটি এইট থেকে দুশ্চিন্তায় ভুগছি।'

'তুমি কি আমার কাছে ক্ষমা চাও ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, করলাম তোমাকে ক্ষমা। কিন্তু আমার যে সব আত্মীয়বন্ধু জীবিত আছে, তারা তোমায় ক্ষমা করেনি বা করবে না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমার ক্ষমা চাই।'

'বেশ, ক্ষমা করলাম। আমি আসি।'

প্ল্যানচেট শেষ হল।

মিঃ মল্লিক আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

boiRboi.net

৭

সকালে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ফেলুদা। তার মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম কোনও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

'মিঃ মল্লিক খুন হয়েছেন।'

'অ্যাঁ!'

এবার আমার চিৎকারে লালমোহনবাবুরও ঘুম ভেঙে গেল।

'কাল মাঝরাত্তিরে,' বলল ফেলুদা। 'বুকে ছুরি মেরেছে। শুধু তাই না, খুনটাকে আরও পাকা করার জন্য মাথায়ও একটা ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে। সব মিলিয়ে বিশ্রী ব্যাপার।'

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুও উঠলেন। গায়ে দুটো গরম কাপড় চাপিয়ে দুজনেই তাঁবুর বাইরে চলে এলাম। ফেলুদা আমাদের খবরটা দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল। মিঃ মল্লিক খুন! ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে দেখি সকলেই প্রায় তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেরই মুখ কালো। কথাবার্তায় বুঝলাম বিজয়বাবু পুলিশকে খবর দিতে গেছেন। এখান থেকে শহর বেশি দূর নয়, তাই পুলিশ আসতে বেশি সময় লাগা উচিত না।

ডাঃ মজুমদারই সকালে উঠে প্রথমে ব্যাপারটা দেখেন। বিছানার চাদর রক্তাক্ত। সেটা ছুরির আঘাতের ফলে, কারণ মাথায় বিশেষ রক্তপাত হয়নি। অস্ত্রটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। মনে মনে বললাম, এমন চমৎকার লিদর নদী থাকতে অস্ত্র ফেলার জায়গার অভাব কোথায়? নদী এখন সে ছুরিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে?

তবে শুধু যে খুন, তা নয়; তার সঙ্গে চুরিও আছে। মিঃ মল্লিকের ডান হাতের অনামিকায় একটা বহুমূল্য হিরের আংটি ছিল—তাঁর এক গুজরাটি মক্কেলের দেওয়া। খুনি সেইটিও খুলে নিয়ে গেছে।

ফেলুদা ডাঃ মজুমদারকে প্রশ্ন করছিল।

'কাল রাত্রে ভদ্রলোক শুয়েছেন কখন ?'

'আমাদের অনেক আগে। উনি ন'টার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তেন।

'আপনি তো ডাক্তার, দেখে বুঝতে পারছেন না কখন খুনটা হয়েছে ?'

'মনে হয় রাত দুটো, আড়াইটে নাগাদ ; তবে সেটা পুলিশের ডাক্তার এলে আরও সঠিকভাবে বলতে পারবে।'

'রাত্রে কোনও শব্দটব্দ শোনেননি ? ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি ?'

'উঁহু। আমার সচরাচর এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায়। আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠি। সাড়ে ছ'টায় উঠেই দেখি এই কাণ্ড। আমার আগে প্রয়াগ উঠেছিল, কিন্তু ও এই দুর্ঘটনাটা লক্ষ করেনি। ও উঠেই তাঁবুর বাইরে চলে গিয়েছিল।'

'কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে ?'

'একেবারেই না।'

একটা পুলিশের জিপ এসে তাঁবুর কাছে থামল। বিজয়বাবু নামলেন, তাঁর পিছনে একজন ইনস্পেক্টর। বিজয়বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ইনস্পেক্টরটি এগিয়ে গেলেন মিঃ মল্লিকের তাঁবুর দিকে।

'আমার নাম ইনস্পেক্টর সিং', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি এই কেসটার চার্জ নিচ্ছি। হোয়্যার ইজ দ্য ডেডবডি ?'

'বিজয়বাবু মিঃ সিংকে নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলেন। আমরা বাইরেই রয়ে গেলাম।

ইনস্পেক্টরের পিছন পিছন কয়েকজন কনস্টেবল, ফোটোগ্রাফার ইত্যাদি এ সব ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে—ঠিক তেমনি ভাবেই কাজ শুরু করে দিল। এ জিনিস অনেকবার দেখেছি, তাই কৌতূহল মিটে গেছে। আর মিঃ মল্লিকের মৃতদেহ দেখবার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল—কী আশ্চর্য, এই মল্লিক কতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আর হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর

হত্যাকারীরও মৃত্যুদণ্ড হবে।

ফেলুদা একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে লালমোহনাবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

ফেলুদা বলল, 'আমার মনের ভিতরের জটটা আরও বেশ ভাল করে পাকিয়ে গেল—এই তো ব্যাপার ! এখন পুলিশ যদি কিছু করতে পারে।'

'আপনি নিজে কি হাল ছেড়ে দিলেন ?'

'তা কি হয় ? আমি তো প্রথম থেকে সবগুলো ঘটনাই দেখেছি ; পুলিশ তো আর তা দেখেনি। অবিশ্যি ঘটনাগুলোর পরস্পরের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমাকে যে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, আর বিজয়বাবুকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, দু' জনেই কি এক লোক ? আর সেই লোকই কি এই খুনটা করেছে ? হিরের আংটি চুরি যদি মোটিভ হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো বাইরের থেকে খুনটা করে থাকতে পারে। কিন্তু আমার—'

ফেলুদা চুপ করে গেল। তার পর কিছুক্ষণ পরে বলল, 'ডাকাতির আইডিয়াটাকে অবিশ্যি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের চেনা লোকই কুকীর্তিটা করেছে।'

'চেনা লোক বলতে— ?'

'মিঃ মল্লিকের সঙ্গে যারা এসেছেন। ইনক্লুডিং মিঃ সরকার। কারণ তাঁর ডান হাতের আঙুলে 'S' লেখা আংটিটার কথা ভুললে চলবে না।'

ইনস্পেক্টর সিং তাঁবু থেকে বাইরে বেরোলেন। ভদ্রলোক তিনটে তাঁবুর দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই সবগুলোই কি একই পার্টির তাঁবু ?'

বিজয়বাবু বললেন, 'না ; এই দুটো আমাদের, আর ওইটা মিঃ মিত্তিরদের।'

'মিঃ মিত্তির ?'

'হি ইজ এ ওয়েলনোন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর ফ্রম ক্যালকাটা।'

মিঃ সিং ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার

boiRboi.net

পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি রাজগড়ের খুনের কেসটা সল্‌ভ করেছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মিঃ সিং হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য।

'ইনস্পেক্টর বাজপাই ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। তার কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আমি কিন্তু এখানে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। কোনও কেস-টেস সল্‌ভ করতে নয়। আপনি আপনাদের কাজ চালিয়ে যান।'

'আমি তো চালিয়ে যাবই আমার কাজ, কিন্তু আপনিই বা চুপচাপ বসে থাকবেন কেন, বিশেষ করে এই ফ্যামিলির সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে। খুনটা তো বাইরের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। ছুরি যে বসিয়েছে, সে তো লেফট হ্যান্ডেড ; এখানে তো সবাই দেখছি রাইট হ্যান্ডেড। যাই হোক, ইউ আর ফ্রি টু ক্যারি অন ইওর ওন ইনভেস্টিগেশন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার উপরও একটা অ্যাটেম্‌ট হয়েছিল, কাজেই আমি ব্যাপারটাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিতে পারছি না।'

'ভাল কথা', মিঃ সিং বিজয়বাবুর দিকে ফিরলেন। 'ডেড বডির কী হবে ? ওটা কি আপনি কলকাতায় নিয়ে যেতে চান ?'

'তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ছাড়া তো বাবার আর কেউ নেই। মা মারা গেছেন, দাদা বিলেতে ছিলেন, দাদাও মারা গেছেন।'

'ভেরি ওয়েল, তা হলে এখানেই সৎকার হোক। তবে, বুঝতেই পারছেন, আপনাদের এখনও কিছু দিন পাহালগামে থাকতে হবে। অন্তত যত দিন না কেসটার সুরাহা হচ্ছে তত দিন। কারণ ইউ আর অল আন্ডার সাসপিশন। আমি একে একে প্রত্যেককেই জেরা করতে চাই।'

পুলিশ ঘণ্টা তিনেক ধরে জেরা চালাল। জেরা শুরু করার আগে মিঃ সিং ফেলুদাকে দু'-একটা প্রশ্ন করে নিলেন। 'আপনি কাল রাত্রে কোনও সন্দেহজনক শব্দ পাননি ?'—

'না। তাছাড়া এখানে নদীর শব্দে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।'

'জানি। সেটা ক্রিমিন্যালের পক্ষে একটা অ্যাডভানটেজ। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর সঙ্গে তো আলাপ হয়নি।'

'ইনি মিঃ গাঙ্গুলি। হি ইজ এ রাইটার।'

এর পর আমরা তিনজন শহরের দিকে গিয়ে একটা রেস্টোরান্টে বসে চা আর অমলেট খেলাম। সকালে গোলমালে আর ব্রেকফাস্ট হয়নি।

খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য দেখছি যে, প্রথমে ছেলেকে খুন করতে চেষ্টা করে না পেরে শেষটায় বাবাকে খুন করল।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা যে একই লোক করেছে, তার কী গ্যারান্টি ? একজনের ছেলের উপর আক্রোশ থাকতে পারে, আর একজনের বাপের উপর। নট ভেরি সারপ্রাইজিং।'

'আমার কিন্তু একটি লোক সম্বন্ধে কি রকম সন্দেহ হয়।'

'কে ?'

'ডাঃ মজুমদার। এ দিকে ডাক্তার, তার উপরে আবার আত্মা নামাচ্ছে। কম্বিনেশনটা অদ্ভুত লাগছে।'

'খুন করার সুযোগ অবশ্য ডাক্তারেরই বেশি ছিল, কারণ পাশের খাটে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু মোটিভ কী ? হিরের আংটি যদি নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বলতে হয় ডাক্তারের খুবই আর্থিক দুরবস্থা। কিন্তু সে রকম তো কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আর বিজয়বাবু ?'

'বিজয়বাবু অবশ্য তাঁর বাপের মৃত্যুতে খুবই লাভবান হবেন। অবিশ্যি মিঃ মল্লিক যদি উইল করে থাকেন, এবং সে উইল থেকে

boiRboi.net

যদি ছেলেকে বাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে বিজয়বাবুর কোনওই লাভ নেই। তা না হলে বিজয়বাবু মোটা টাকা পাবেন, কারণ মিঃ মল্লিক নিঃসন্দেহে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।'

'কিন্তু বিজয়বাবু তো তাঁর অফিস থেকে রোজগার করছেনই। তাঁর হঠাৎ এতটা টাকার দরকার পড়বে কেন যে, সে খুন করবে? খুন করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।'

'দ্যাট ইজ ট্রু।'

'সুশান্ত সোম সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার?'

'কাজের ছেলে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। আর বেশ কোয়ালিফাইড। মিঃ মল্লিক সুশান্তবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। আর সুশান্তবাবুর কোনও খুনের মোটিভ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

'আচ্ছা মিঃ মল্লিকের উপর কি কেউ প্রতিশোধ নিয়ে থাকতে পারে?'

'তা তো পারেই। আমি তো সেই কথাটাই বার বার ভাবছি। কত জনের প্রাণ নিয়েছেন লোকটা, ভেবে দেখুন।'

'কিন্তু বিজয়বাবুর বেলা তো প্রতিশোধ খাটে না।'

'তা তো খাটেই না, আর সেই ব্যাপারেই বার বার ধাক্কা খেতে হচ্ছে।'

দুপুর বেলা লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল, একটু শহরের দিকে ঘুরে আসবে। একটু না হাঁটলে নাকি ওর মাথা খোলে না।

'শহর হোক আর যাই হোক, সঙ্গে আপনার অস্ত্রটি রাখবেন', বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা দু' জন নদীর ধারে গিয়ে বসলাম।

সুশান্তবাবু তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত', বললেন ভদ্রলোক।

আমরাও সায় দিলাম। সত্যিই, এমন যে হবে তা ভাবতেও পারিনি।

'ইনস্পেক্টর কী বলেন?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সুশান্তবাবু বললেন, যত দূর মনে হল, ডাকাতের সম্ভাবনাটা

একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আংটিটার বিস্তর দাম ছিল, মাঝখানে হিরে বসানো, তাকে গোল করে পান্না দিয়ে ঘেরা। আর এখানে যে ডাকাতির কেস একেবারে হয় না তা নয়। যত টুরিস্ট বাড়ছে, তত এ সবও নাকি বাড়ছে। বছর ত্রিশেক আগে পাহালগম অনেক নিরাপদ জায়গা ছিল।'

'আপনারা কি তাঁবুতে বন্দী ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।'

'না', বললেন সুশান্তবাবু, 'তবে পাহালগাম ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না।'

'মৃতদেহের সৎকার হবে কখন ?'

'বিকেলের মধ্যেই।'

বিকেলে জানতে পারলাম যে, মল্লিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই বিজয়বাবুকে আর অশৌচ পালন করতে হবে না।

ফেলুদা পাঁচটার মধ্যে ফিরে এল। ও যতক্ষণ না ফিরছিল। ততক্ষণ আমার অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু ও বলল, যারা ওর পিছনে লাগতে পারত, তারা সকলেই এখন পুলিশের নজরে রয়েছে। তাই চিন্তা নেই।

'কিন্তু এই যে ঘুরে এলেন, এর কোনও ফল পেলেন ?'

'পেয়েছি বইকি', বলল ফেলুদা, 'তবে এখানে বসে থেকে সব ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে না। আমাকে একবার শ্রীনগর যেতে হবে।'

'কবে যাবেন ?'

'কালই সকালে।'

'আর আমরা ?'

'আমার দু' দিন আন্দাজ লাগবে। সে দু' দিন আপনারা এখানেই থাকবেন। চেঞ্জের পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা তো আর হয় না।'

'কিছু আলো দেখতে পেলেন ?'

'তা পেয়েছি। সত্যিই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু এখনও কিছুটা অন্ধকার রয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো শ্রীনগর যাওয়া দরকার। তবে যাবার আগে

boiRboi.net

আমার দিক থেকেও কয়েক জনকে একটু জেরা করা দরকার। নিচু স্তর থেকে ওপরে ওঠাই ভাল । আগে প্রয়াগকে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

সুশান্তবাবুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই প্রয়াগ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

'ব'সো এখানে,' বলল ফেলুদা।

প্রয়াগ এখন আমাদের তাঁবুতে।

'শোনো প্রয়াগ', বলল ফেলুদা, 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

'পুছিয়ে বাবু।'

কথাবার্তা হিন্দিতেই চলল, আমি বাংলায় লিখছি।

'তুমি মল্লিক সাহেবের বাড়িতে কবে থেকে আছ ?'

'পাঁচ বছর হয়েছে।'

'তার আগে কোথায় ছিলে ?'

'জেকব সাহেবের বাড়িতে বেয়ারার কাজ করতাম। পার্ক স্ট্রিটে।'

'মল্লিক সাহেব তোমাকে কি করে পেলেন ?'

'আমি জেকব সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জেকব সাহেব বিলেত চলে যাচ্ছিলেন, তাই আর আমাকে দরকার লাগছিল না।'

'মল্লিক সাহেব জেকব সাহেবকে চিনতেন ?'

'ওরা দু'জনে এক ক্লাবের মেম্বার ছিলেন।'

'তোমার পুরো নাম কী ?'

'প্রয়াগ মিসির।'

'তোমার সংসার নেই ?'

'বউ মারা গেছে, মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কাল রাত্রে তুমি কোনও রকম শব্দ পাওনি, যার জন্য তোমার ঘুম ভেঙে যেতে পারে ?'

'না বাবু।'

'বাবুকে কে খুন করতে পারে, তাই নিয়ে তোমার কোনও ধারণা

boiRboi.net

আছে ?’

‘না বাবু। এ রকম হবে আমি কল্পনাই করতে পারিনি।’

‘ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।’

এবার ফেলুদা সুশান্তবাবুকে বলল ডাঃ মজুমদারকে খবর দিতে। ডাঃ মজুমদার এলেন আমাদের তাঁবুতে।

ফেলুদা বলল, ‘আমি আপনাকে দু’-একটা প্রশ্ন করতে চাই।’

‘করুন।’

‘মিঃ মল্লিক যেভাবে প্ল্যানচেট করেছিলেন, সেটা কি ডাক্তার হিসাবে আপনার কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় ?’

ডাঃ মজুমদার মাথা নাড়লেন।

‘না। আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, এই সব পুরনো ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। আর জজ যদি এক-আধটা ভুল ভার্ডিক্ট দিয়ে থাকে, তাতেই বা কী এসে গেল। ভুল তো সকলেরই হতে পারে।’

‘আপনার নিজের মধ্যে যে ক্ষমতাটা রয়েছে, সেটা কবে থেকে প্রকাশ পেল ?’

‘তা অনেক দিন। পঁচিশ বছর তো বটেই।’

‘ওঁকে কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে ?’

‘একেবারেই নেই।’

‘ওঁর ছেলে সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?’

‘ছেলে এক কালে ড্রাগসের প্রভাবে খুব গোলমালের মধ্যে পড়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। কিন্তু সেই সাধুর প্রভাবেই হোক, আর অন্য কোনও কারণেই হোক, ও একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।’

‘জুয়ার প্রতি ওর আসক্তি রয়েছে না ?’

‘সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ আমি ও রসে একেবারেই বঞ্চিত।’

‘ও কোন অফিসে কাজ করে ?’

boiRboi.net

'চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং—ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।'

'কোথায় অফিস ?'

'গণেশ এভিনিউ। দশ নম্বর।'

'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

ডাঃ মজুমদার চলে গেলেন। সুশান্তবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন ফেলুদার দিকে।

'এবার মিঃ সরকারের সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'মিঃ সরকার ?'

সুশান্তবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ। কেন, আপনার অবাক লাগছে ?'

'উনি তো ঠিক আমাদের দলের নন ; এক রকম বাইরের লোক।'

'তাঁর যে টাকার দরকার নেই সেটা আপনি কি করে জানলেন সুশান্তবাবু ? টাকার জন্য মানুষে খুন করে না ?'

'ঠিক আছে। আমি ডাকছি ওঁকে।'

মিঃ সরকার এলেন।

'আসুন, বসুন', বলল ফেলুদা।

'কাশ্মীর এসেছিলাম বেড়াতে, আর কিসের থেকে কী হয়ে গেল দেখুন।'

'কী করবেন বলুন—মানুষের কপালই ওই রকম।'

'এখন বলুন, আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চান।'

'আপনি কত বছর পর্যন্ত শ্রীনগরে ছিলেন ?'

'বছর বারো।'

'তার পর কলকাতায় যান ?'

'হ্যাঁ।'

'সেইখানেই পড়াশুনা করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবা কি কলকাতাতেও হোটেল ম্যানেজারি করতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন হোটেল ?'

'ক্যালকাটা হোটেল।'

'আপনি গ্র্যাজুয়েট ?'

'বি কম।'

'এখন কী করেন।'

'একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে আছি।'

'কোম্পানির নাম ?'

'ইউনিভারসাল ইনসিওরেন্স।'

'আপিস কোথায় ?'

'পাঁচ নম্বর পোলক স্ট্রিট।'

'আপনি জজ মিঃ মল্লিকের কথা জানতেন ?'

'না। এখানে এসে আলাপ। বিজয়ের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে মিলে গেল, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।'

'আপনি কি জুয়ার ভক্ত ?'

'আই লাইক গ্যাম্বলিং, তবে বিজয়ের মতো নয়।'

'হঠাৎ কাশ্মীর আসার ইচ্ছে হল কেন ?'

'ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে।'

'ক' দিনের জন্য এসেছেন ?'

'দশ দিন—তবে এখন কী হয় জানি না। এ রকমভাবে আটকে পড়ব, কে জানত !'

'আপনার হাতের আংটিটা একবার দেখতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

সরকার তাঁর আংটিটা খুলে ফেলুদার হাতে দিলেন, সোনার আংটি, উপরে একটা ছ' কোনা পাতের উপর মিনে করে নীলের উপর সাদা দিয়ে S লেখা।

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে আংটিটা ফেরত দিয়ে দিল।

'ঠিক আছে। আপনার জেরা শেষ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

boiRboi.net

পরদিন সকালে ফেলুদা ব্রেকফাস্টের পর ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীনগরে চলে গেল। বলল, 'মনে হচ্ছে, পরশু ফিরে আসতে পারব ; তবে দু'-এক দিন দেরি হলে চিন্তা করিস না।'

ন'টা নাগাত পুলিশের জিপ এল, ইনস্পেক্টর সিং নামলেন। অন্য তাঁবুতে কাজ শেষ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'হোয়্যার ইজ মিঃ হোমস ?' হেসে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আমি বললাম, ফেলুদা একটু শ্রীনগর গেছে।

'এই কেসের ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার প্রয়োজন হচ্ছে কেন ? এই কেস তো জলের মতো সোজা।'

'কি রকম ?'

'বেয়ারাটাই হচ্ছে অপরাধী। তার সুযোগ ছিল। সে একই তাঁবুতে শুত। তাছাড়া এ সব লোকের লোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। বেয়ারাগিরি করে আর কত রোজগার হয় ?'

'আপনি কি ওকে অ্যারেস্ট করছেন ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আপাতত থানায় নিয়ে যাচ্ছি জেরার জন্য। তা ছাড়া, ও যে লেফট হ্যান্ডেড তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। ওকে ওর নাম লিখতে বলেছিলাম। ডান হাতে লিখতেই পারল না, কিন্তু বাঁ হাতে বেশ পারল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অস্বীকার করছে, সুতরাং ওকে বেশ ভাল রকম জেরা করা দরকার।'

'আংটিটাও পেতে হবে', বললেন জটায়ু।

'সেটাও জেরার জোরে বেরিয়ে যাবে। পুলিশের পক্ষে খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল। এই পাহাড়ি পরিবেশে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে ?'

'ফেলুদা কি তাহলে বৃথাই গেল শ্রীনগর ? কেসটা এতই

boiRboi.net

সোজা ? আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত সহজ হলে ফেলুদা অত কাঠখড় পোড়াত না। আমি জানি ও কলকাতায় খোঁজ করবে। ওর লোক আছে, যাদের বলে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা যে কোনও খবর জোগাড় করে দিতে পারে।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয়ে যাচ্ছে, বেয়ারা লেফট-হ্যান্ডেড।

কিন্তু এত সাহস হবে লোকটার ? ও কি জানে না যে ওর ওপরেই প্রথমে সন্দেহ পড়বে ?

ইনস্পেক্টর সিং বিদায় নিয়ে প্রয়াগকে সঙ্গে করে চলে গেলেন। লোকটাকে দেখে আমার কষ্ট হল, কারণ ও কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে। পুলিশরা স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য কত কী যে করতে পারে, সে আমার জানতে বাকি নেই। ফেলুদাও এ নিয়ে বহুবার আক্ষেপ করে বলেছে। ও বলে পুলিশরা কাজ জানে, ওরা কর্মঠ, কিন্তু দয়ামায়া বলে কিছু নেই ওদের মধ্যে। অবিশ্যি উপায়ও নেই। অনেক সময় জরুরি তথ্য সংগ্রহ করতে কড়া রাস্তা নিতে হয়। সে কাজটা প্রাইভেট গোয়েন্দার চেয়ে পুলিশে অনেক বেশি ভাল পারে।

সুশান্তবাবু এবার দেখি আমাদের দিকে আসছেন। বললেন, 'মিঃ মিত্তির তো বোধহয় শ্রীনগর গেছেন।'

আমি 'হ্যাঁ' বলতে বললেন, 'আমরা কিছু না বলতেই উনি আমাদের জন্য এত করছেন, এটা খুব আশ্চর্য বলতে হবে।'

'আসলে উনি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। রহস্য জিনিসটা ওঁর কাছে অসহ্য। যতক্ষণ না সেটার কিনারা করতে পারছেন, ততক্ষণ ওঁর সোয়াস্তি নেই।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি কি মিঃ মল্লিকের জীবনী লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন ?'

'তা এক রকম দিয়েছিলাম বই কি। খানিকটা করে লিখছিলাম, আর উনি সেটা দেখে দিচ্ছিলেন। খুবই চিত্তাকর্ষক বই হত বলে মনে হয়।'

'এখন তো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল।'

boiboi.net

'তা তো হলই।'

'আপনিও কি প্রয়াগকে সন্দেহ করেন?'

'মোটেই করিনি। ওর অত সাহস হবে বলেই আমার মনে হয়নি। কিন্তু পুলিশ যেভাবে চলছে...'

'মিঃ মিত্তিরের উপর আর একটা অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেছে, সেটা বোধ হয় জানেন না?'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। এবার মাথায় বাড়ি মেরেছিল পাথর-টাথর কিছু দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। কিন্তু কেউ যে ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তা, উনি তো পুলিশ প্রোটেকশন নিতে পারেন।'

'সেটা উনি মরে গেলেও নেবেন না, যদিও উনি পুলিশকে সাহায্য করতে সব সময়ই প্রস্তুত।'

'আপনাদের তাস খেলা বন্ধ বোধ হয়?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'মৃত্যুর ছায়া এখনও ঘনিয়ে আছে; এর মধ্যে কি ও সব চলে?'

'তা বটে।'

ফেলুদার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে, অথচ দ্বিতীয় দিনেও ও এল না। দিনটা আমরা সাইট সিইং-এ কাটালাম। ট্যুরিস্ট আপিস থেকে খবর নিয়ে আড়াই মাইল দূরে শিকারগা লেক আর এক মাইল দূরে একটা পুরনো শিবমন্দির দেখে এলাম। তাঁবুতে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল বুঝতে পারছিলাম। কারণ তাঁবুকে ঘিরে এখনও খুনের গন্ধ, ভাবতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে।

তৃতীয় দিন সকাল দশটায় ভাবছি কী করা যায়, এমন সময় ফেলুদার ট্যাক্সি এসে হাজির। আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ও হাত তুলে বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে।'

'আপনার মাথা পরিষ্কার কি না সেইটে শুধু বলে দিন', বললেন লালমোহনবাবু।

'পরিষ্কার, তবে অনেক জট ছাড়াতে হয়েছে। এমন একটা কেস

সচরাচর পাওয়া যায় না।'

'রহস্য উদ্‌ঘাটনের টাইমটা কী?'

'সেটা ইনস্পেক্টর সিং-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে।'

'উনি কিন্তু খুনি ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই।'

'মানে?'

'বেয়ারা প্রয়াগ।'

'সর্বনাশ! তা হলে তো আর সময় নষ্ট করা চলে না। আমি চললাম থানায়।'

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শহরের দিকে চলে গেল।

ও যখন ফিরল, তখন আমাদের লাঞ্চ খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এসে বলল, 'আজ তিনটেয় মিটিং। ওঁদের তাঁবুতে।'

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদার রহস্যোদ্ঘাটন যে না দেখেছে, সে কল্পনা করতে পারে না সেটা কত নাটকীয় হতে পারে।

তিনটের পাঁচ মিনিট পরেই পুলিশের জিপ এসে গেল। ইনস্পেক্টর সিং ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে, একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ক্রাইম স্টোরির ভক্ত হতে পারে?'

'আপনি ও সব বই পড়েন নাকি?'

'ও ছাড়া আর কিছুই পড়ি না। বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভের গল্প হলে তো আর কথাই নেই। আজ আপনার রহস্যোদ্ঘাটনের ব্যাপারেও আমার পড়া অনেক গল্পের কথা মনে পড়ছে। অবিশ্যি আপনি যে কী বলতে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।'

'সেটা তো অল্পক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।'

'তাঁবুতে সকলে জমায়েত। দুটো তাঁবু থেকে চেয়ার এনে সকলের বসবার জায়গা করা হয়েছে। বিজয় মল্লিক, মিঃ সরকার, সুশান্ত সোম, ডাঃ মজুমদার—এঁরা সব চেয়ারে বসেছেন, আর তাবুঁর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা প্রয়াগ। এই শেষের লোকটির

চেহারার মধ্যে একটা ক্লিষ্ট ভাব দেখে মনে হয়, পুলিশ তাকে বেশ ভালোভাবেই জেরা করেছে।

১০

ফেলুদা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একবার সকলের দিকে দেখে নিল। তার পর এক গেলাস জল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিয়ে খেয়ে তার কথা শুরু করল—

'মিঃ মল্লিক আজ আমাদের মধ্যে নেই, আমি তাঁকে দিয়েই আমার কথা আরম্ভ করছি। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ত্রিশ বছর জজিয়তি করে তার পর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই রিটায়ারমেন্টের কারণ ছিল অসুস্থতা। তা ছাড়া হয়তো মিঃ মল্লিক তাঁর পেশায় কিছুটা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। প্রাণদণ্ড নিয়ে হয়তো তাঁর মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমি এই সিদ্ধান্তের সত্যতা-অসত্যতার ভিতর যেতে চাইছি না। যা ঘটেছিল শুধু তাই বলছি।

'মিঃ মল্লিক দৈনিক ডায়েরি লিখতেন। এই ডায়েরির একটা বিশেষত্ব ছিল। যে দিন তিনি কাউকে ফাঁসির আদেশ দিতেন, সেই দিন ডায়েরিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম লিখে তার পাশে লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে দিতেন। আর যে দিন এই দণ্ডের যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা গভীর সন্দেহ দেখা দিত, সেদিন ক্রসের পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিতেন।

'আমি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলি দেখেছি। সবসুদ্ধ ছ'টি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। তার মানে ছ'টি প্রাণদণ্ডের সমীচীনতা সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন।

'এইবার আমি আর এক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মিঃ মল্লিকের মনে দ্বন্দ্ব হচ্ছিল কি না হচ্ছিল সেটা সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই জানতে পারত না। কিন্তু যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কি মিঃ মল্লিক কখনও ভেবেছিলেন? মনে তো হয় না, কারণ তাঁর ডায়রিতে এর কোনও

উল্লেখ নেই। ছেলের মৃত্যুদণ্ডে বাপ-মা কী ভাবছে, বাপের মৃত্যুদণ্ডে ছেলের বা ভাইয়ের বা স্ত্রীর বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের কী মনোভাব হতে পারে, সেটা নিয়ে মিঃ মল্লিক বোধ হয় কখনও চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব যে, এই সব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই নিশ্চয়ই গভীর বেদনা অনুভব করেছে।

'এইটে উপলব্ধি করার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে—এই রকম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনও ব্যক্তির আত্মীয়ই কি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিঃ মল্লিককে হত্যা করে ?

'যত ভাবি, ততই মনে হয় এটা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেখানে দণ্ড সম্বন্ধে জজের মনেও সন্দেহ আছে, সেখানে তো বটেই।

'এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি কেউ আছেন ?'

'এখানে প্রথমেই যাকে বাদ দেওয়া যায়, তিনি হলেন ডাঃ মজুমদার, কারণ তিনি আজ পনের বছর হল মল্লিকদের পারিবারিক চিকিৎসক।

'বাকি থাকেন আর চারজন—বিজয় মল্লিক, সুশান্ত সোম, মিঃ সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

'এখানে বিজয় মল্লিককে এই বিশেষ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর কোনও আত্মীয়ের প্রাণদণ্ড হয়নি।

'সেই রকম সুশান্ত সোমকেও এই একই মর্মে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁরও কোনও নিকট জনের প্রাণদণ্ডের কথা আমরা ডায়েরিতে পাচ্ছি না।

'বাকি রইলেন মিঃ সরকার ও প্রয়াগ বেয়ারা।

'এখানে প্রয়াগকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

প্রয়াগ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেলুদা বলল, 'প্রয়াগ, সে দিন তুমি যখন নদীতে হাত ধুচ্ছিলে, তখন আমি তোমাকে লক্ষ করছিলাম। তোমার ডান হাতে একটি ছোট্ট উল্‌কি আছে—দুটি ইংরেজি অক্ষর—HR। এটার মানে

boiRboi.net

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রয়াগ গলা খাকরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওর কোনও মানে নেই বাবু। উল্‌কি করাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই করিয়েছিলাম।'

'তুমি বলতে চাও, এটা তোমার নাম আর পদবির প্রথম অক্ষর নয় ?'

'নেহি বাবু। মেরা নাম হ্যায় প্রয়াগ মিসির।'

'আমি যদি বলি, তোমার নাম প্রয়াগ নয়। কারণ প্রয়াগ বলে ডাকলে তুমি চট্ করে উত্তর দাও না—অথচ অন্য ব্যাপারে মোটেই তুমি কালা নও।'

'আমার নাম প্রয়াগ মিসির, বাবু।'

'না !' ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি জানতে চাই ওই R অক্ষরটা কিসের আদ্যক্ষর। কী পদবি তোমার ?'

'আমি আর কী বলব বাবু !'

'সত্যি কথাটা, বলবে। এখানে জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, এখানে মিথ্যা চলবে না।'

'তবে আপনিই বলুন।'

'আমি বলছি। ওই R হচ্ছে রাউত। এবার তোমার পুরো নামটা বলো।'

প্রয়াগ হঠাৎ কেমন যেন ভেঙে পড়ল। তার পর কান্নার মধ্যেই বলল, 'ও আমার একমাত্র ছেলে ছিল বাবু। আর ও খুন করেনি। ওর মামলা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে ওকে খুনি বলে মনে হয়। আমার একমাত্র ছেলে—ফাঁসি হল !'

'তা হলে তোমার পুরো নামটা কী দাঁড়াচ্ছে ?'

'হনুমান রাউত, বাবু। কিন্তু আমি বাবুকে খুন করিনি, ওঁর আংটি আমি নিইনি !'

'সেটা কি আমি একবারও বলেছি ?'

'তা হলে বাবু আমাকে মাপ করে দিন।'

'পুরোপুরি মাপ করা কি চলে ?' সত্যি কথা বল তো।'

হনুমান রাউত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইল।

ফেলুদা বলল, 'তুমি খুন করনি, কিন্তু খুনের চেষ্টা করেছিলে।'

'না বাবু—'

'আলবৎ!' ফেলুদা গর্জিয়ে উঠল।' তোমার নিজের ছেলের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী, তুমি তাঁর ছেলেকে মারতে চেয়েছিলে যাতে, তিনিও তোমার মতো পুত্রশোক ভোগ করেন। খিলেনমার্গ যাবার পথে তুমি বিজয়বাবুর ঘাড়ে ধাক্কা মারোনি? ঠিক করে বল তো। বাঁ হাতে তোমার আংটি রয়েছে, আর বাঁ হাত দিয়ে তুমি ডান হাতের কাজ করো, তাই না?'

'কিন্তু উনি তো বেঁচে আছেন বাবু: উনি তো মরেননি।'

'খুনের অভিপ্রায়েরও শাস্তি আছে হনুমান রাউত—সে শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে!'

দু' জন কনস্টেবল এসে বেয়ারাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল।

ফেলুদা আর এক গেলাস জল খেয়ে নিল। তার পর আবার শুরু করল—'এবারে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এটা আরও অনেক বড় প্রসঙ্গ। এখানে একজন ব্যক্তির প্রাণ নেওয়া হয়েছে। এ হল হত্যা। আর এর জন্য আমার মতে প্রাণদণ্ডই উচিত দণ্ড।'

সকলে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। তাঁবুতে পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যেত নিশ্চয়ই, যদি না বাইরে লিদর নদীর স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দ থাকত।

ফেলুদা বলল, 'আমি এক জনকে এর আগেও কয়েকটা প্রশ্ন করেছি—এবার আর একবার করতে চাই। মিঃ সরকার।'

সরকার নড়েচড়ে বসে বললেন, 'করুন।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কবে শ্রীনগর এলেন?'

'আপনাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এলাম।'

'আচ্ছা, আপনার আঙুলের আংটির 'S'টা কিসের আদ্যক্ষর?'

'আমার পদবির অফকোর্স—সরকার।'

'কিন্তু, মিঃ সরকার, আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, সে দিন যাত্রীর তালিকায় সরকার বলে কেউ ছিলেন না। সেন ছিলেন, দু' জন সেনগুপ্ত ছিলেন, একজন সিং ছিলেন আর একজন সপ্রু ছিলেন।'

বাট—বাট—'

'বাট হোয়াট, মিঃ সরকার ? আপনার নাম বদলানোর দরকার হল কেন, জানতে পারি কি ?'

'মিঃ সরকার চুপ ।

ফেলুদা বলল, 'আমি বলি ? আমার ধারণা আপনি মনোহর সপ্রুর ছেলে। আপনার চেহারার মধ্যে একটা পরিষ্কার কাশ্মীরী ছাপ রয়েছে। মিঃ মল্লিক মনোহর সপ্রুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন । মিঃ মল্লিককে প্লেনে দেখেই আপনি নাম বদল করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তখন থেকেই আপনার মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা জাগে। আপনি ওই ফ্যামিলির সঙ্গে মিশে যান, এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন—টু স্ট্রাইক। সেই সুযোগ আসে পাহালগামে।'

'কিন্তু...কিন্তু...দিস ক্রাইম ইজ কমিটেড বাই এ লেফ্‌ট-হ্যান্ডেড পার্সন।'

'আপনি ভুলবেন না, মিঃ সপ্রু—আমি আপনাকে তাস বাঁটতে দেখেছি। আর কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি যে, আপনি বাঁ হাতে তাস ডিল করেন।'

মিঃ সপ্রু হঠাৎ কেমন যেন ক্ষেপে উঠলেন ।

'বেশ, ঠিক কথা—আমি ওঁকে ছুরি মেরেছি, কিন্তু তার জন্য আমার একটুও অনুশোচনা নেই। আমার যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, তখন উনি আমার বাবাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান—অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ নট গিল্টি ! কিন্তু...কিন্তু...

সপ্রুর যেন হঠাৎ একটা নতুন কথা মনে পড়ল ।

'আমি ওঁর আংটি তো নিইনি। আই ওনলি কিলড্ হিম।'

'না', বলল ফেলুদা। 'আপনি ওঁর আংটি নেননি। সেটা নিয়েছেন আর একজন ।

ঘরে আবার সেই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ।

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল ।

'বিজয়বাবু—জুয়াতে আপনার অনেক লোকসান হয়েছে। তাই না ? আমি কলকাতায় খবর নিয়েছি। আমার লোক আছে খবর দেবার, পুলিশেও আমার বন্ধু আছে। আপনার বিস্তর দেনা হয়ে

গেছে।'

বিজয়বাবু চুপ।

ফেলুদা বলে চলল, 'আর আপনার বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল যে, বাবা আপনাকে উইলে কিছু দিয়েছেন কিনা। সেই জন্য তাঁকে মেরে তাঁর আংটিটি আপনি হাত করেছিলেন।'

'মেরে মানে?'

'মেরে মানে কোনও ভারী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত মেরে। আপনার বাবাকে আসলে দু' জন খুন করে। কার দ্বারা তিনি হত হয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায় বিছানায় রক্ত দেখে। ছুরির আঘাতই আগে পড়ে, তার পর আপনি মাথায় বাড়ি মেরে হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে যান। আপনি খুনি না চোর, সেটা অবশ্য আইন বুঝবে, কিন্তু হাতকড়া বোধ হয় তিন জনের হাতেই পড়বে।'

মল্লিকদের তাঁবু থেকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু মশাই, আপনি একটা ব্যাপারে তো কোনও আলোকপাত করলেন না। আপনাকে দু' বার মারার চেষ্টা করল কে?'

সে ব্যাপারে আলোকপাত করিনি, কারণ আমি নিজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে শিওর নই। তিনজন অপরাধীর একজন করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এবং সুযোগের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রয়াগের কথাই মনে হয়। সপ্রু বা বিজয়বাবু দল থেকে বেরিয়ে এসে এটা করবেন, বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক, এর জন্য মূল রহস্যোদ্ঘাটনে কোনও এ দিক ও দিক হচ্ছে না। ধরে নিন, এটা ফেলু মিত্তিরের একটা অক্ষমতার পরিচয়।'

'যাক্, বাঁচা গেল। আপনার ভুল হতে পারে, এটা জানতে পারলে একটু ভরসা পাওয়া যায়।'

'আপনি অযথা বিনয় করছেন। আমি কিন্তু বহু চেষ্টা করলেও আপনার মতো লিখতে পারতাম না।'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য খোঁচা!'